কাশ্যপেয়

ডঃ দীপক চন্দ্র

সাহিত্য সংস্থা
১৪এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রী রণধীর পাল
১৪এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : শ্রীশ্রীজগন্নাথ পুনর্যাত্রা
৩০শে জুন ১৯৫২

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শ্রী সত্য চক্রবর্ত্তী

মুদ্রক :
শ্রীমনোরঞ্জন পান
নিউ জয়কালী প্রেস
৮এ, দীনবন্ধু লেন
কলিকাতা-৬

আমার বাবা ও মা'কে,—

শ্রী কেশবলাল চন্দ্র

ও

শ্রীমতী নিরুপমা চন্দ্র

শ্রীচরণ কমলেষু,

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

উপন্যাস :

ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণ এলেন দ্বারকায় (১ম ও ২য়)

বিষণ্ণ শ্রীকৃষ্ণ

দ্রৌপদী চিরন্তনী

সমালোচনা গ্রন্থ :

মনোজ বসু : জীবন ও সাহিত্য

বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা।

সম্পাদিত গ্রন্থ :

মনোজ বসুর রচনাবলী (১ম—৪র্থ)

মনোজ বসুর কবিতা।

দৃষ্টিকোণ

পুরাণ হচ্ছে মানবসভ্যতার প্রাচীনতম ঘটনাবলীর বিবরণ—একদিন যা ছিল নিছক বাস্তব। পুরাণইতো প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। তবে সেই ইতিহাসের পুরাতন কথা যে পুরাণ, তাতে ধীরে ধীরে কালধর্মের মত কত কথা নূতন আরোপিত হয়েছে আবার কত কথাই তার পাতা থেকে মুছে গেছে। 'মনের কথা' মাটি আর পাথরের ফলকে খোদাই করতে গিয়ে, তামার পাতে আর তালপাতায় লিখতে গিয়ে কত পরিবর্তন হয়ে গেছে। ফলে, নানা ঘটনা জট পাকিয়ে আছে পুরাণে। পুরাণে মানুষের ইতিবৃত্ত, রক্তমাংসের পরিচয়, কথা ও কাহিনীর উপকরণ সন-তারিখের আড়ম্বরে আঁকা হয়নি। বংশ-তালিকার ঠিকুজি তৈরী করে যুগের সঙ্গে যুগের বা অব্দের একযোগে সূত্র টেনে ভারতের ইতিহাসের ভিত স্থাপন করিনি। তবু পুরাণ ইতিহাসের উপাদান উপকরণের যোগান দিয়েছে। পুরাণ কেমন করে ইতিহাসের বস্তু হয় তা বুঝতে ও বোঝাতে গিয়ে একদিন **'কাশ্যপেয়'** উপন্যাসের পরিকল্পনা করলাম।

'কাশ্যপেয়' উপন্যাসের পটভূমি প্রাচীন ভারতবর্ষ প্রাচীন সভ্যতার অগ্রজ এবং জগৎ সভ্যতার পথপ্রদর্শক সিন্ধু সভ্যতার বিশাল ক্যানভাসে পুরাণের কশ্যপ কাহিনীকে বিধৃত করে আর্য ও অনার্য, সুর ও অসুর, দেবতা ও দানবের বিরোধ ও সংঘর্ষের এক চিত্ররূপ এঁকেছি। মানব সভ্যতায় ক্রম-বিকাশের বিভিন্ন স্তর আঁকতে প্রস্তরযুগ, নব্যপ্রস্তরযুগ এবং ধাতুযুগের বিভিন্ন নিদর্শন এবং গল্প সূত্রাকারে উল্লেখ করে বিশ হাজার বছরের মানব-সভ্যতার এক ইমেজ গড়েছি। কাঠামোয় ঐতিহাসিক উপাদান এবং পৌরাণিক ঘটনা ও চরিত্রের সমন্বয় করে দেখাতে চেয়েছি পুরাণ হচ্ছে মানবসভ্যতার প্রাচীনতম ঘটনাবলীর বিবরণ। একদিন যা ছিল বাস্তব এবং একান্ত সত্য।

পুরাণ কাহিনীর কশ্যপকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছি। কারণ, কশ্যপের সন্তান আমরা। সিন্ধু-সভ্যতার কালে এক দুরন্ত প্লাবনে কশ্যপ ও তার সন্তানেরা এসে দাঁড়াল পঞ্চনদীর তী'র। এল তারা প্রাচীন মানব-সভ্যতার আর এক দেশ সুমের (বর্তমান ইরাক) থেকে। পুরাণ গবেষকদের মতে কশ্যপ এশিয়া মাইনরের লোক। আর্যরা আগন্তুক জাতি বলে আর্যপুত্র কশ্যপ ও তার পুত্র ইন্দ্র, আদিত্য, বিবস্বান, বিষ্ণু প্রমুখকে আর্যদের প্রতিভূরূপে গ্রহণ করেছি। অসভ্যরূপে তারাও আসেনি ভারতে। নিজ দেশের ধর্ম

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তারা বহন করে এনেছিল। কেউ কেউ মনে করেন যে নূতন আগন্তুকেরা এসেছিল জলপথে "বয়" বা গমনোপযোগী ভেলা নির্মাণ করে। আবার কেউ বলেন তারা ভারতে এসেছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথ দিয়ে। উপন্যাসে আমি দুইমত গ্রহণ করেছি।

আর্যরা সিন্ধু-সভ্যতার বিস্ময়কর উন্নতরূপ, তার ঐশ্বর্য, ধন-দৌলত, গাভী এবং কৃষি সম্পদ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে তারা লোভী ও ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। উপনিবেশ স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিল তারা। কিন্তু কিভাবে এই স্বপ্ন সফল করেছিল তা জানার কোন উপায় নেই পুরাণের কশ্যপ চরিত্র নিয়ে তার এক কাল্পনিক আখ্যানভাগ রচনা করেছি। বলাবাহুল্য, পুরাণ কথায় কশ্যপকে নিয়ে নিটোল কোন আখ্যায়িকা গড়ে উঠেনি। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও কাহিনীর মধ্যে নেই কোন যোগসূত্র। কশ্যপের সাম্রাজ্যলোভ, আধিপত্য স্থাপনের দুরন্ত আকাংখাকে আর্যচরিত্রের প্রতীক হিসাবে গণ্য করেছি। ভারতে আর্যদের আগমন এবং তাদের কর্তৃত্ব ও বংশ বিস্তারের ঘটনা ও কাহিনীকে রক্তমাংসে জীবিত করতে হলে একটি প্রতীক চরিত্র গ্রহণ করতে হয়। কশ্যপ সেই সময় ও ঘটনার প্রতীক। কশ্যপের চরিত্রে যে আমি স্বকল্পিত বহু উপাদান সংযোজন করেছি সেজন্য অনেকের সঙ্গে আমার মতভেদ থাকবে। উপন্যাসের পটভূমিতে যে ঐতিহাসিক সত্য আছে তার সঙ্গে কশ্যপকে মিলিয়ে মিশিয়ে দেবার জন্য পৌরাণিক চরিত্রকে ভেঙে গড়েছি।

অজানা অচেনা একরাজ্যে ভিনদেশের মানুষ কশ্যপ কেমন করে আশ্রয় পেল এবং তার বংশ বিস্তার করে এক নতুন মানবকুল তৈরী করল তার রোমাঞ্চকর ঘটনা রোমান্টিক পুরা-কবির অন্তরে যেভাবে গাঁথা হয়েছিল আমার রচনায় তার রূপ অবিকৃত থাকেনি। সিন্ধুযুগের কথা মনে রেখে তাকে ইচ্ছে মত গড়েছি পুরাণকারেরা সকলে আর্যপুত্র। আর্যদের মহিমা কীর্ত্তনের জন্যে এ দেশবাসীকে ছোট এবং হেয় করেছেন তাঁরা। তবু তাদের সবটুকু মন্দ বলতে রচয়িতাদের বিবেকে বেঁধেছিল। গালিগালাজের মধ্যে তাই কিছু স্তুতিও ছিল। অনাচারী, অত্যাচারী রাক্ষস, অসুরের মহানুভবতা, উদারতা, মর্যাদা-বোধের মহত্ব, তার ভক্তি-শ্রদ্ধা, ভালবাসা প্রভৃতি মহৎ গুণগুলিকে কিন্তু তাঁরা একেবারে নস্যাৎ করতে পারেননি। সেইসব স্তুতিবাক্য ইতিহাসের দলিল হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে তাদের উন্নত সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির মূল্যবোধের। আর্যদের তাঁরা যত জ্ঞানী, গুণী, বিদ্বান এবং ঋষিরূপে চিত্রিত করুন না কেন, তাদের বদমেজাজ,

ঈর্ষা, ক্রোধ, বিদ্বেষ, ঘৃণা, দুরভিসন্ধি, ষড়যন্ত্র, লোভ, আক্রোশ, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা হৃদয়হীনতা প্রভৃতি দোষগুলিকে শোভন করে আঁকতে পারেননি। কারণ, আঁকা সম্ভব ছিল না বলেই। মানবপ্রকৃতি ও প্রবৃত্তির সেই অবিকৃতরূপের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আর্যদের জাতিগত প্রবণতা। আর্যরা যে পরদ্রব্য লোভী, দস্যু, লুণ্ঠক এবং নিষ্ঠুর শাসক প্রজাপীড়ক বহু পৌরাণিক ঘটনাতেই তা স্পষ্ট হয়ে আছে। ক্ষমতা, আধিপত্য এবং স্বার্থের জন্য তারা যে কত ভয়ংকর হতে পারে ত'ব দৃষ্টি এঁকেছি কশ্যপ এবং আর্য-অনার্যের ইন্দ্র চরিত্রে। কৃষ্টি বোঝাতে দুইটি পৃথক সভ্যতার কিংবদন্তী সৃষ্টি করেছি। আর্যেরা যখন ভারতে প্রবেশ করেছে তখন তাদের সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার চেয়ে অনেক পশ্চাৎপদ ছিল। তাই প্রাগৈতিহাসিক যুগের কিংবদন্তীর গল্প কশ্যপের ভাবনায় রূপ পেয়েছে কশ্যপের চরিত্রে আর্যের যাযাবরত্ব এবং গতিশীলতা ও উন্নতিশীলতা স্থান পেয়েছে। অপরপক্ষে, আর্যদের গোড়ার দিকের বৈরীতা পরবর্তীযুগে ছিল না। এদেশের নারীকে তারা বিয়ে করতে আরম্ভ করেছে। যখন অনার্য রমণী গৃহিণী হল তখন ধর্মকর্মের উপর তার প্রতিঘাত পড়ল। আর্য অনার্যের সংশ্লেষণে পৌরাণিক দেবতামণ্ডলীর সৃষ্টি হল। আর্য-ব্রাহ্মণগণ এই সকল নতুন দেবতার পত্তন করলেন। কশ্যপের যজ্ঞ তার প্রতীক।

ঐতিহাসিক সত্যকে মনে রেখেই কাল্পনিক দেবভূমির পরিবর্তে ইতিহাসের পীঠভূমি সিন্ধুনদীর তীরে অবস্থিত কালিবঙ্গান, চানহুদড়োর, লোথাল হরিয়ূপীয়া (হরোপ্পা) মহেঞ্জোদড়ো হয়েছে কশ্যপের বিচরণভূমি এবং উপন্যাসের ঘটনাকেন্দ্র। ঋগ্বেদের সূক্তে (৬।২৭।৪, ৫) হরিয়ূপীয় স্থানটির উল্লেখ থাকায় এরূপ পরিকল্পনায় সাহসী হয়েছি।

দিতি এবং দনু থেকে দৈত্য এবং দানববংশের উদ্ভব বলে তাদের পিতা প্রাচেতস ও দক্ষকে আর্যবংশোদ্ভুত কোন শাসকরূপে ভাবতে পারেনি। তাদের উভয়কে সিন্ধুদেশের নরপতিরূপে গ্রহণ করেছি। এতে পুরাণ বিকৃত হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য ক্ষুন্ন হয়নি। আর্যদের তীব্র আর্য বিরোধিতার যুগে কশ্যপ সম্ভবত আর্যকন্যাদ্বয়ের পানিগ্রহণ করেছিল। তাই কশ্যপের আর্যগৌরব অম্লান রাখতে পুরাণকারেরা অনার্য পুত্রদের জননী দিতি ও দনুকে এবং তার পিতাদের. আর্যবংশভুক্ত করেছিল। পুরাণকারদের এই পক্ষপাতিত্ব আমার মনঃপূত হয়নি। তাই, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে তাদের অনার্যীকরণ করলাম।

গল্পপাগল মানুষকে এক অভিনব গল্প শোনানোর জন্যে পুরাণ ও ইতিহাসের ছাঁচে ঢেলে কিছু কল্পনা আর কিছু সত্যির এক গল্প বানালাম। সাময়িক একটা আনন্দ দিয়ে নিশ্চয়ই গল্প শেষ হয়ে যাবে না। গল্পের কাঠামোতে আছে দেশের একটা অতীত ইতিহাস। নানা ঘটনার মধ্যে যা রক্ত-মাংসে জীবিত হয়ে আছে। এছাড়া আছে কৃষ্টির কথা, কেমন করে বিশ্বাস, সামাজিক মূল্যবোধ, সংস্কার, ধর্মবিশ্বাস যুগযুগান্তর ধরে গড়ে উঠে তার পরিচয় একটু রঙিন হয়ে দেখা দিয়েছে "কাশ্যপেয়'র পৃষ্ঠায়।

পরিশেষে বাংলা সাহিত্যে অভিনব বিষয়বস্তু নিয়ে গ্রন্থ পরিকল্পনা এবং তার পরীক্ষা নিরীক্ষা কার্যে প্রকাশক শ্রীরণধীর পাল'এর আগ্রহ ও উৎসাহ এবং উদ্যোগ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। আমার প্রত্যেকটি গ্রন্থ সম্পর্কে সুধী পাঠক সমাজের আত্যন্তিক কৌতূহল, সাগ্রহ প্রতীক্ষা এবং সৎ পরামর্শ ও পত্রালাপ আমার প্রেরণা ও পাথেয়। তাঁদের সকলকে আমার সকৃতজ্ঞ অন্তরের শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাই।

॥ এক ॥

বেশ কয়েকদিন চলল প্রবল বর্ষণ।

সকাল থেকে বৃষ্টি নেই। কালো মেঘ ফিঁকে হয়ে গেছে। সূর্য উঠেছে।

কালিবঙ্গার বাসিন্দাদের মনে যে অসহিষ্ণু অস্থিরতা চলছিল তা কেটেছে। প্রবল বারিপাত হলেই উৎকণ্ঠা আর দুশ্চিন্তায় তাদের দিন কাটে। সরস্বতী এবং দৃষ্‌দবতী নদীর মোহনায় অবস্থিত এই স্থানটিতে প্রতি বছর প্লাবন হয়। সেই সময় বেশ কিছুকাল তাদের বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়। এখন উঁচু করে মাটির বাঁধ দিয়ে প্লাবন ঠেকানো হয়েছে। তবু বাঁধ ভেঙে মাঝে মাঝে বন্যা হয়। তাই, সিন্ধুর ভয়ংকর ত্রাস থেকে মুক্ত হয়নি তাদের মন।

রোদ উঠতে তারা নিশ্চিন্ত হল। ছোট ছোট ইটের তৈরী বাড়ী এবং কাঁচা মাটির কুঁড়েঘরের সামনে মেলে দিয়েছে তাদের পরিধানের ভিজে বসন। ছেলেমেয়েরা ভিজে মাঠে বেড়িয়ে জল ছিটিয়ে খেলা করছে। রঙীন প্রজাপতির দল এসে ভীড় করেছে নন্দন কাননে ফুলের সন্ধানে।

সরস্বতীর তটপ্রান্তে শ্রেষ্ঠী প্রাচেতস'র তৈরী মনোরম এই উদ্যানটি সিন্ধু নদের অববাহিকায় সব শ্রেষ্ঠীর ঈর্ষার বস্তু। পূর্বদেশে এবং দক্ষিণদেশে প্রাচেতস যখন বাণিজ্যে যেত তখন সেই সব দেশ থেকে বিচিত্র এবং আশ্চর্য ধরনের ফুল আর বাহারী গাছ এনে সে তার নন্দনকানন সাজাত। এমনি করেই নন্দনকানন এক অপরূপ উদ্যানে পরিণত হল। নন্দনকাননের তুল্য উদ্যান কেউ কখনও দেখেনি আগে।

শ্রেষ্ঠী কন্যা দিতি উদ্যানটির তত্ত্বাবধান করে। প্রতিদিন একবার করে তার উদ্যানে আসা চাই। বৃষ্টিপাতের জন্যে ক'দিন আসা হয়নি। নন্দনকাননের গাছ-গাছালির জন্যে মনটা তার ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিল।

রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই গো-শকট করে সে নন্দনকাননে গেল। শকট থামা পর্যন্ত তার তর সইল না। তার আগেই সে লাফিয়ে নেমে পড়ল। উদ্‌ভ্রান্ত বনহরিণীর মত সমস্ত উদ্যানটাকে একবার চক্র দিল। তারপর, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সব গাছ-গাছালি। অনেকক্ষণ ঘুরে সে পরিশ্রান্ত হল। বিশ্রামের জন্য একটি পুষ্পিত বনবীথির ছায়ায় বসল।

রৌদ্রভরা দিগন্ত সীমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনটা অকারণ তার বিষণ্ণ হয়ে যায়। শূন্য বুক ভরে ওঠে নীরব কান্নায়। হঠাৎ, মায়ের কথা মনে পড়ল তার। সূতিকাগৃহে মা তাকে রেখে চিরকালের জন্য মায়া কাটিয়েছে। মায়ের স্নেহ-আদরের স্বাদ সে পায়নি কখনও। সে যে কি সম্পদ তার ধারণাই নেই দিতির। বিমাতার স্নেহও তার অদৃষ্টে জোটেনি। ছোট ভাই-বোনেরা যখন তাদের গর্ভধারিণীর আদর খায় তখন বুক তার শূন্যতায় চিন্ চিন্ করে। ভীষণ কষ্ট হয়। নিজেকে তার অত্যন্ত দুঃখী, একা মনে হয়। পিতা প্রাচেতসের সান্নিধ্য জোটে কালেভদ্রে। ব্যবসা বাণিজ্য, রাজ্য-রাজনীতি নিয়ে তিনি ব্যস্ত। সর্বদা বাইরে বাইরে কাটে তার দিন, মাস, বছর। অন্তঃপুরে দিতি ভীষণ নিঃসঙ্গ এবং একা। এই মনোরম উদ্যানটি তার নিঃসঙ্গ জীবনের সমস্ত শূন্যতাকে ভরিয়ে রাখে। নন্দনকাননই তার একমাত্র সাথী। এই উদ্যানের সঙ্গে তার প্রাণের সম্পর্ক। এখানে এলে তার মনে আর কোন দুঃখ কষ্ট থাকে না। শূন্য বুকে সুর ভরে উঠে।

বৃষ্টি ভেজা গাছের পাতায় পাতায় শাখায় শাখায় রোদের মমতা মাখানো আদর আর স্নেহ লেগে আছে। সূর্যের নরম আলোর কোমল স্পর্শ ভেজা পাতার উপর জননীর সদ্য আঁকা চুম্বনের মত চিক্ চিক্ করছে। এসব দৃশ্য দেখতে দেখতে দিতির ভাবান্তর হল। মন তার হাহাকার করে উঠল। শূন্যতার যন্ত্রণায় বুক তার টন্‌টন্ করতে লাগল।

পাখি ডাকে গাছের ডালে। রঙীন কাঠঠোকরা পাখি। কঠিন কর্কশস্বরে একবার ডাকছে আর কি যেন একটা দুঃখে কষ্টে আত্মহারা হয়ে গাছের ডালে জোরে জোরে মাথা ঠুকছে। তার তীক্ষ্ণ চঞ্চুর আঘাতে কাষ্ঠখণ্ড বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। পাতাগুলো যন্ত্রণায় কেঁপে কেঁপে

উঠছে। পাখীটার কান্নায দিতি শিউরে উঠল। ঠর মনে। নিজেকে
পাখিটাকে একবার উড়িযে দেবে ভাবল। কিন্তু এত ঢ অজ্ঞাত আকর্ষণে
দারুণ দুঃখের মধ্যে করা উচিত নয ভেবে সে নিজেই উঠে

ধীর স্থির মন্থর গতিতে সে চলতে লাগল। দু'পাশে দিতি।
গাছের ডালপালা ছুঁযে ছুঁযে চলতে লাগল। বৃষ্টিভেজা পাতার জল
লেগে তার সারা অঙ্গ ভিজে গেল।

থমকে দাঁড়াল দিতা। মনে হল তার ভাষাহীন কান্নার সমবেদনা জানাতেই যেন নন্দনকাননের গাছগুলো অশ্রু বর্ষণ করছে। দিতি আর আত্মসংবরণ করতে পারল না। বুক ঠেলে তার একটা দুরন্ত কান্না বরিয়ে এল। রক্ত করবীর পুষ্পিত শাখার উপর মুখ রেখে অনেকক্ষণ অশ্রুবর্ষণ কবল। কেঁদে তার মনটা হাল্কা হল। কাঁচুলির প্রান্ত দিযে চোখের জল ভাল করে মুছল। তারপর মন্থর পাযে সরস্বতীর তীর ধরে আপন মনে হাটতে লাগল।

আনমনে অনেকখানি পথ সে হাটল। গৃধ্রিদের কর্কশ কণ্ঠস্বরে হঠাৎ তার তন্ময়তা ভঙ্গ হল দু'চোখের নীরব চাহনি মেলে সে দূরে তাকাল। খরস্রোত গর্জিত গর্বিত সরস্বতীর কুলে নিষ্প্রাণ শবদেহের মত সৌম্যদর্শন মাঝবযসী এক যুবককে দেখল। হাত-পা ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে বালির উপর পড়ে আছে। তার যাত্রার গতিরুদ্ধ হল। দৃশ্যবস্তু তার কৌতূহলিত দৃষ্টিকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করতে লাগল। চিন্তার চঞ্চলতায ব্যাকুল হযে উঠল সে। উদভ্রান্তের মত দ্রুত পাযে সে সংজ্ঞাহীন দেহের পাশে এসে দাড়াল।

সরস্বতীর ঘোলা স্রোত সংজ্ঞাহীন মনুষ্যশরীরে ঘা খেযে আরো উচ্ছল হযে ঝাপিযে পড়ল তার উপর। গৌরবর্ণের সুতনুর স্পর্শ লাভের জন্যে তরঙ্গমালায তরঙ্গমালায যেন চঞ্চল প্রতিযোগিতা সুরু হল। একের পর এক স্রোত যেভাবে ছুটে আসছিল তাতে গৃধ্রিরা পর্যন্ত এগোতে ভরসা পাচ্ছিল না, দূরে বসে তারা শিকারের প্রতীক্ষা করছিল। কুঁচের মত লাল কুঁৎ-কুঁতে দুই চোখ লোভের আগুনে জ্বল জ্বল করছিল।

রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মনে কেমন একটা নীরব আতঙ্ক জাগল। চোখের থামা পর্যন্ত তার তন্দ্রা। বিস্মিত মুগ্ধ চাহনি মেলে সে তাকে দেখতে পড়ল। উদ্‌ভ্রান্ত তার বিহ্বলতা।

তারপর, খুঁটিসোনার রঙ পড়েছে যুবকের অনিন্দিত সুন্দর মুখের উপর। পবিত্রার আভায় শান্ত সৌম্য মুখশ্রী একটা কমনীয়তায় ভরে উঠেছে। যুবকের গাত্রবর্ণ কাঁচা সোনার মত। হিরণ্যময় কেশ, দীর্ঘ ললাট, উন্নত নাসিকা, ডালিম ফুলের মত ঠোঁট, পাকা আপেলের মত লাল গাল, বাদামী রঙের ভুরু, দুই অর্ধনিমীলিত নীল চক্ষুতে যেন সন্ধ্যার ছায়া ঘনাল। রহস্যময় নির্বাক নিস্পন্দ যুবকের মতই এক অবাক বিস্ময় ও রহস্য জমে দিতির মনে। প্রজাপতির মত ওর মন ডানা মেলে দেয় রূপময়ী কোন অসীম কল্পনার আকাশে।

দিতির নীরব মুখে ফুটে উঠে একটা থমথমে ভাব। মনের মধ্যে না জানা এক পরমতৃপ্তির ক্ষণিক আবেশ ভালো লাগে এই ভাষাহীন স্তব্ধতা। একটা নীরব জিজ্ঞাসা জাগে তার নির্জন মনোভূমিতে। কে এই অদ্ভুত দর্শনের যুবক? কোথা থেকে, কি করে এল সে? পৃথিবীর মানুষের মত তার আকৃতি কিন্তু গাত্রবর্ণ সাধারণের মত নয়! মানুষ যে এত সুন্দর দেখতে হয় দিতির কল্পনায় আসে না। সিন্ধুদেশের মানুষের সঙ্গে তার চেহারা, গাত্রবর্ণের কোন মিল নেই। সর্বাঙ্গ থেকে তার একটা উজ্জ্বল জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে। অধরা সৌন্দর্য্যের এক স্বপ্নরাজ্য থেকে যেন এসেছে সে। তাই তাকে নিয়ে দিতির কৌতূহল এবং আগ্রহের সীমা নেই। মনে মনে ভাবে এ যুবক নিশ্চয়ই ভিন্ গ্রহের মানুষ। শাপভ্রষ্ট হয়ে এসেছে। নইলে, সরস্বতীর নির্জন সৈকতে কেন পরিত্যক্ত হবে সে? হঠাৎ, চিন্তায় তার ছেঁদ পড়ল। উপাস্য দেবতা শিব ছদ্মবেশে তাকে কোন পরীক্ষা করতে আসেনি'ত?

অবাক বিহ্বলতা দিতিকে অন্যমনস্ক করে দিল। চোখের চাহনিতে তার উদ্বিগ্ন ব্যাকুলতা।

নদীর পারের সবুজ ঝাউর মাথায় একপাল হরিপাল এসে বসল। বিচিত্র সুরে তারা কলরব করতে লাগল। পাখীর ডাক আর সরস্বতীর

কলরোল মিশিয়ে কেমন যেন একটা ঝড় উঠল দিতির মনে। নিজেকে সে হারিয়ে ফেলল। স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির মত কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে সে নেমে এল জলার ধারে।

যুবকের দেহে ক্ষীণ প্রাণস্পন্দনের লক্ষণ অনুভব করল দিতি। ঝুঁকে পড়ল তার উপর। মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দৃষ্টির কষ্ট যন্ত্রণায় তীব্র হল। পরিচর্যা করলে যুবকের প্রাণলাভ সম্ভব বিবেচনা করে তার গাত্রস্পর্শ করল দিতি। অমনি এক অনাস্বাদিত পূর্ব রোমাঞ্চ শিহরণে তার সর্বাঙ্গ কেঁপে গেল। মন হল পুলকিত। সর্বাঙ্গে তার আগুনের উত্তাপ বিকীরণ করতে লাগল। চোখ, মুখ, কান অস্বাভাবিক জ্বালা করতে লাগল। অবাক হল দিতি। এ তার হল কি? বুকের মধ্যে তার এ কিসের তোলপাড়? কি হল তার? নিজেকে প্রশ্ন করল দিতি। কিন্তু কোন জবাব পেল না খুঁজে। এক চির জিজ্ঞাসার কাছে সে উৎকর্ণ, বোবা। উৎসুখ চোখ দুটি যুবকের মুখে বিদ্ধ। দিতির চোখের পাতা, অপলক দৃষ্টি, আবেগতীব্র জিজ্ঞাসায় নিবিড় হল। মুখের উপর মুখ রেখে সে তার হিরণ্যময় কুঞ্চিত কেশরাশি নিয়ে অন্যমনে ক্রীড়া করছিল। কখনও শুভ্র বক্ষদেশের উপর তার ডান হাতখানা বুলিয়ে দিতে লাগল। আর প্রাণের মধ্যে নানাবিধ অনুভূতির মিশ্রণে জটিল একটা পরিতৃপ্তিতে সে অভিভূত হল। ভীষণ ভালো লাগছিল তার এই মুহূর্তটিকে। মনে হল, এ তার নতুন জীবন। সে যে রক্তমাংসের একটি মেয়ে, তারও যে একটা দেহ আছে, অনুভূতির তৃপ্তি আছে এই প্রথম বুঝতে শিখল। নিজের অজ্ঞাতে সে সংজ্ঞাহীন যুবকের ওষ্ঠাধর চুম্বন করল। জিভ দিয়ে একটু একটু করে তার ঠোঁটটাকে ভিজিয়ে দেবার তৃপ্তি ও সুখের উত্তেজনায় তার দেহ বিবশ হল। সর্বাঙ্গে তার বিন্দু বিন্দু স্বেদ ফুটে উঠল। নিজেকে তার ক্লান্ত অবসন্ন লাগল।

সংজ্ঞাহীন যুবককে নিয়ে তার মনে অসংখ্য জিজ্ঞাসা। যুবকের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন যাদু আছে। নইলে, এমন করে তার শরীর আকর্ষণ করবে কেন? বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের শব্দ মৃদঙ্গের মত বাজবে

কেন ? ভাল লাগার এরকম একটা মোহই বা সঞ্চার হবে কেন ? আঠার মত একটা শরীরে আটকে যাওয়ার এ তৃপ্তি কিসের ? ছাড়তে গেলে কষ্ট হয়। কেন ? কেনই বা এই ক্লান্তি অবসাদ তার ? কিসের অবসাদ ? এ যুবক আর পাঁচটা সাধারণ যুবকের মত নয় বলেই কি এই ঐন্দ্রজালিক শক্তির অধিকারী ? দেবতা সম্পর্কে যে অপার্থিব ছবি দিতির কল্পনায় আছে যুবক ঠিক তারই মত। তাহলে, একি স্বর্গভ্রষ্ট কোন দেবতা ! মস্তিষ্কের বদ্ধ কুঠরীতে এই একটি মাত্র প্রশ্ন বারংবার আবর্তিত হয়। দিতির আরো মনে হল, নীলচক্ষু এই অদ্ভুত আশ্চর্য সুন্দর মানুষটার সঙ্গে তার ভাগ্য সূত্র যেন এক অদৃশ্য বন্ধনে বাধা পড়েছে।

সরস্বতীর ঘোলা জলে সিন্ধুর জোয়ারের কল্লোল এসে লাগল। ক্রুদ্ধ ফণীর মত সহস্র ফণা বিস্তার করে তরঙ্গমালা যেন হিস্ হিস্ শব্দ করতে করতে ছুটে এল। দেখতে দেখতে যুবকের দেহে পুনরায় স্রোত আঘাত করল। দিতি ভীষণ অসহায় বোধ করল। যুবকের বিশাল শরীরটাকে একার চেষ্টায় কি করে সে ডাঙায় তুলবে ? ভেবে পায় না। অথচ, এই মুহূর্তে সেখান থেকে তাকে সরাতে না পারলে, স্রোতে ভেসে যাবে। দুশ্চিন্তায় অস্থির হল দিতি। ব্যাকুলতা বাড়ল। নদীতীরে কাউকে দেখতে পেল না। পাগলের মত ছোটা-ছুটি করল কিছুক্ষণ। তারপর নদীর খাদ থেকে ডাঙায় উঠে এল। জনপ্রাণীর কোন চিহ্ন দেখতে পেল না।

অল্পদূরে ধীবরপল্লী। নদীর ধারে ঝাকরা পাতায় ঢাকা গাছ গাছালির ফাঁক দিয়ে পাড়াটাকে ভাল নজর করা যায় না। তবু, সে প্রাণপণে তাদের উদ্দেশ্যে উচ্চৈঃস্বরে হাঁক ডাক সুরু করল। অনেকক্ষণ ধরে চিৎকার করল।—ইরবান, বুলোন, মন্দারণ তোমরা শীঘ্রী এস। তোমাদের দিতি দিদির দারুণ বিপদ। তোমরা কোথায় ? শীঘ্রী এস। বু-লো-ন অ-অ—

প্রতিকূল বাতাসে ধাক্কা খেয়ে তার কণ্ঠস্বর টুকরো টুকরো হয়ে শূন্যে হারিয়ে গেল। ধীবর পল্লীতে পৌছল না।

সরস্বতীর জল মহানন্দে কলরব করে যুবকের সংজ্ঞাহীন শরীরটাকে তখন টানছে। আতঙ্কে দিতির সর্বশরীর শক্ত হয়ে গেল। দেহের রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। যুবককে বাঁচানোর কথা ভেবে আকুল হল সে। চোখের সামনে যুবকের শরীর ভেসে যাবে, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে তা দেখবে? কখনই হতে পারে না। কিছুতেই না।

দিতির তার সব শক্তি নিয়ে যুবকের বিশাল শরীরটাকে জল থেকে টেনে তুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু ব্যর্থ হল তার প্রয়াস। তখন নিরুপায় দিতি ইষ্ট দেবতা শিবকে আকুলস্বরে ডাকতে লাগল।

অকস্মাৎ যুবকের সংজ্ঞা ফিরল। উঠবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু দুর্বল শরীরে দাঁড়াতে পারল না। পাট মুড়ে মাটিতে বসে পড়ল। দিতি তক্ষুনি তার ডান হাত নিজের কাঁধের উপর টেনে নিয়ে বাম হাতে কোমর জড়িয়ে তাকে উঠতে ও চলতে সাহায্য করল। দিতির দেহে ভর দিয়ে যুবক টলতে টলতে ডাঙায় উঠে এল। পত্রাবৃত তরুমূলে তাকে হাত ধরে বসাল। গাছের গুঁড়িতে পিঠ রেখে সে সাহায্যকারিণীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। চোখে তার আচ্ছন্ন ভাব। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিল সে।

তৃষ্ণায় যুবকের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। তার ক্লান্ত চোখ দুটি যেন জলের প্রার্থনা করছিল। তার কষ্ট দেখে দিতি নিকটবর্ত্তী একটা ঝর্ণা থেকে মিষ্টি জল আনবার জন্য ছুটল। ফিরতে কিছু দেরী হল। সুমিষ্ট কটা পাকা ফল সংগ্রহ করতে গিয়েই তার দেরী হয়েছিল। যখন ফিরল তখন যুবক পুনরায় মূর্ছা গেছে। চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিল দিতি। কয়েকবার জলের ঝাপ্‌টা দেবার পর যুবকের জ্ঞান ফিরল। চক্ষু উন্মুক্ত করল। নীলবর্ণের দুই চোখ রক্ত জবার মত লাল। মুখে কষ্টকর ক্লান্তির ছাপ। চোখ মেলতেই দিতি তার ওষ্ঠাধারে জলের পাত্র ধরল। ঢক্ ঢক্ করে সমস্ত জলটা সে পান করল নিঃশেষে। তারপর সংগৃহীত ফলের দুটি খোসা ছাড়িয়ে খেতে দিল তাকে।

দিতির নিপুণ হাতের সেবায় যুবক সুস্থ হল। কিন্তু চোখে মুখে তখনও তার ক্লান্তি। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে দিতির দিকে তাকাল সে। দিতির গায়ের রঙ তাদের ঘরের মেয়ের মত নয়। মেঘলা আকাশের মত মাজা রঙ। দেখতে সুশ্রীই। কচি শাল শিশু গাছের মত নধর কমনীয় সুঠাম দেহশ্রী তাকে আরো সুশ্রী করে তুলেছে। অফুরন্ত প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা মুখাবয়বে নেশার মত, স্বপ্নের মত মাখানো মাদকতা। চুম্বকের মত চোখ দুটি আটকে রাখে। যুবকের তন্ময়তা দিতির অধরে সপ্রতিভ হাসি ফুটিয়ে তুলল।

দুজনের মুগ্ধ চোখের চাহনিতে ফুটে উঠল এক অলিখিত বোবা ভাষা। তাই ওরা পরস্পরের দিকে চুপ করে চেয়ে থাকে নিরুত্তরে।

নীরব নিস্তব্ধ নদীতীরের পাশে ঘন বন। সেখান থেকে বিরহ কাতর কোন বন্য প্রাণীর আকুল ডাক শোনা যাচ্ছে। শাখাশ্রয়ী পাখী তার সঙ্গিনীর সঙ্গে বসে সুখে আলাপরত। পাহাড়ের অতলে বয়ে যাওয়া বন্য ঝরণা অভিসারিকার মত প্রাণভরা খুশি নিয়ে যেন প্রিয় মিলনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। ঝর্ণার প্রগলভতা তাদের বুকেও তোলপাড় করে। মনের ভেতর সুর উঠে ভরে।

যুবক ও দিতি কেউ কারো ভাষা বোঝে না। কিন্তু চোখের চাহনির নীরব ভাষা তারা ঠিকই বুঝতে পারল। আনন্দের গভীর স্বাদে ওদের মন ভরে ওঠল। আনমনে দিতির কণ্ঠে সুর জাগল খুশির সুর।

"যে রূপ দিয়েছ মোরে ওগো দেব, শিল্পী রূপকার
আমি তাই, তাই আমি—সে তো মোর রূপ সত্যকার।
তব রুদ্র তেজ শান্ত কর, স্নিগ্ধ প্রেম জ্বালো,
ভক্তির নির্ঝর বারি চিত্তে মোর ঢালো,
তুমি যাই দেবে মোরে সেই মোর ভালো।'

যুবকের চোখে মুখে কিসের নীরব সাড়া। অজানতে দিতির মুখে সরস হাসির আভা ফুটল। খুশিতে ঝলমল করল যুবকের চোখ। দু'জনের কেউ চোখ নামাল না। নির্বাক সবুজ সুন্দর ধরার বুকে

ভাষাহীনতার এই অনুভূতি ওদের গহন অতল বুকে নীল স্বপ্নপুরীর রূপকথা সৃষ্টি করে।

দিতির কণ্ঠের স্বর যুবককে অন্যমনস্ক করল। সমস্ত মন তার নীরব ব্যথায় মোচড় দিল। অব্যক্ত ভাষাহীন দুচোখ বেয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা অশ্রু। নীরব ব্যাথায় দিতির বুক টনটন্ করতে লাগল। ব্যাকুল হয়ে দিতি তার পাশে বসে চোখ মুছিয়ে দিল। দিতির নিবিড় সমবেদনা আর প্রীতির উষ্ণতার স্পর্শে তার সব কষ্ট লঘু হয়ে গেল। বিহ্বল কণ্ঠে বলল ঃ অ-দিতি'ত তুমি নও। তবু অদিতির মত তোমাকে দেখতে। আশ্চর্য মিল দুজনের। তোমাকে দেখে আমার নবজন্ম হল।

যুবকের কথার তাৎপর্য এবং তার ভাষা দিতি বুঝতে পারল না। অবাক চোখ মেলে তাকাল তার দিকে। যুবকের কণ্ঠ নিঃসৃত অ-দিতি কথাটা দিতি তার নাম ভেবে পুলকিত হল। ভয়ানক আশ্চর্যও হল। এত আশ্চয সে কখনও হয়নি জীবনে। হাজার প্রশ্ন তার মনে তোলপাড় করে। কে এই যুবক? কোথা হতে এসেছে সে? তার নাম যে দিতি; জানল কি করে? দিতি ভুলেও তার নাম বলেনি। তবু যুবক তার নাম ধরেই কথা বলল?—দিতির মনে এলোমেলো ঝড উঠল। শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে সে অভিভূত হল। মানুষের কায়া ধরে এ কোন্ দেবতা এল তার কাছে? কেন এল? কি তাঁর অভিপ্রায়? দিতির মনে পড়ল, কয়েকদিন ধরেই সে স্বপ্ন দেখেছে ঃ খুব ঘটা করে লিঙ্গপূজা করছে। আর স্বয়ং লিঙ্গ দেবতা শিব তার হাত থেকে পূজা নিচ্ছে। কিন্তু শিবের কোন মূর্ত্তি দেখতে পায়নি। জায়গাটিও তার অপরিচিত। স্বপ্নের মধ্যে সে দেখেছে চার দিকে ছোট বড় পাহাড় ঘেরা জায়গা। পাহাড়ী নদী উচু খাড়াই দুই পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটে যাচ্ছে। আর সে, পাহাড় চূড়ায় বসে লিঙ্গ দেবতাকে ধ্যান করছে। তার চারদিকে ঘন কুয়াশা। কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। কেবল, লিঙ্গ দেবতার প্রসন্ন মুখচ্ছবির ছায়া তার চোখের উপর ফুটে উঠেছিল। তারপর দৈব দুর্যোগের জন্যে সে পূজা তার করা হয়নি। তবে, কি সেই দেবতাই

সশরীরে ছদ্মবেশে এল তার কাছে? তার সেবা পরিচর্যা লাভের জন্যে কি এই ক্লেশ ভোগ করছেন তিনি? এই উপলব্ধি যত গাঢ় হল তার মনে, ততই একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব এবং তৃপ্তিতে ভরে গেল তার বুক। নিজেকে তার ভীষণ ভাগ্যবান মনে হল। পিতা প্রাচেতস দেবতার প্রীতি ও প্রসন্নতা লাভের ঘটনা জানলে নিশ্চয়ই খুশি হবেন। নররূপী দেবতাকে পেয়ে সিন্ধু দেশের মানুষও বিস্ময়ে হতবাক হবে। বিমাতার কাছে দিতির গৌরব ও মর্যাদা বাড়বে। দেবতার কোপদৃষ্টির ভয়ে তিনিও আর সপত্নী কন্যা দিতির উপর আর কখনো রূঢ় আচরণ করবেন না। এই সব বিবিধ চিন্তা তার মনে মিশ্র অনুভূতির এক আশ্চর্য তৃপ্তি সঞ্চার করল। সে ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

সূর্য উঠেছে অনেকক্ষণ। কিন্তু তার কিরণ উজ্জ্বল নয়। নিস্প্রভ আলোর এক মায়া রাজ্য সৃষ্টি করেছে। আকাশের কালো জমাট মেঘগুলো জড়াজড়ি করে বাতাসে উড়ে চলেছে। কোথায়, কোন রাজ্যে যে তারা যাচ্ছে—কেউ জানে না! মাঝে মাঝে নীল আকাশের বুকে ডানা মেলে দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে পরক্ষণেই পর্বতাকৃতি কালো মেঘের তাড়া খেয়ে আবার চলতে সুরু করে। সেইদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যুবক। কি যেন ভাবছে তন্ময় হয়ে! যুবকের চিন্তার দিগন্ত জুড়ে আছে এক ভয়ংকর স্মৃতি।

যুবকের নাম কশ্যপ। সুমের (বর্ত্তমান ইরাক) তার দেশ। রুক্ষ কঠিন মাটি পাথরে কাঁকরে ভরা। মরু অঞ্চলের মত বালুকাময়। উঁচু খাড়াই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছে উদ্ধত পাহাড়ী নদী। এই নদী উপত্যকার উভয় পার্শ্বে উচ্চভূমির উষর মরুপ্রান্তর। আঁকাবাঁকা অসংখ্য নদী-নালা দেহের শিরা উপশিরার মত তটভূমিকে সিক্ত করে কুলু কুলু রবে বয়ে চলেছে। বর্ষার জল পেয়ে ফুলে উঠে নদী। দুকুল প্লাবিত হয়। সমতলভূমি ছেড়ে তখন তাদের পর্বত চূড়ায় আশ্রয় নিতে হয়। অবশ্য অল্প জায়গায় অনেকগুলি লোককে একসঙ্গে গাদাগাদি করে থাকতে হয়। সেই পরিবেশে

একসঙ্গে বাস করতে তার পা ঘিন ঘিন করত। দুদিনে হাঁপিয়ে উঠত সে। খাদ্যের জন্যে অনিশ্চিন্ত উদ্বেগের মধ্যে সকলকে যেভাবে দিন কাটাতে হত তা মোটেই কশ্যপের পছন্দ ছিল না। মানুষ হয়ে তারা প্রকৃতির হাতের মুঠোয় কেন বন্দী থাকবে? নিজের ভাগ্য নিজে অন্বেষণ করবে না কেন? এভাবে পশুর মত বাস করা মানুষের অপরাধ। বিধাতা তাদের বদ্ধি দিয়েছেন। সেই বুদ্ধির বলে আত্মরক্ষার অস্ত্র বানিয়েছে। বাসোপযোগী গৃহ নির্মাণ করেছে। বন্য অশ্বকে .পোষ মানিয়েছে। তাকে নিজের কাজে লাগিয়েছে। একস্থান থেকে অন্য স্থানে গমনাগমনের পথ দ্রুত ও সহজ হয়েছে। যুদ্ধের উন্মাদনা এনেছে অশ্ব। শুধু তাই নয়, জলসিক্ত ভূমিতে বীজ ছড়িয়ে ফসল ফলানোর অভিজ্ঞতাও আয়ত্ত করেছে। কাঠের ভেলা ভাসিয়ে সমুদ্রকে জয় করেছে। তবু, জীবন ধারণের বিডম্বনা এবং কষ্টের কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। নিরাপদ নিশ্চিন্ত জীবনের আকর্ষণে তারা নদীর কাছাকাছি উর্বর ঘাসজমির কাছে বসতি গড়েছে। খাদ্য এবং পশুপালনের নিশ্চয়তার ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে তারা ভীরু, অলস হচ্ছে। এইভাবে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বেঁচে থাকার মধ্যে কোন রোমাঞ্চ নেই। বিভিন্ন অঞ্চল দেখার কৌতুক নেই। অথচ, চেনা গণ্ডীর বাইরেও যে আরো জগৎ আছে তাকে দেখা জানার কোন কৌতূহল তাদের রক্তে নেই। এরকমভাবে বেঁচে থাকতে ভাল লাগে না কশ্যপের। মনে তার নিত্য যন্ত্রণা। যত দিন যায় ততই তার জিজ্ঞাসা মনের অতলে ঝড় তোলে।

হঠাৎ, তাদের শান্ত নীড়ে জাগে প্লাবনের মহোল্লাস। পাহাড় থেকে বৃষ্টির তোড় তীব্র গতিতে নামতে লাগল। জলের বেগ মথিত নিষ্পেষিত হয়ে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে তীরভূমি প্লাবিত করল। দুকুল ছাপিয়ে নদীর জল ঢুকে পড়ল লোকালয়ে। অমনি আর্ত্ত কলরব উঠল সেখানে। ছোট বড় পাথরের ফাঁকের মাটি বৃষ্টির জলে ধুয়ে গিয়ে পাথরে পাথরে বন্ধন আলগা হয়ে যায়—তারপরেই সশব্দে ভেঙ্গে পড়ার শব্দ হয়। নিচেকার অনেক গাছ পতনোমুখ পাথরের ধাক্কায়

স্থানচ্যুত হয়ে একই সঙ্গে নিম্নমুখী হয়। ধ্বংসদূতের মত মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে ওরা হানা দেয় মানুষের জীবনেও। এরকম অসহায় ভাবে বেঁচে থাকতে কশ্যপের কষ্ট হয়। মনের মধ্যে তার অস্থির উত্তেজনা।

দুরন্ত দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির নিষ্ঠুর অত্যাচারকে কশ্যপ মানুষের সন্তান হয়ে মেনে নিতে পারল না। ভাগ্যকে জয় করার জন্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিধিকে বিস্তৃত করার জন্য, জীবনের নিরাপদ এবং নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের জন্য তাদের পূর্বপুরুষরা সুদূর তুষার দেশ থেকে এসেছে এই অনুর্বর উষর মরু অঞ্চলে। কশ্যপ তাদের বংশধর। দেহের শিরা উপশিরায় তাদের রক্ত। তাদের মতই নিত্য নতুন অভিযানে বেড়িয়ে পড়ার সংকল্প জাগল তার মনে।

মহাপ্লাবনের জল কল কল করে মহানন্দে ছুটে বেড়াচ্ছে। তার ক্রীড়া চঞ্চল তরঙ্গের তর্জন গর্জন কশ্যপের নিভৃত মনকে স্পর্শ করে যায়। কোথায় যেন একটা নিবিড় মিল খুঁজে পায় তার সঙ্গে। অস্থির উত্তেজনা রক্তের মধ্যে চিন্ চিন্ করতে থাকে। গাছের সঙ্গে বাঁধা ভেলাটা ঢেউর বুকে খুশির দোলায় নাচছে। বাঁধন ছিঁড়ে বেড়িয়ে পড়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যেন। অজানা, অচেনা রহস্যাবৃত সমুদ্রপথ কশ্যপকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। প্রবল হাওয়ায় উড়ছে তার মাথা-ভরা কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। মন দুলছে। মুক্তির আকুলতায় বুক তার তোলপাড় করে।

দৌড়ে গিয়ে ভেলায় চড়ল। মহাদুর্যোগের মধ্যে অদিতি এবং পুত্রেরাও তার সঙ্গে ভেলায় উঠল। বাঁধন খুলে দিতেই ভেলা তীরবেগে সমুদ্রে গিয়ে পড়ল।

অজানা অচেনা রহস্যাবৃত সমুদ্র। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। মুখে তাদের নির্ভয় হাসি। চোখে কৌতুক। অজানা পৃথিবী আবিষ্কারের দুরন্ত উন্মাদনায় তাদের মন তখন নাচছে। নতুনকে দেখবার আগ্রহে তারা ব্যাকুল।

একরাত্রি কেটে গেল।

কোথায় কতদূর তারা এসেছে বুঝতে পারল না। কোনদিকে চলেছে, কোথায় চলেছে কিছুই জানে না। যেদিকে তাকায় সেদিকেই পর্বত প্রমাণ ঢেউ। মাটির চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও নেই। প্রবল হাওয়ার টানে ভেলা ছুটে চলেছে আপন খেয়ালে।

এমনি লক্ষ্যহীনভাবে ছুটতে ছুটতে ভেলাখানা আটকে গেল এক ডুবো পাহাড়ের গায়ে। প্রকাণ্ড ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে ভেলার উপর। ভেলাখানা দুলছে মোচার খোলার মত। ঢেউর ছিটে লেগে পশুর লোমশ চর্মের পোষাকও ভিজে ফুলে ঢোল হল। সেই সঙ্গে শোঁ শোঁ শব্দ করে ছুটে আসছে হিমেল ঝড়ো হাওয়া। চামড়ার আচ্ছাদন ভেদ করে ছাঁচের মত বিঁধতে লাগল বাতাস। ভয়াল সঙ্গীন অবস্থা হল তাদের।

আকস্মিক পর্বত সমান একটা ঢেউর ধাক্কায় ভেলা ছাড়া পেল ডুবো জাহাজের কবল থেকে। আবার শুরু হল নিরুদ্দেশ যাত্রা।

অভিযানের রোমান্স কশ্যপের আর নেই। নতুন পৃথিবীকে দেখা, অজানাকে জানার আর কোন উল্লাস উত্তেজনা তারা অনুভব করছে না। উদ্বিগ্ন ক্লিষ্ট মুখে মরণের আতঙ্ক। আশাহত যন্ত্রণায় মুষড়ে পড়ল কশ্যপ। মুহুর্মুহু কপালে করাঘাত করে সে তার নিবুদ্ধিতাকে গালি দিল। পুত্রেরাও তাকে অভিযুক্ত করল। উত্তাল ঢেউর বুকে এমন লক্ষ্যহীনভাবে দিন যাপন এবং মৃত্যুর প্রহর গণনা করার মত বেদনাদায়ক ঘটনা আর হয় না। সবার মুখে এক প্রশ্ন। কশ্যপ নিরুপায়। তাদের শান্ত করবার জন্যে রাগে ক্ষোভে-দুঃখে মাঝে মাঝে সে তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠে গর্জে উঠছে। এমন একদিন এল যখন তার রোষকষায়িত রক্ত চক্ষুর শাসন পুত্রেরাও মানছে না। তারা বিদ্রোহ করছে।

এদিকে ভেলার কাষ্ঠগুঁড়ির শিকলের আলিঙ্গনও আলগা হয়ে এসেছে। লতার গ্রন্থী জায়গায় জায়গায় ছিন্ন হয়েছে। যে কোন সময় ভেলার সমস্ত কাষ্ঠখণ্ড আলাদা আলাদা হয়ে পড়বে। সে কথা ভেবে কশ্যপের মন খারাপ হল। চোখে জল এল। নিজের

কাছে তাই কশ্যপের প্রশ্ন—কোথায় তার স্বপ্নের পৃথিবী ? কোথায় ? কোথায় ? আর কতদূর ?

অনাহারে, অমানুষিক পরিশ্রমে তাদের শরীরের জোর কমে আসছে। উজান স্রোতে ভেলার উপর উঠে আসা বড় বড় মাছই তখন তাদের একমাত্র খাদ্য। আর লবণাক্ত সমুদ্রের জল হল পানীয়। কিন্তু কয়েকদিনেই তাদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেল। রোগও প্রকাশ পেল।

অনেকগুলো দিন আর রাত্রি তাদের ভেলাতে কাটল। তবু ঝড়-বৃষ্টি কিছুই থামল না। সর্বক্ষণ হিমেল বাতাস বয়ে চলছে। শীতের কামড় সামলাতে তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া এবং হাতাহাতি করে গা উত্তপ্ত রাখল।

হঠাৎ, একটা বিশাল ঢেউর ঠোকাঠুকি লেগে ভেলাটা টুকরো হয়ে গেল। কশ্যপ ছিটকে পড়ল উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল সমুদ্রের বুকে। একটা বিরাট আলোড়ন তুলে তার শরীরটা সমুদ্রের জলে পাক খেতে লাগল। তখনও পর্যন্ত জ্ঞান হারায়নি কশ্যপ। বাঁচবার জন্য স্রোতের সঙ্গে প্রাণপণে যুঝতে লাগল। ভেলার কাষ্ঠখণ্ডটি তার খুব নিকটেই দেখতে পেল। কিন্তু নাগালে পাচ্ছিল না। স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে বহুকষ্টে কাষ্ঠখণ্ডটি সে আঁকড়ে ধরে চড়ে বসল। হাঁ করে করে বড় বড় শ্বাস নিতে লাগল। তারপর, কাষ্ঠখণ্ডের গায়ে গা মিশিয়ে সে শুয়ে থাকল। সমস্ত শরীরটা তার ঢেউর দোলায় দুলছিল। স্রোতের ঝাপ্টায় প্লাবিত হল দেহ। এরপর আর কিছু মনে নেই তার। চেষ্টা করেও অতিরিক্ত আর কিছু মনে করতে পারল না সে।

পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকাল কশ্যপ।

একগুচ্ছ ফুল নিয়ে দিতি তার সামনে' দাঁড়িয়ে। তার দিকেই তাকিয়ে আছে সে। চোখে তার খুশির ঝলক। কি যেন ভাবছে সে। বন্ধ ঠোঁট দুটিতে কিসের স্তব্ধতা। কশ্যপ তার চাহনির অর্থ বুঝতে পেরে কাছে ডাকল। হাত থেকে ফুলের গুচ্ছটি নিল। একটি ফুল তার চুলে গুঁজে দিল। কৃতজ্ঞ চোখে তার দিকে তাকিয়ে মিট্‌মিট্ করে হাসে। হাসিতে তার আহ্বানের সংকেত।

কশ্যপ ইশারা করে দিতিকে ডাকল। পাশে বসতে বলল তাকে নারীর সংকোচ দিতিকে দ্বিধান্বিত করল। একটু তফাতে বসল। তার মুখে লজ্জার ঝলক লাগল। কশ্যপের দিকে তাকিয়ে চোখ নামাল দিতি। পরক্ষণেই চোখ তুলে তাকাল। দৃষ্টিতে তার জিজ্ঞাসা। মুখে উৎকণ্ঠা। কপালে ছোট্ট একটা রেখা গাঢ় হয়। কশ্যপ অবাক হল। কৃতজ্ঞ চোখে তার জিজ্ঞাসা জাগল। কেউ কারো ভাষা বোঝে না। বোবা কষ্টের ছায়া ঘন হয় তাদের চোখে।

দিতির উৎকণ্ঠা উদ্বেগ তার মুখে ছায়াপাত করল। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিতে আহ্বান কিংবা প্রশ্নের কোন সংকেত ছিল না। ছিল বিভোরতা। বোবা ঠোঁটে না বলা কথার কাঁপন। মুখের অভিব্যক্তিতে প্রিয়জন সম্পর্কিত কৌতূহল।

কশ্যপের নীল চোখে কৌতুক। পঞ্চদশী দিতির ভীরু অভিব্যক্তির ভাষা সে বুঝল। কিন্তু কি করে বোঝাবে তাকে? তার মুখে একটা অস্বস্তির ভাব ফুটে বেরোল।

কশ্যপের শ্মশ্রু হীন কোমল মুখ আর আয়ত নীলরঙের উজ্জ্বল চোখে খুসির ঝলক দিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আকর্ণ বিস্তৃত ঠোঁটে স্নিগ্ধ হাসির দ্যুতি। সেই হাসিতে সেতু স্থাপনের প্রয়াস। সেতু, নিজের কুল থেকে দিতীর কুলের দিকে। ইংগিতের ভঙ্গীতে বুকে হাত রেখে নিজেকে দেখিয়ে অর্ধস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলঃ কশ্যপ! কশ্যপ।

থমথমে স্তব্ধতার অবসান হয়। মুক্ত প্রাণের কল্লোল জাগে বুকের রক্তে। আশার নাকারা বাজে দ্রিমি দ্রিমি করে। উদ্দীপ্ত উন্মুক্ত দুই চোখে দিতির ব্যগ্র কৌতূহল। কশ্যপের লোমশ বুকে কোমল আঙ্গুল ছুঁয়ে তার কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে প্রশ্ন করল কো-শ্য-প! তুমি কোশ্যপ! চোখের তারায় তার খুশির নাচন।

কশ্যপের উজ্জ্বল নীল চোখে খুশির বন্যা। হাত দিয়ে দিতির নরম আঙ্গুলগুলো বুকে চেপে ধরে সে ঘন ঘন মস্তক আন্দোলিত করে তার উক্তির সাড়া দিল।

দুই স্তনের মধ্যদেশে দিতি নিজের হাত রেখে বলল : দিতি-দিতি। অহি। (ঋগ্বেদে প্রাক্ আর্যযুগের সিন্ধু উপত্যকাবাসীদের অহি, দাস ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে)।

দিতি শুনে চমকে উঠে কশ্যপ। মুহূর্তে বদলে যায় তার মুখের ভাব। কষ্টবিদ্ধ যন্ত্রণায় কাতর তার দুই চক্ষু। ক্ষণকাল পরেই কশ্যপ মন্ত্রমুগ্ধের মত দুই হাতে দিতির মুখটি তুলে ধরল তার নিজের মুখের খুব কাছে। চোখের উপর চোখ রেখে দিতিকে অবাক চোখে দেখতে লাগল। তন্ন তন্ন করে কি যেন খুঁজল তার দুই চোখে।

দিতির চোখ স্থির। পলক পড়ে না। পাতলা ঠোঁট থর-থর করে কাঁপে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে নাকের ডগায়। ওর নাসারন্ধ্র থেকে তৃপ্তির উষ্ণ নিঃশ্বাস কশ্যপের হাতে পড়ে।

শিহরণ জাগল তার বুকে। দিতির মুখে হাত বোলাল। গালের উপর গাল রেখে বায়ুস্বরে বলল-দি—ই—তি—ই। নিজের দিকে আঙ্গুল নির্দ্দেশ করে বলে—দাইবা। (ভারতে আর্যদের যে শাখাটি এসেছিল তারা দাইবা নরগোষ্ঠির লোক)।

দিতি কথা বলতে পারে না। এক নামহীন ইন্দ্রিয় অনুভূতির তৃপ্তিতে তনুমন আচ্ছন্ন। ওর ভাল লাগার এক আশ্চর্য মুগ্ধতা নিয়ে কশ্যপ তাকে দেখে। হঠাৎ, দিতির মনে হল, কশ্যপ নিজেকে 'দাইবা' বলেছে। তার মানে দেবতার বংশধর সে! অমনি ওর সচেতন অনুভূতি ওকে সাবধানের সংকেত করে, সহজ আর স্বাভাবিক থাকার জন্য। কিন্তু তার শঙ্কিত অনুভূতির মধ্যে বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গেল। দেবতা বোধে সে ঝটিতি নিজেকে কশ্যপের নিশ্ছিদ্র সান্নিধ্য থেকে মুক্ত করল। একটা ভীরু দ্বিধা, সংকোচ, নিয়ে সে একটু সরে দাঁড়াল। কিন্তু তার চোখ ছিল কশ্যপের ডাগর নীল আঁখির উপর। কশ্যপ কিছু বোঝার আগে একটা হাসির শব্দ করে সে তার পায়ের ধূলো মাথায় নিল।

মাটিতে থপ্ করে বসল দিতি। একটি কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে দ্রুত হাতে মাটির উপর আকাশ, সূর্য, পৃথিবী, পাহাড়ের ছবি আঁকল। কশ্যপের এবার অবাক হওয়ার পালা। আকাশ, পৃথিবী, সূর্য,

পাহাড়ের নিখুঁত ছবি তাকে আশ্চর্য করল। এত আশ্চর্য তার জীবনে কখনও হয়নি সে। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে দিতির মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবে, এ কন্যা কে? বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে হাতের মুঠোয় ধরে রাখার এরকম আশ্চর্য শক্তি সে পেল কোথা থেকে? কি করে? বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

কশ্যপের মুগ্ধতা পঞ্চদশী দিতির মনকে চমৎকৃত করে। একটা আশ্চর্য গৌরব বোধ চোখে মুখে আনে লজ্জার অভিব্যক্তি। ঠোঁটের কোণে দিতির হাসি। ঝিলিক হানা দৃষ্টি তার চোখে।

মাটিতে অঙ্কিত রেখার উপর আঙ্গুল ছুঁয়ে দিতি জানতে চাইল, কশ্যপের ঘর ঐ আকাশ কি না? সূর্য কি তার পিতা?

দিতির ভাষা কশ্যপ বুঝতে পারল না। কিন্তু তার অঙ্কিত সূর্য, আকাশ দিতির অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা তার কাছে সহজ করে তুলল। কিন্তু দিতিকে বোঝানোর মত ভাষা তার ছিল না। তাই মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না। কেবল, ফ্যাল্ ফ্যাল করে অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে বেশ কিছুক্ষণ লাগল। অকস্মাৎ মস্তক আন্দোলিত করে সে দিতির জিজ্ঞাসা সমর্থন করল। এবং সূর্যকে দেখিয়ে দু'হাত যুক্ত করে প্রণাম করল। সংকেতে বোঝাল, সে ঐ সবিতা, তপনের সন্তান। তারপর, নিজের ভাষা কলকলিয়ে উঠল তার কণ্ঠে। বলল: সূর্যের করুণা না থাকলে পৃথিবী ধ্বংস হত। সূর্যের জন্যেই পৃথিবীর গাছ-পালা, মানুষ বেঁচে আছে। সূর্যই পারে অন্ধকার দূর করতে। সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয় পৃথিবী। সূর্যের উদয়ে কাননের নিদ্রাভঙ্গ হয়। নদী উৎফুল্ল হয়। বাতাস উতলা হয়। গাছপালার শাখায় শাখায় রোমাঞ্চ জাগে। পাখীরা গান গায়। মৌমাছিরা গুঞ্জন করে। চেতনার মধ্যে আনন্দের শিহরণ জাগে। সর্বত্র প্রাণের হিল্লোল বয়ে যায়।

বলতে বলতে কশ্যপের গলার আওয়াজ উদাত্ত সুরেলা হয়ে উঠল। দুই চোখ বন্ধ হয়ে গেল। যুক্ত করে সবিতার বন্দনা করে বলল:

শং নঃ সূর্য্য উরুচক্ষ উদেতু।
শং নঃ নশ্চতস্রঃ প্রদিশো ভবন্তু।
শং নঃ পর্বতা ধ্রুবয়ো ভবন্তু।
শং নঃ সিন্ধবঃ শন্নু সস্তাপঃ।

কশ্যপের ভাষা বুঝল না দিতি। কিন্তু তার মৃদঙ্গমন্দ্রিত কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য, শব্দের ধ্বনি মাধুর্য, ছন্দের লীলায়িত কল্লোল, সুরের আকর্ষণ দিতিকে অভিভূত করল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুকের মধ্যে তা দ্রিমি দ্রিমি করে বাজতে লাগল। কশ্যপের কণ্ঠে যাদু, ওর শরীরকে থর-থর করে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল—বাইরে না, ভিতরে ভিতরে এবং নিজেকে ওর ভীষণ দুর্বল লাগছিল। মনে হচ্ছিল; একটা কোন শক্ত আশ্রয় না পেলে সে আর দাঁড়াতে পারবে না। তবু দ্বিধার অচল স্থানুত্বে সে বাঁধা রইল। বুকের মধ্যে কি যেন চিন্ চিন্ করছিল। কটিতলে দুই জঙ্ঘার সন্ধিতেও কিসের অস্বস্তিকর অনুভূতি রক্তের শিরায় শিরায় গরম প্রবাহের মত প্রবাহিত হচ্ছিল।

দেহের প্রবৃত্তিগত এই জটিল অনুভূতি সম্পর্কে দিতির কোন ধারণাই নেই। প্রবৃত্তি বেগ আপনার নিয়মেই ক্রিয়াশীল হয়ে এক নবতর অনুভূতি দিল তাকে। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে তাই সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা বলতে পারল না।

মেঘ ফোটা রোদের বিস্তার ক্রমে ছোট হয়ে আসে। সবুজ গাছ-গাছালির উপর পড়ন্ত বিকেলের ম্লান ছায়া ক্রমেই ফিকে হয়ে যাচ্ছে। ঘরে ফেরা পাখীর পাখা ঝাপ্টার শব্দ বাতাসে ভাসছে। দু'একটা করে ঝিঁ-ঝি ডাক আরম্ভ করেছে।

দিতিকে খুব উদ্বিগ্ন দেখাল। চোখের পাতায় দুশ্চিন্তার ছায়াঘন নিবিড় হল। অনেকটা আচ্ছন্নের মত কশ্যপকে দেখছিল। কিন্তু দৃষ্টিতে ছিল উদাস, অন্যমনস্কতা।

কশ্যপের চোখে অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা। মুখে কৃতজ্ঞতার হাসি।

কশ্যপকে নিয়ে কি করবে দিতি ভেবে পেল না। এখনি তার জন্য দরকার একটা নিরাপদ আশ্রয়। কোথায় মিলবে সে স্থান? সর্বাগ্রে নিজের গৃহের কথা মনে পড়ল তার। ভিন্‌দেশের এক মানুষকে আনলে সেখানে হয়ত অনেকভাবে বিব্রত হতে হবে তাকে। বিমাতার সন্দেহ, কৌতূহল, কৈফিয়তের কথা ভেবে সে সংকুচিত হল। সঙ্গে সঙ্গে একটা উৎকণ্ঠিত কষ্ট বুকের কাছে অনুভব করল। কশ্যপ সুদর্শন যুবক। সুঠাম চেহারা, গৌরবর্ণ, টিকল নাক, টানা টানা উজ্জ্বল নীল চোখ, সোনালী চুল, টকটকে লাল ঠোঁট, রাঙা মুখ, ঝকঝকে সাদা দাঁত, অনির্বচনীয় হাসির সুধা স্নিগ্ধ মাধুর্য যে কোন বয়সের নারীকে প্রলুব্ধ করে। বিশেষ করে যে দেশে তার মত কন্দর্পকান্তি-যুবকের একান্ত অভাব। দিতি তার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সেই অনুভূতির স্বাদ পেল। তার নানা অনুভূতির মধ্যে কেমন একটা ভীরু শঙ্কা জাগল। যার সঙ্গে একটা হারানোর বেদনাবোধ ছিল। তার কিশোরী হৃদয়ে একটা উৎকণ্ঠিত কষ্ট অনেকগুলি নারীকে নিয়ে পাক খাচ্ছিল। সেই সংশয় সন্দেহ থেকে তার বিমাতা, ভগিনী কাষ্ঠা, তাম্রা, বিশ্বা, সিংহিকা, প্রিয়সখী অরিষ্টা, সুরসা, সুরভি, দনু কেউ বাদ ছিল না। তাদের অস্তিত্ব কাঁটার মত খচ্ খচ্ করছিল। ঈর্ষায় চিন্ চিন্ করছিল বুক। সমস্ত স্নায়ুর মধ্যে তাদের কথাটা যন্ত্রণায় পাক দিচ্ছিল। আর কেমন একটা অসহিষ্ণুতায় আকুল হল তার অন্তঃকরণ। প্রতিবন্ধকতাকে জয় করবার সতর্কতা তাকে আত্মসচেতন করল। কশ্যপকে গৃহে নিয়ে যাওয়ার বিপদ সম্পর্কে সজাগ হল সে।

আচ্ছন্নের মত মাথা নাড়ছিল দিতি। যার অর্থ নানাবিধ এবং অপরিচ্ছন্ন। ওর ঘোর আচ্ছন্নতার মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলো আশ্চর্যরকমভাবে সজাগ। তাই অনুভূতির ভেতর থেকে একটা কষ্ট, ধোঁয়ার মত কুণ্ডলি পাকিয়ে গলার কাছে উঠে আসে। নিঃশ্বাস বুকের কাছে আটকে যায়। বদ্ধ নিঃশ্বাসের কষ্ট সন্ধ্যারাগের মেঘের মত বুকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

আকাশ, নদী অন্ধকার হয়ে আসে। প্রকৃতি নীরব। কোন শব্দ নেই।

মৃদু বাতাস কেবল চুপিসারে নদীকে প্রেম নিবেদন করছে। কুমারীর প্রথম প্রেমের হর্ষ ও সুখের আনন্দের মত তরঙ্গ খেলে যায় তার বুকে। তীব্র ব্যথা টনটনিয়ে উঠল দিতির বুকে। দেহ কাঁপে। শরীর অবসন্ন বোধ হয়। রক্ত করবীর পাতা খামচে ধরে। আর আপন মনে মাথা নাড়ে; আর বিড় বিড় করে। —না, না কিছুতেই না। কশ্যপ শুধু তার। বিধাতাই দিয়েছে তাকে। প্রাণ থাকতে তাকে দেবে না কাউকে। কশ্যপকে সে লুকিয়ে রাখবে পাহাড়ের নিষিদ্ধ গুহায়।

বিশাল পাখীর ডানা ঝাপ্টার শব্দে সহসা তার স্বপ্নের ঘুম ভেঙ্গে গেল। আত্মসম্বিৎ পেল। প্রাণের দিগন্ত জুড়ে কশ্যপের রহস্যের দ্যুতি। নিজের প্রাণও তার দ্যুতিময় হয়ে উঠেছিল। নিখাদ আবেগে ওর প্রাণ ছিল পরিপূর্ণ।

কাছেই শুকনো পাতার মড় মড় শব্দ শোনা গেল। ঘাসবনের মধ্যে বড় রকমের জন্তু নেই। রয়েছে খরগোশ, ইঁদুরের মত ছোট ছোট নিরীহ প্রাণী। তাদের চলা ফেরার শব্দ। তবু দিতি সজাগ হল। এক মুহূর্ত দেরী না করে উঠে দাঁড়াল। এখানে থাকা তার মোটেই নিরাপদ নয়। অথচ, এটা সে ভুলে গিয়েছিল একেবারে। খরগোসের পায়ের শব্দ না পেলে তার মনেই পড়ত না। এখনি ধীবর পল্লীর লোকেরা এই পথ ধরেই ঘরে ফিরবে। এভাবে তাদের দেখলে চেঁচামেচি সুরু করবে। লোকজন ডেকে কশ্যপকে দেখিয়ে ছাড়বে। গুণীন ওঝারাও আসবে আশ্চর্য মানুষ দেখতে। কশ্যপকে তারা দেবতা বলে মানবে না। অপদেবতা ভেবেই হয়তো তার উপর অকথ্য অত্যাচার করে হত্যা করবে। প্রাচেতসের কন্যা হলেও কশ্যপের জীবন সে রক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু কি করবে ভেবেও পায় না? কেবল একটা কষ্ট মস্তিষ্কে বিদ্ধ হয়।

চোখের সামনে তার লুকোনোর নির্বিঘ্ন জায়গাগুলো ভাসছিল। কশ্যপের চোখের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত কি ভেবে নিল। তারপর কশ্যপের হাত টেনে ধরে দৌড়তে লাগল।

॥ দুই ॥

পাহাড়ের উঁচু মাথায় পরপর অনেকগুলি গুহা আছে। আদিম মানুষ এককালে সেখানে থাকত। আজ তাদের কোন চিহ্ন নেই। পরিত্যক্ত এই গুহায় কশ্যপকে থাকার জায়গা করে দিল দিতি। লোকালয়ের বিশাল সমৃদ্ধি এবং বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র জন্তু জানোয়ার বিদায় নিয়েছে। গভীর অরণ্যের দিকে সরে গেছে তারা। জায়গাটি তাই ভীষণ নির্জন এবং আত্মগোপনের পক্ষে নিরাপদ। ভুলেও কোন মানুষ আসেনা এখানে।

এই স্থানটি দিতির দখলে। প্রায়ই সে আসে এখানে। দীর্ঘক্ষণ কাটিয়ে ঘরে ফিরে যায়। জায়গাটির একটা নিজস্ব আকর্ষণ আছে তার কাছে। সেই আকর্ষণের টানে দিতি আসে। এখান থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। এই দেখার রোমাঞ্চ দিতির ভাল লাগে।

ছোট থেকেই দিতি অনুভূতিপ্রবণ। সব কিছুর মধ্যে একটা গভীর কিছু অনুভব করতে চায়। নিরিবিলি ছাড়া সে উপলব্ধি হয় না। ভাবুক ব্যক্তি মাত্রেই নির্জনতা পছন্দ করে। সেই আকর্ষণের টানেই পর্বতশিখরের এই গুহার আকস্মিক সন্ধান পেয়েছিল। সেও একটা স্মরণীয় গল্প তার জীবনে।

দিতি তখন ছোট। ইস্পাতের একটি ধারালো কাটারি নিয়ে এটা-সেটা কাটতে মজা পাচ্ছিল সে। এটা ছিল তার একটা খেলা। সে খেলায় ছিল শিশুর কৌতুক আর বিস্ময়। উচ্ছ্বাস আর উৎসবের বশেই সে ঝোঁকের মাথায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মেষ শাবকের ঘাড়ে কোপ বসিয়ে দিল। অমনি ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল। দেহ তার মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। মাটি ভিজে লাল হল। কয়েক ফোঁটা উষ্ণ রক্ত তার গায়ে গিয়ে লাগল। হঠাৎ হক্‌চকিয়ে গেল দিতি। শঙ্কায় তার মুখের রঙ গেল বদলে। ঠোঁট শুকিয়ে গেল। মেষ শাবকের যে এরকম পরিণতি হবে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি।

তাই, মুষড়ে পড়ল সে। পরমুহূর্তে একটা প্রবল ভয় জাগল তার অন্তরে। কিছুই স্থির করতে না পেরে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে লাগল। একদমে অনেকখানি পথ দৌড়ে এসে সে হাঁফাতে লাগল।

মেষ শাবকের যন্ত্রণার দৃশ্য তার চোখে ভাসছিল। মনেতে স্বস্তি পাচ্ছিল না। আপন মনে এদিক সেদিক করে ঘুরে বেড়াল। অন্যায় অপরাধ এবং পাপবোধের নানারকম মিশ্র চিন্তা, অনুভূতির প্রতিক্রিয়া তাকে বিব্রত করল। অবশেষে, সব চিন্তা ছাপিয়ে একটা প্রবল অসহায়তাবোধ তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করল। মনে হল, তার কেউ নেই, কিছু নেই। সম্পূর্ণ একা সে। এই পৃথিবীতে তার মত দুঃখী আর কেউ হয় না। অমনি একটা আকুল করা কান্নায় তার দুনয়ন প্লাবিত হল।

বহুদূরে একসঙ্গে অনেকগুলি মানুষের গলার আওয়াজ দিতি শুনতে পেল। অমনি ভয়ে বিবর্ণ হল তার মুখ। হৃৎপিণ্ডের গতি স্তব্ধ হল। উৎকর্ণ হয়ে অনুধাবন করতে লাগল সে স্বর। বুকের মধ্যে তার ঝড় উঠল। বিমাতা হয়ত তারই অনুসন্ধানে লোক পাঠিয়েছে। এখন তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে হয়ত আসছে তারা। উপায়? পিতা প্রাচেতস গৃহে নেই। বিদেশে বাণিজ্য করতে গেছেন। বিমাতাকে নিবৃত্ত করার কেউ নেই। দিতি আর ভাবতে পারে না। মাথার মধ্যে তার ঝিম্ ঝিম্ করে। অসহায়ের মত কাঁদতে কাঁদতে সে বনের মধ্যে দিয়ে ছুটছিল। আর লুকোনোর মত একটা নির্জন আড়াল খুঁজছিল। পাহাড়ে নিরাপদ আশ্রয় হবে ভেবে সে ক্রমাগত উপরের দিকে উঠছিল। অবশেষে থাকার মত একটা সুন্দর আশ্রয় সে পেল। সুস্বাদু ফলের অনেক গাছ তার নজরে পড়ল। ফলগুলি তার নাগালে ঝুলছিল। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছিল। দুটো ফল ছিঁড়ে খেল। ঝর্ণার জল পান করল। তারপর সে চতুর্দিক একবার ভাল করে দেখল। বহুদূর পর্যন্ত সে দেখতে পাচ্ছিল। তাদের প্রাসাদের চূড়াও এখান থেকে ছোট দেখাচ্ছিল। স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল তার। নিজেকে তার সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে হল। তারপর কখন ক্লান্ত হয়ে

পাহাড়ের গুহায় ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না। বহুদিনের কথা। তবু দিতির সব মনে আছে।

সেই থেকে এই জায়গা দিতির দখলে। ভুলেও সে এ'স্থানের গল্প কাউকে করেনি। শূন্যতার কষ্টে মনটা যখন হাঁফিয়ে উঠে তখন একা সে আসে এখানে। দিগন্তের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে। এই তৃপ্তির কোন অর্থ নেই। কিন্তু আকর্ষণ আছে। এই আকর্ষণ অবশ্য নির্জনতার। নির্জন বলেই নিঃসঙ্গ মনের যন্ত্রণা দুঃখ গভীর হয়। অনুভূতির সেই গহনে আচ্ছন্ন হয়ে থাকার নেশায় দিতির চিত্ত আকুল। নির্জনতার সেই আস্বাদের লোভে দিতি আসে এখানে।

কিন্তু এপাহাড় নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। যদিও এই পাহাড় সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প আছে। প্রাচীনদের মুখে সেই সব গল্প শোনে শিশুরা। তারপর তারাও একদিন বৃদ্ধ হয়ে তাদের নাতি নাতনীদের গল্প শোনায়। এমনি করে বংশ পরম্পরায় সে গল্পধারা চলে আসছে লোকের মুখে মুখে। কোন কোন ঘটনা আবার কারো কারো পরিবারে বিশেষ মর্যাদা পায়। সেজন্য তার আত্মশ্লাঘাও করে। পূর্বপুরুষদের কীর্তি ও কৃতিত্ব গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করে এক ধরণের তৃপ্তি ও গর্ব অনুভব করে তারা। সমাজে তারা সম্মান ও মর্যাদাও বেশি পায়। কশ্যপকে এরকম অনেক গল্প শুনিয়েছে দিতি।

কশ্যপ ও দিতির আলাপের মধ্যে ভাষা এখন আর কোন বন্ধন নয়। চিত্রধর্মী লিখন পদ্ধতির সাহায্যে দিতি কশ্যপকে তাদের ভাষা শিখিয়েছে। চিত্রের ভাষা পৃথিবীর সর্বত্র এক। সেই চিত্রকে তারা ভাষার লিখ্যরূপ দিয়েছে। ভাব ও ভাষার পার্থিব বস্তুর চিত্রের সংকেত রূপ ব্যবহার করার কৌশল কশ্যপকে বিস্মিত করল। এ রকম সহজ পন্থায় যে মনের আকৃতির একটা স্থায়ীরূপ বোধগম্য করে আঁকা যায় এ অভিজ্ঞতা কশ্যপের নতুন। লিখন পদ্ধতির এই কৌশলটি আয়ত্ত করার গল্প কশ্যপ দিতির মুখে শুনল।

দিতির পূর্বপুরুষ বর্চ্চিনদাস সিন্ধু উপত্যকার রাষ্ট্র সংঘের যোগাযোগ-কারী একজন রাজনৈতিক কর্মচারী। কার্যোপলক্ষে রূপার, লোথাল, ঝাঙর, হরিয়ূপীয়া, চানহুদড়ো মহেঞ্জোদড়োর বিস্তৃত অঞ্চলগুলিতে প্রায়ই তাকে যাওয়াআসা করতে হত। নরপতিদের আদেশ নির্দেশ তাকে মুখে মুখেই বহন করতে হত। মানুষের স্মৃতিশক্তি যত প্রখরই হোক না কেন, অনেক কথাই তার পক্ষে মনে রাখা শক্ত। অনেক সময় ভুল হত। ফলে, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অভিমত নরপতিদের কখনো কখনো অগোচরে থেকে যেত। এজন্য নানারকম গোলমালও হত। এই সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায বর্চ্চিনদাস সর্বক্ষণ চিন্তা করত। কিন্তু কোন কিনারা খুঁজে পেত না। তবু সে ভাবত, কেউ যখন কথা কয় তখন কতকগুলো সংকেতে সে তার একটা ছবি তৈরী করে। এই ছবি তৈরীর কাজটা করতে হবে তাকে। কিন্তু কি করে? নিজেকেই প্রশ্ন করে বর্চ্চিনদাস।

মনের আকুল করা জিজ্ঞাসার জবাব অকস্মাৎ একদিন পেল সে। কলিবঙ্গান থেকে নদীপথে হরিয়ুপীয়া যাচ্ছিল। হঠাৎ তরী ঠেকল এক চড়ায়। অল্প জল সেখানে। কাছেই বিস্তৃত ভূখণ্ড জল থেকে সদ্য মাথা তুলেছে। জোয়ারের জল নেমে যেতে পাখির ঝাঁক এসে বসল সেখানে। নরম মাটির উপব তাদের পায়ের অবিকল ছাপ পড়ল। বর্চ্চিনদাস অবাক হয়ে গেল সে দৃশ্য দেখে। অনুভূতির মধ্যে তার অব্যক্ত আলোড়ন। কি তার অর্থ স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে পারল না। কেবল, অনুভবের কষ্ট, যন্ত্রণায় তীব্র হল। স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির মত সে নৌকা থেকে অবতরণ করল। নরম মাটিতে পা রাখল। অল্প চাপ দিয়ে দেখল, তারও পায়ের ছাপ অবিকল পড়েছে সেখানে। একটা নতুন কিছু আবিষ্কারের উল্লাসে তার তাজা তরুণ প্রাণ নেচে উঠল। আনন্দে উত্তেজনায় ঠকঠক করে কাঁপছিল সে। এর আগেও নরম মাটিতে, বালিতে, তার পায়ের ছাপ দেখেছে। কিন্তু সেসব এমন করে রেখাপাত করেনি মনে। বর্চ্চিনদাসের কাছে হঠাৎ তা অর্থবহ হয়ে উঠল। মনে

হল যুগ যুগান্ত ধরে সে যা খুঁজছিল এই নির্জন সৈকত ভূমিতে তার সন্ধান সে পেয়েছে। জিজ্ঞাসা নিবিড় চোখ মেলে সে চরের বুকে আরো কিছু খুঁজতে লাগল। চরের উঁচু ঢিবির শুকনো মাটিতে পক্ষীকুলের অগণিত পদচিহ্নের হিজিবিজি ছাপ তাকে জিজ্ঞাসায় অন্যমনস্ক করে দিল। অনুসান্ধিৎসু নিবিষ্ট দৃষ্টি কি যেন একটা স্পষ্ট করে অনুভব করতে চেষ্টা করল। অনুভূতিকে একটা গণ্ডীর মধ্যে এনে সে তার চিন্তার সূত্র অন্বেষণ করতে লাগল। ধীরে ধীরে তার দুই চোখ উদ্দীপ্ত আর উজ্জ্বল হল। পর মুহূর্তে একটা নিবিড়তা নেমে এল। আশার নাকাড়া বাজল বুকের ভেতর। বর্চ্চিন দাসের অনুভূতির মধ্যে হঠাৎ বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল। আনন্দ কল্লোলিত স্বর বাজল তার কণ্ঠে। চিৎকার করে বলল: পেয়েছি, পেয়েছি। এবার পেয়েছি।

শিশুর মত উল্লসিত আনন্দের উচ্ছাস তার সঙ্গীদের হত চকিত করল। কৌতূহলিত হল তারা। বিস্মিত জিজ্ঞাসা নিয়ে তারা তাকে ঘিরে ধরল। দুলভ কোন বস্তু দেখার আশায় সঙ্গীরা তার হাতের দিকে তাকাল, পায়ের নিচে দেখল। সন্ধানী দৃষ্টি মেলে চারপাশ খুঁজল। কোথাও কিছু না পেয়ে একজন সাহস করে জিজ্ঞাসা করল: মহাশয়ের কি লাভ হল?

বর্চ্চিনদাসের উত্তেজিত আনন্দের আচ্ছন্নতা চেতনায় ত্রস্ত হয়েছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল: না। ও কিছু না। তোমরা বুঝবে না।

লোকটি বলল: বোঝালে বুঝব না কেন? খুলেই বলুন ব্যাপারটা।

বর্চ্চিনদাসের চোখের সামনে ভাসতে লাগল পক্ষীকুলের অগণিত পদচিহ্নের ছবি। একমুহূর্তে সে বিভিন্ন ভাবনাগুলোকে মনের মধ্যে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে ঢিবিটাকে দেখিয়ে জিগোস করল: আচ্ছা ঋভু, তুমি বল, শক্ত মাটির উপর এ দাগগুলো কিসের?

এরকম একটা সহজ প্রশ্নে ঋভু অবাক জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে স্বাভাবিক স্বরে বলল : ওগুলো পাখীর পায়ের ছাপ। একটা নয়, অসংখ্য পাখীর পায়ের ছাপ। একটার উপর আর একটা পায়ের দাগ পড়ে আগের ছাপ ভেঙে গেছে, মুছে গেছে। কিন্তু শেষের দাগটি সবসময় রয়েছে উজ্জ্বল।

বর্চ্চিনদাসের দুই চোখ আনন্দে চক্-চক্ করছিল। মুখ টিপে হাসছিল। অজস্র কথা ও জিজ্ঞাসা একসঙ্গে তার মনে উথালি পাথালি করে উঠল। কাঁপা কাঁপা গলায় গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করল : আর কিছু দেখছ ঋভু ?

বর্চ্চিনদাসের মুখখানা দুরন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল। ঋভুর চোখে কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসু নিবিষ্ট দৃষ্টি। ওর চোখের দৃষ্টি দেখে বর্চ্চিনদাস বুঝল, ঋভু বলতে পারবে না। তাই অন্য একজনকে চোখের ইশারা করে তার জিজ্ঞাসার জবাব চাইল। সেই মুহূর্তে ঋভু বলল : কিছু কিছু পক্ষীশাবকের ছোট ছোট পায়ের চিহ্নও এর সঙ্গে মিশে আছে।

জোরে জোরে মস্তক আন্দোলিত করে বর্চ্চিনদাস ঋভুর উত্তর তারিপ করে বলল : হাঁ-ঠিক। ঠিক তাই। তা-হলে এ থেকে আমরা কি সিদ্ধান্ত করতে পারি ? বল ?

ঋভু জবাব দিল না। চুপ করে থাকল। বর্চ্চিনদাস ঋভুর কাঁধে হাত রেখে হাসতে হাসতে বলল, এই নির্জন সৈকতে এসে ভাষাকে লিপিবদ্ধ করার কৌশল শিখলাম এই যাযাবর পাখীদের কাছে। এ ঋণ আমার কোনকালে পরিশোধ হবে না।

বর্চ্চিনদাসের কথা বুঝতে না পেরে ঋভু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল। বর্চ্চিনদাস তার বিস্মিত নীরব চাহনি দেখে হাসল। কিন্তু তার স্থির দৃষ্টিতে ছিল গভীর মনোযোগের সংকেত। মনে মনে সে যে কিছু চিন্তা করছিল তা তার চাহনি থেকেই বোঝা গেল। অন্যদিকে তাকিয়ে বলল : জান ঋভু, আমরা যখন কথা বলি, তখন মনে তার একটা ছবি তৈরী হয়। অন্যের মনে সেই ছবিটি প্রতিফলিত করার জন্য বস্তু জগতের রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের সাহায্য নিই। চৈতন্যের

ভিতর দিয়ে বস্তুর সেই ভাবরূপ রসরূপ আভাসিত হয় অন্যের মনে। যেমন, এই পাখীর পদচিহ্ন তোমার অনুভূতিতে যে সাড়া জাগাল তার ভাবরূপ, তুমি ভাষায় প্রকাশ করলে। বস্তুর এই চিত্ররূপ রেখার বন্ধনে আঁকলে একজনের ভাব ও ভাষা অন্যজনে বুঝতে পারবে। চিত্রের নিজস্ব ভাষাতেই তা অন্যের মনে প্রতিফলিত হবে। ভাষার সংকেতরূপে কাজ করবে এই চিত্রমালা। যেমন অসংখ্য পক্ষীর পদচিহ্নের মধ্যে, কিছু কিছু পক্ষী-শাবকের পদচিহ্নের অস্তিত্ব খুঁজে পেলে তুমি। এবং নির্ভুলভাবে তোমার মনের দর্পণে তা প্রতিফলিত হল। ঠিক এই রকম চিত্ররীতির মাধ্যমে আমরাও দূরের মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারি। মনের ভাবকে চিরস্থায়ী করে রাখতে পারি।

ঋভু অবাক আর মুগ্ধ হয়ে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বর্চ্চিনদাসের চিন্তার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা ছিল না। সাধারণ যুক্তি অবশ্যই ছিল। তবু ঋভু একবাক্যে স্বীকার করল না তাকে। মনে মনে সেও বিচার করছিল। চমকিত বিস্ময়ে সে কটিদেশ থেকে আত্মরক্ষার ব্রোঞ্জের ছুরিটি তুলে নিয়ে মাটির উপর আঁক কাটল।

ঋভু জাত শিল্পী ছোট একটুকরো পাথরের সাহায্যে পাহাড়ের গায়ে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকে। যা দেখে তাই সে নিখুঁত আঁকতে পারে। কিন্তু মনের আকৃতির কোন ছবি হয় কি-না, ঋভু জানে না। কোন দিন চেষ্টা করে দেখেনি। বর্চ্চিনদাসের কথাটা তার মনে ধরল। তাই দেরী না করে সে যা বলতে চায়, তার ছবি আঁকল। একটা নয়, অনেকগুলো। সব মিলিয়ে তার একটা মনের কথাকে প্রকাশ করল। আঁকা শেষ করে ঋভু একাগ্র দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকিয়ে রইল। প্রথম পংক্তি সে বাম দিক থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় পংক্তিতে যখন নেমে এল তখন ডান দিক থেকে ঘুরে বাম দিকে গেল, তৃতীয় পংক্তিতে আবার বাম থেকে ডান দিকে ছবি আঁকল। এইভাবে পর্যায়ক্রমে সে ছবি আঁকল। ছবি নয়, ছবির মিছিল।

বর্চ্চিনদাস ঋভুর দিকে চেয়ে থাকল বিমুগ্ধ চাহনি মেলে। বুকের

মধ্যে তার ছবির ভাষা কলকলিয়ে উঠল। ঋভুর কিছু উচ্চারণ করার আগেই বর্চ্চিনদাসের মনে তার ভাষা উচ্চারণের ইচ্ছো জেগেছিল। বলল ঃ ঢেউ খেলানো রেখাগুলো হল নদী। মাঝখানে গোলাকৃতি বিন্দুবৎ জায়গাটি একটি ভূখণ্ড। লম্বা রেখার মধ্যস্থলে যে রেখাটি আড়া-আড়ি গিয়েছে তা উড্ডীয়মানোন্মুখ পক্ষীকুলের প্রতীক। ঢেউখেলানো রেখার এককোণে কড়াইর মত অর্ধবৃত্তটি হল তরণী। লম্বমান রেখার উর্ধ্বমুখে একটি বিন্দু মোটা করে এঁকে তার ঠিক নিচেই দুটি রেখা দুইদিকে বিভক্ত করে আবার মধ্যরেখাটি কিঞ্চিৎ নিম্নাভিমুখী করে পুনরায় দুটি রেখা বিপরীত দিকে প্রসারিত করে দিয়েছ ওটি মানুষের প্রতিরূপ। এখন সব ছবিগুলো একত্রিত করলে দাঁড়ায়, তরঙ্গ সংক্ষুব্ধ নদীবক্ষে জেগে ওঠা চরে একখানি নৌকা আছে। স্থানটি পাখীদের বিচরণভূমি। সেখানে হঠাৎ দুইজন মানুষের আগমন হয়েছে। পক্ষীরা বিপন্ন বোধ করছে। তাই তারা উড্ডীয়মান।

বিস্মিত চাহনি মেলে ঋভু বর্চ্চিনদাসকে দেখছিল। খুশির আনন্দে বুক তার ভরে গেল। এত আনন্দ আগে সে কখনও পায়নি। মুখের কথা যে, ছবির ভাষায় পড়ে শোনানো যায় এ উপলব্ধি এ আবিষ্কার বর্চ্চিনদাসের প্রথম। আনন্দের গভীর স্বাদে মন ভরে উঠল। বলল ঃ চমৎকার। বর্চ্চিনদাস তোমার এই উপলব্ধির তুলনা নেই। সিন্ধু উপত্যকায় মানুষই সর্বাগ্রে ভাষায় লিখ্যরূপ আবিষ্কার করল। ভাষার এই লিখ্যরূপ যুগ-যুগান্তরের অক্ষয় সাক্ষী হয়ে থাকবে।

ভাবের এই এক একটি সাংকেতিক চিত্র এক একটি অক্ষর রূপে গ্রহণ করলে কথা আর নড়চড় হবে না।

বর্চ্চিনদাস বলল ঋভু তুমি শিল্পী। তাই এমন সুন্দর করে কথা বলতে পার। আসলে তুমি রূপকার। তুমিই স্রষ্টা।

না, না বর্চ্চিনদাস ওকথা বলে আমার অহংকার বাড়িয়ে দিও না। তুমিই পথদ্রষ্টা। তুমি এর উদ্ভাবক। তোমাকে আমার নমস্কার।

শুনতে শুনতে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল কশ্যপ। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা বলতে পারল না সে। চোখের দুকোণ তার কুঁচকে

ছোট হয়ে গিয়েছিল। এদেশের মানুষের উদ্ভাবন ক্ষমতা তার মনকে একটা চকিতবিদ্ধ কষ্টে আচ্ছন্ন করে রাখল। তাই মুগ্ধতার যে চঞ্চলতা জেগেছিল তার মনে তা জাতিগত দৈন্যের অনুভূতির সঙ্গে মিশে গিয়ে তৎক্ষণাৎ একটা কষ্ট, দুঃখ যন্ত্রণা নানাবিধ প্রতিক্রিয়ার মিশ্রণে জটিল হল।

কশ্যপের অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে দিতি হাসল। দু'চোখে তার দুষ্টুমির ঝলক লাগল। কটাক্ষে বিদ্ধ করে বলল: কী-গো মশাই, মুখে রা নেই কেন? মুখ গোমড়া করে ভাবছ কি? স্বর্গে যে তোমাদের লেখাপড়ার পাট নেই তা তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি। কিন্তু আমার গল্পের শেষ হয়নি, এখনও বাকী অনেক।

দিতির রসিকতা কশ্যপের বিষবৎ বোধ হল। ভ্রূকুটি দৃষ্টি ও মুখ পলকের জন্যে শক্ত হয়ে গেল। তবু, সে ম্লান হেসে প্রাণদাত্রীর কথাগুলো একাগ্রভাবে শুনতে লাগল। দিতি তার অসমাপ্ত গল্প পুনরায় আরম্ভ করল।

কাচা মাটির ফলক রোদে শুকিয়ে পঁচলো। কাঠি দিয়ে লেখা হল বিভিন্ন অনুশাসন। রাজারাজড়াদের কীর্তির ইতিহাস. বাণিজ্যের হিসাব। চিত্রেই তা রমণীয় হল সকলের কাছে।

কিন্তু বর্চিনদাসের মনে সুখ নেই। ফলকগুলি কাঁচা মাটির তৈরী বলে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়ার পথে ভাঙ্-চুর হত। অক্ষরগুলি অস্পষ্ট হয়ে যেত। তাই, মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি অহরহ কাঁটার মত বিঁধছিল বর্চিনদাসের। আবিষ্কারকে স্থায়ী না করা অবধি তার মনে শান্তি ছিল না। কিন্তু কোন উপায় খুঁজে পেল না। একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে সেই ঘটনা তার জীবনে ঘটল।

সেটা ছিল শীতকাল। সন্ধ্যে থেকে ঘন কুয়াশার মত মিহি বরফ পড়ছিল। গাছের পাতায় পেঁজা তুলোর মত সাদা বরফ জমে ছিল। হিমেল হাওয়ায় ছিল শীতের ধার। ঋক্ষের ঘন লোমে ঢাকা চামড়ার পোশাকে দেহ আবৃত করে শিশু ও বৃদ্ধেরা শীত নিবারণ করছিল। বর্চিনদাসের গায়েও ছিল ঋক্ষের চামড়ার পোশাক। তবু কনকনে

ঠাণ্ডায় দেহ কুঁকড়ে যাচ্ছিল। ঘরের মধ্যেও হাত-পা সব সেঁটে ধরছিল। অত্যধিক শীতের জন্য কুটীরের বাইরে খড়কুটোর আগুন করে সকলের সঙ্গে বর্চ্চিনদাসও দেহটা সেঁকছিল। শুকনো খড়কুটো পাতার অসতর্ক কোন স্ফুলিঙ্গ হঠাৎ দপ্‌ করে জ্বলে তার কুটীরের চালে পড়ল। কিন্তু সেদিকে কারো নজরও ছিল না। কিছুক্ষণবাদে আগুন জ্বলল। মুহূর্তে চারদিক আগুন ছড়িয়ে পড়ল। ঘিরে ফেলল গোটা চাল। দাউ-দাউ করে জ্বলতে লাগল রুদ্রমূর্তিতে। উজ্জ্বলিত আগুনের শিখায় রাতের অন্ধকার অপসারিত হল। পাহাড়ীগাছের তুহিনসিক্ত পাতায় তার প্রতিবিম্ব প্রলয়ংকরী সাজে নৃত্য করতে লাগল। মনে হল দূর পাহাড়ের লম্বা রেখায় যেন আগুন জ্বলছে।

বর্চ্চিনদাস প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে ছিল। তার দুই চোখের চাহনি কষ্টবিদ্ধ ব্যথায় আচ্ছন্ন। হরিয়ুপীয়ার নরপতির আদেশ নামা ছিল তার শয়নকক্ষে। সেও আগুনের কবলিত হল। কিন্তু কিছুই করার ছিল না বর্চ্চিনদাসের। আগুনের শিখা যেভাবে লকলকে জিভ মেলে ধরল তাতে এগোনোর কোন পথ ছিল না। নৃপতি সম্বরের শীলমোহর করা কাঁচা মাটির ফলকে লেখা আদেশ নামার পরিণতির কথা ভেবে তার চোখে জল এল। নরমাংসভোজী যাতু উপজাতিদের দস্যুবৃত্তি, সংঘবদ্ধ অতর্কিত আক্রমণ এবং উৎপাতের বিরুদ্ধে সম্মিলিত এক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সিন্ধুসংঘের নৃপতিদের কাছে তিনি যে আবেদন্‌ করেছিলেন তা এখন অগ্নি কবলিত। কি করে সে বাণী তাঁদের দরবারে পৌঁছে দেবে ভেবে পেল না, বর্চ্চিনদাস। জীবনে সে কখনও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেয়নি। আকস্মিক দুর্ঘটনা তার সেই সুনাম কলঙ্কিত করল। লজ্জায় অনুতাপে সে মরমে মরে রইল। এক অসহায় অভিসম্পাতের মত মনে হল তার নিজের অবস্থাকে।

অগ্নির ফলক থেকে ফলকগুলিকে রক্ষা করার জন্য অগ্নিকে প্রসন্ন করা দরকার বোধ হল তার। অমনি মুখস্থ করা স্তুতি উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগল।—লোকজনের দৌড়-দৌড়ি, কান্নাকাটি, হৈ-চৈ রাতের

অন্ধকারের স্তব্ধতা ভেঙে ভেঙে খান্ খান্ করল। আগুন নেভাতে দৌড়ে এল পাড়া-পড়শী সকলে। আগুন যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সে-জন্য তারা চামড়ায় মশকে করে জল ছিটোতে লাগল। লম্বা লম্বা লাঠি দিয়ে আগুন ঝাপ্টাতে লাগল। তার ফলে আগুনের তেজ বাড়তে পাচ্ছিল না। ইন্ধনের অভাবে আগুন নিস্তেজ হয়ে গেল।

তবু আগুন নেভাতে ভোর হল। ঘরের অস্তিত্ব ছিল না আর। পুড়ে ছাই হয়েছিল। দগ্ধস্থান থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছিল তখনও। জল ঢেলে সেগুলো নেভানো হল। তারপর ক্লান্ত প্রতিবেশীরা যে যার ঘরে ফিরে গেল।

বিভ্রান্ত বিস্ময়ে বর্চ্চিনদাস সব দেখছিল। তার নিশ্চল স্তব্ধতার মধ্যে যন্ত্রণাকাতর আর্তি সম্যক উপলব্ধি করা যাচ্ছিল। তথাপি কোন স্বর ফুটল না তার গলায়। অনেকক্ষণ পর শব্দ করে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মনে হল হৃদয়ের অতলান্ত তলদেশ থেকে একটা গভীর নিঃশব্দ কান্না যেন তার গলায় উঠে সহসা আটকে গেল। তার নিঃশব্দ কান্নার আক্ষেপে বাতাসও সহসা চমকে গেল। একটা স্খলিত শব্দ নির্গত হল কণ্ঠ থেকে—উঃ!

তারপর পা টিপে টিপে ভস্মস্তূপের দিকে এগিয়ে গেল বর্চ্চিনদাস। খুঁজতে লাগল তার কাঁচা মাটির ফলক। স্বল্প পরিশ্রমেই সে তা খুঁজে পেল। আগুনে পুড়ে মাটি হয়েছে লাল। কিন্তু ফলক অবিকৃত আছে। ছাই ও জলে মাখামাখি হয়ে ফলকগুলি একটুও নরম হয়নি। বরং চিত্রের রেখাগুলি কে আরো উজ্জ্বল এবং স্পষ্ট করল। একে অগ্নিদেবতার আশীর্বাদ মনে করে সে প্রফুল্লিত হল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার ফলকগুলি দেখল। বুকে চেপে ধরল। চুমা দিল। হঠাৎ একটি হাত থেকে খসে পড়ল পাথর বাঁধানো মেঝে। ঠং-করে আওয়াজ হল। কিন্তু ভাঙল না। বিস্ময়ে বিহ্বল হল বর্চ্চিনদাস। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল সে। বর্চ্চিনদাসের অনুভূতির মধ্যে এক তোলপাড় শুরু হল। বুঝতে পারল, আগুনে পুড়ে মাটি ছাই হয় না, শক্ত হয়। চিত্র এবং ফলকের আকৃতি অবিকৃত থাকে, কেবল মাটির

প্রকৃতি ও রঙ বদলে যায়। আনন্দে উত্তেজনায় তার শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার সংবাদ সে নিজের মধে চেপে রাখতে পারছিল না। চিৎকার করে লোক জড়ো করে সে তাঃ অভিজ্ঞতার কথা, আবিষ্কারের কথা শোনাল।

কশ্যপের চোখ বোজা। দাঁতে দাঁত চেপে স্থির হয়ে শুয়ে ছিল দিতি ভাবল তার সমস্ত সত্তা একাগ্র হয়ে গল্পের সুখকর অনুভূতিঃ মধ্যে ডুবে আছে। তাই তাকে বিরক্ত করল না। কৌতুক করার লোভেই, সে পা টিপে টিপে সেখান থেকে উঠে গেল। কশ্যপ কিছুই টের পেল না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে চোখ মেলল কশ্যপ। কোথাও দেখতে পেল না দিতিকে। তাকে খোঁজার কোন ঔৎসুক্য বোধ করল না। নির্বিকার চিত্তে স্থির হয়ে পাহাড় গুহায় বসেছিল। চোখের চাহনিতে তার কষ্ট বিদ্ধ ব্যথা। সব কিছু যেন অন্ধকার। কেবল একবিন্দুর আলোর মত জেগেছিল দিতির মুখ। বাকী সব অন্ধকার।

নিঃশ্বাস তার ঘন ভারি হল। বুকের ভেতর একটা কষ্টকর বেদনা। এ তার হল কি? চুপি চুপি জিগ্যেস করে নিজেকে।

শরীরটা এখনও দুর্বল। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার উপযুক্ত হয় নি। কবে সুস্থ হবে? দেহে বল পাবে?—এসব জিজ্ঞাসা যখন জাগে মনে তখন অদৃশ্যের হাতে নিজেকে বন্দী, অসহায় মনে হয়। মস্তিষ্কের চৈতন্যের বদ্ধ কুটীরে সকল সীমায় আবদ্ধ হয়ে বাজতে থাকে —ভাগ্য কি? অদৃশ্য চক্র কাকে বলে? এর অর্থ কি? এসব চিন্তা তার অন্তরে কেন জাগছে? এইসব অতলান্ত জিজ্ঞাসার কোন জবাব খুঁজে পায় না কশ্যপ। থেকে থেকে মনে পড়ে অদৃষ্ট বাদীদের সে ধিক্কার দিয়েছে। ভৎর্সনা করেছে। দৃপ্ত কণ্ঠে শুনিয়েছে: অদৃষ্ট, ভাগ্য বলে কিছু নেই। এসব দুর্বল, অক্ষম মানুষের সৃষ্টি। ভীরু, কাপুরুষের সান্ত্বনা। মানুষ বিধাতার শ্রেষ্ঠ জীব। সে নিজেই তার পরিচয়। অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে কিছু পাওয়াতে যেমন পৌরুষ নেই, তেমনি অক্ষমতাকে অদৃষ্টের নামে চালিয়ে দেওয়াও পাপ।

মানুষের ভিতরটা থাকবে পৌরুষে ভরা। অদৃশ্য চক্রের আক্রমণ বাঘের মত অমোঘ জেনেও নির্ভয়ে অকম্পিত বক্ষে তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণার নাম পৌরুষ। নিয়মভাঙার সেই দুর্জয় পৌরুষই ভয়ংকর অদৃশ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে জয় পরাজয় আছে। পরাজয়ের সান্ত্বনা খুঁজবার জন্য অদৃষ্টকে দায়ী করে দুর্বল, ভীরু পুরুষ। কিন্তু আজ ভাগ্য শব্দের অর্থ অতলান্ত মনে হচ্ছে। তাই, সহজে জবাব খুঁজে পাচ্ছে না তার। অনুভূতির গভীরে কি যেন নিয়ত তোলপাড় করছে। ভাগ্য অমোঘ। ভাগ্য স্রোতকে ফেরানো যায় না। মানুষ অদৃষ্টের ক্রীড়নক।—এ সব ভাবতে কষ্ট হয়, তবু মনে আসে বারংবার। কেন?

অমরত্বের তৃষ্ণা তার রক্তে। পৃথিবীকে সে জয় করতে চায়, ভোগ করতে চায়। দুনিয়াকে জানা এবং দেখার আকাংখা তার দুর্বার। কোন গণ্ডীতে সে বাধা থাকতে চায় না। সে দুরন্ত, সে দুর্নিবার, সে অনিয়ম। উদ্দাম তার গতি। নিজেকে বার বার ভাবতে ভাল লাগে তার। এই ভাবনার মধ্যে একটি রোমাঞ্চ আছে। কিন্তু আজকাল সেই ভাবনা আর আসে না। চেষ্টা করলেও জানে না। কেন? কি হয়েছে তার? মনে আবার জিজ্ঞাসা বিদ্ধ হয়।

মানুষের আত্মবিশ্বাস এবং শক্তির যখন মৃত্যু হয় তখন ভাগ্যকে সে বড় করে মানে। অদৃষ্টকে বিশ্বাস করে। কিন্তু রক্তের জোর যখন কমে যায়, তেজ ফুরিয়ে যায়, নিজের বলের উপর যখন আস্থা থাকে না, অন্যের উপর যখন নির্ভর করতে হয় তখন এক দারুণ অক্ষমতা এবং আত্মগ্লানি থেকে অদৃষ্ট নামক অদৃশ্য শক্তিটি তার চেতনা জুড়ে বিরাজ করে। কিন্তু শক্ত মজবুত শরীর তাজা মন, তাজা প্রাণ কখনই সেই অদৃশ্য ভয়ংকর শক্তির কথা ভেবে শংকিত হয় না। মনও খারাপ করে না। ভাগ্য চিরকালই দুর্বলের আত্ম সান্ত্বনা এবং অক্ষমতার হাতিয়ার। অসুস্থ বলে কি রুগ্ন মানুষের মনোবিকারে জীর্ণ তার অন্তঃকরণ। বুকের ভেতর একটা বিষণ্ণতার সুর বাজে। নিজের মনের জিজ্ঞাসায় অন্যমনস্ক হয়ে নিজের

অজান্তে নিজেকে আবিষ্কার করে। মৃত্যুর কোন চেতনা থাকে না। মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ হয় জীবনের। আত্মবিনাশের আগে পর্যন্ত মানুষ বাঁচবার তীব্র ইচ্ছা পোষণ করে। অদৃষ্ট ভাগ্য নিয়ে মনে যখন প্রশ্নের উদয় হয়েছে তখন হয়ত তার আত্মবিনাশের পর্ব শেষ হয়নি। এখনও সে বেঁচে আছে। সেই ভয়ঙ্কর অবিশ্বাসের সঙ্গে এখনও সে যুদ্ধ করছে মৃত্যু অমোঘ জেনেও জীবনে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে।

"ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিসের পরিশুদ্ধ সাগর-সংগম,
তৃণাচ্ছন্ন তটভূমি, মেঘপুঞ্জ ঢালে বারি,
সিক্ত ক্ষেত্রে মুঞ্জরিত শস্যশীর্ষ,
শষ্প শ্যামলিমা মরু চারণ-প্রান্তরে,
অরণ্যে-উদ্যানে তরুশাখার বিকাশ,নবোদ্ভিন্ন কিশলয়—
মাঙ্গলিক কর্ম যত তুমি কর মানুষের কল্যাণে।"

হঠাৎ থেমে গেল সে। এ'কার প্রশস্তি করল সে? জন্ম থেকে যে ভূমিতে লালিত পালিত, যেখানে শৈশব, কৈশোর, যৌবন কেটেছে তার, এ'ত সে দেশ নয়। সেখানকার প্রকৃতি রুক্ষ, রুদ্ররূপে ভয়ংকর। জীবনের সঙ্গে তার নিয়ত বিরোধ। কঠোর সংগ্রাম করে, প্রচুর শক্তি ক্ষয় করে কৌশলে বেঁচে থাকতে হয় সেখানে। তাই, প্রকৃতি পরিব্যপ্ত হয়ে আছে—তাদের শরীরে, শক্তিতে, তেজে, বিক্রমে। সে কারণ ঝঞ্ঝার মত দুরন্ত, দুর্দান্ত তারা। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত দুর্বিনীত, উদ্ধত, অহংকারী। পর্বতের মত নির্ভীক, মেঘের মত স্বচ্ছন্দচারী, অরণ্যের মত বর্ব্বর, সূর্যের মত তেজস্বী, বজ্রের মত শক্তিশালী। সেখানে প্রকৃতি রুদ্ররূপে আহ্বান করে বায়ুকে। বায়ু ডাকে বজ্রেরে। আকাশের উগ্রতুফান ডেকে আনে বৃষ্টিকে। উচ্ছ্বাসের মত্ততা জাগে নদীতে, সাগরে। প্লাবনে লণ্ডভণ্ড হয় সারা ভূমি। হায়, হায় করে চতুর্দ্দিক। মানুষের ধ্বংস চায় সে দেশের দেবতা। রক্তাক্ত অরণ্য তাই কেঁদে বলে আকাশকে, "হে সবিতা দূর কর এইসব দস্যু, লুণ্ঠক নর-দানবকে। তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বনের পশুর চেয়েও বর্ব্বর, হিংস্র, নির্মম, নিষ্ঠুর, শক্তিমান। শিকারলোভী মানুষ অরণ্যের ঘুম

ভাঙায়, শান্তি কেড়ে নেয়। বাতাস বিদীর্ণ করে সন্‌সন্‌ করে ছোটে তার তীক্ষ্ণ অস্ত্র। বিপুল যন্ত্রণায় সারা শরীর কুঁকড়ে যায়। হে দেবতা, তুমি আছ স্বর্গমর্ত ঘিরে। হে চঞ্চল দেব, প্রাজ্ঞ তুমি—মানুষের উপদেষ্টা, তোমার মুখের কথা, মানুষের সাধ্য কি যে, করে অবহেলা ? বিশ্ব পৃথিবী মানে শাসন তোমার। ন্যায়নিষ্ঠ রাজা তুমি, মানুষেরে দাও উপদেশ। শান্ত কর, সুন্দর কর মানুষকে।

অকস্মাৎ চমকে উঠল কশ্যপ। আত্মসম্বিৎ পেয়ে ভাবে, মনে মনে একি উচ্চারণ করল সে। এ'ত ইষ্টদেবতা সবিতার বন্দনা গান। এ মন্ত্রে কখনও আহ্বান করেনি তাকে। কল্পনাও করেনি তার রূপ। তাই বিস্মিত রোমাঞ্চকর পুলক শিহরণ তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। কি এক মুগ্ধ আবেশে তার দু' চোখ বন্ধ হয়ে রইল অনেকক্ষণ। হৃদয়ের আকূতিই আজ সবিতা বন্দনায় প্রকাশ পেল। হৃদয় গুহার অন্ধকার ভেদ করে এ কোন আলোয় উদ্ভাসিত হল তার চিত্তাঞ্চল ?

সূর্যই পৃথিবীর প্রতিপালক। তার আবির্ভাবে দ্যুলোকে, ভূলোকে অন্ধকার দূর হয়। পৃথিবীর ঘুম ভাঙে। পাখীরা কাকুলী করে। গাছে ফুল ফোটে। আলোর সুধায় বৃক্ষ হয় সঞ্জীবিত। বাতাস হয় উতলা। মধুপের মত্তগুঞ্জনের সুর ভাসে শূন্যে। মনুষ্যলোকও ধন্য হয় তার আবির্ভাবে। মানুষের সে প্রাণ। প্রাণের বল। চেতনার আনন্দ। উজ্জ্বলিত আলোয় পৃথিবী নিঃশঙ্ক এবং প্রকাশমান।—কশ্যপ অবাক হয়ে ভাবে, নিভৃত অন্তর অনুভূতিতে এ কোন বিরাটের ছায়া পড়ল ?

কশ্যপের চোখে ভেসে উঠল পাহাড় অরণ্যের মধ্যবর্ত্তী লাল পাথর আর কাঁকুরে মাটি, সবুজ তৃণভূমি, উদ্ধত নদী, প্রমত্ত ঝর্ণা, রুক্ষ পাহাড়, নল খাগ্‌ড়ার বেড়া দেওয়া কুঁড়ে, অগ্নিকুণ্ড ইত্যাদি। আস্তে আস্তে তারা সজীব প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

ছাই ছাই অন্ধকার নেমেছে বনভূমিতে। দূরের পাহাড় আঁধারের রাজ্যে বিলীন হয়ে গেছে। এক দল লোক গভীর জঙ্গল ভেঙে, উঁচু নিচু জমি পেরিয়ে, দল বেঁধে সমস্বরে গীত করতে করতে আসছিল।

পায়ে তাদের দ্রুত চলার ছন্দ। দৃষ্টি সজাগ এবং তীক্ষ্ণ। ঝোপ ঝাড়ের উপর সন্ধানী চোখ রেখে তারা নদীর পাড় ধরে এগিয়ে চলল। মোটা লম্বা গাছের ডালে শিকার ঝুলিয়ে জন কয়েক পুরুষ মিলে বহন করছিল। আস্তানায় ফিরতে তাদের প্রায়ই দেরী হত। সেদিনও দেরী হল। মেয়েরা আগে গাছের নিচে খড় কুটো জড় করে রেখেছিল। দলের লোক শিকার নিয়ে ফিরতে চার-পাঁচজন নারী ছুটে গেল সেদিকে। পুরুষদের কাঁধ থেকে শিকার করা পশু নামিয়ে নিল। ধারাল ছুরি দিয়ে তার পেটটা চিরে ফেলল। নাড়ী-ভুঁড়ী বার করল। চামড়াটাকে টেনে নামাল তার অঙ্গ থেকে। তারপর সমস্বরে গীত করতে করতে তারা পশুটির চার পা একত্র করে গাছের ডালে লতা দিয়ে বাঁধল। খড় কুটোয় আগুণ ধরাল মাংসকে পুড়িয়ে নরম এবং সুস্বাদু করার জন্য। পুরুষেরা, নারীরা, শিশুরা, বৃদ্ধেরা সকলে খাওয়ার লোভে আগুনকে ঘিরে বসল। আর নানা রকম শিকার মারার গল্প চলল। সে গল্প যেমন লোমহর্ষক তেমনি রোমাঞ্চকর। কথায় কথায় সে গল্পে পূর্ব-পুরুষদের প্রসঙ্গ টানা হত। পূর্বপুরুষ নিয়ে এরকম বহু গল্প শুনেছে কশ্যপ। সব গল্প মনে নেই তার। তবে অনেক গল্প তার বালক মনকে ছুঁয়ে নানাবিধ প্রশ্ন জাগায়। এরকম একটি গল্প তার মানস নয়নে অকস্মাৎ ভেসে উঠল।

আদিপুরুষের নাম ছিল পরশুরাম। প্রথমে কি নাম ছিল কেউ জানে না। পরে ঐ নামে পরিচিত হয়েছিল। তার একটা অদ্ভুত গল্প আছে। লোকের মুখে মুখে সে গল্প চলে আসছে দীর্ঘকাল। খোলা আকাশের তলায় বৃষ্টিতে ভিজে রোদে পুড়ে, বন্য পশুর সঙ্গে লড়াই করে শরীরটা হয়েছিল ইস্পাতের মত। পশুর মত বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে জীবন কাটাতে তার পছন্দ নয়। মনে তার প্রশ্ন, একটা ছোট্ট পাখিও গাছের কোটরে গর্ত করে তার নিরাপদ বাসস্থান তৈরী করে। খড়-কুটো দিয়ে মজবুত ঘর বানায়। ইতর প্রাণীও মাটি খুঁড়ে তাদের নিরাপদ আশ্রয় গড়ে তোলে। তা-হলে মানুষই-বা পারবে না কেন, তার নিরাপদ বাসস্থান তৈরী করতে? কেন? এই প্রশ্নে

আকুল হল তার মন। একদিন উঁচু পাহাড়ের সমতল স্থানে গাছের ডাল পাতা দিয়ে তৈরী করল তার প্রথম কুঁড়ে। মানুষের সেই আদি বাসগৃহ নির্মাণের কৌশল তাকে গোষ্ঠীর অধিপতি করেছিল।

পরশুরাম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানুষ। ভিন্ন ধাতুতে তৈরী। আর পাঁচজনের মত নয় সে। জীবনের গতানুগতিকতা তার পছন্দ নয়। মাঝে মাঝে সে ভাবে বনের পশুর চেয়ে মানুষের সাহস, শক্তি, আক্রমণের ক্ষিপ্রতা, চলার গতি, সতর্কতা অনেক কম। তবু তার মধ্যে একটা অতিরিক্ত কিছু আছে। কিন্তু সে বস্তু কি? বনের একটা হিংস্র পশুকে ঘায়েল করার শক্তি কোন দুর্বল বন্য পশুর নেই। পশুদের তুলনায় মানুষ দুর্বল হয়েও কিন্তু হিংস্র পশুকে বধ করতে পারে, রুখতে পারে তার হিংস্র আক্রমণ। কিন্তু কোন বন্য দুর্বল প্রাণীর আত্মরক্ষায় সে শক্তি নেই। কেন? কেন পারে না সে আক্রমণকারীর অন্তরে ভয় জাগাতে? কেন? এই একটি প্রশ্ন দিনের পর দিন তার চিত্তদেশে আলোড়িত হতে থাকে। কাকতালীযভাবে এক দিন উপলব্ধি করল তার বুদ্ধি আর কৌশল গ্রহণের শক্তিকে। সেও এক অদ্ভুত গল্প।

পরশুরাম তার বিশাল শরীর নিয়ে পাহাড়ী রাস্তা ধরে কুটীরে ফিরছিল। হঠাৎ একটি ঋক্ষ অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। আরম্ভ হল উভয়ের প্রচণ্ড ধ্বস্তাধ্বস্তি। পরশুরামের দানবীয় হাতের মার খেয়ে ঋক্ষ যখন পলায়মান তখন ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসাপরায়ণ আদিমানব ভূমিতে পড়ে থাকা অদ্ভুত আকৃতির একটি সূঁচলো, ধারালো চ্যাপ্টা পাথর টুকরো প্রচণ্ড জোরে তার পৃষ্ঠে আঘাত করল। ঋক্ষের লোমশ দেহ বিদীর্ণ করে সে পাথরখণ্ড তার শরীরের মধ্যে অনেকখানি ঢুকে গেল। মরণ আর্ত্তনাদ করে ঋক্ষ লুটিয়ে পড়ল সেখানে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল তার ক্ষত থেকে। বিশাল জন্তুটা মাটিতে পড়ে অসহায়ের মত হাত পা খিঁচতে লাগল। ধীরে অবশ হয়ে এল তার দেহ। তারপর চিরকালের মত স্তব্ধ হয়ে গেল।

এরকম একটা অদ্ভুত ঘটনায় আশ্চর্য হল পরশুরাম। ঋক্ষের

দেহে বেঁধানো পাথর খণ্ডটি হাতে নিয়ে সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল অনেকক্ষণ। প্রস্তর খণ্ডটি সাধারণ পাথরের মত গোলাকৃতি ও ডিম্বাকৃতি নয়। তার অগ্রভাগ চ্যাপ্টা সূঁচলো এবং দুই পাশের কিনারায় ধার। এরকম প্রস্তর সে আগে দেখেনি কখনও। তাই, কৌতূহলী হয়ে সে তার ধারে আঙুল বুলিয়ে পরখ করতে লাগল। আর কি একটা অস্পষ্ট উপলব্ধি তার মস্তিষ্কের মধ্যে পাক খেতে লাগল। হঠাৎ তার হাতের তালু রক্তে রাঙা হয়ে যেতে দেখল। পাথরের ধারেই যে হাত কেটেছে তার সে বিষয় নিঃসন্দেহ হল। তারপর কি ভেবে, ঐ চ্যাপ্টা পাথর টুকরো দিয়ে সজোরে আঘাত করল একটি বৃক্ষ শাখায়। অমনি শাখাটি কাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হল। বিস্ময়ে আনন্দে দুই চোখ তার চক্‌চক্ করে উঠল। বিধাতা তার হাতে এ কোন দুর্লভ রত্ন তুলে দিল? স্বপ্ন সফলের হাতিয়ার তার হাতে। কোন অগ্রগতির আর বাধা তার রইল না। থাকলেও তার মানার প্রয়োজন ছিল না। হিংস্র পশুর বর্ব্বর আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার শক্তি ও সাহস দিল এই অস্ত্র। আত্মপ্রত্যয় ও আত্মশক্তি অনেক বেড়ে গেল তার। বসতি নির্মাণের পথে জঙ্গল তাহলে আর বাধা নয়। এখন সে মুক্ত, স্বাধীন। পৃথিবীর কোন শক্তিই তাকে বশে রাখতে পারবে না। সে দুর্বার, দুরন্ত। অপ্রতিহত তার গতি। এই অস্ত্রেই হয়ত একদিন মানুষকে পৃথিবীর অধীশ্বর করবে বলে তার প্রত্যয় জন্মাল। সেদিন থাকবে না সে। কিন্তু তার আবিস্কৃত অস্ত্র থাকবে। এর স্পর্শে রক্ত ঝরে। যে কোন বস্তু টুকরো টুকরো হয়। তাই এর নাম সে দিল 'পরশু'। তারপর থেকে, পরশু হাতে এগিয়ে এল আদি মানুষের বংশধর। বন কেটে বসত নির্মাণ করে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। সেদিন থেকেই তার 'পরশুরাম' নামটা চলে আসছে।

মানুষের সভ্যতা অগ্রগতি তার পূর্বপুরুষেরা কতদূর এগিয়ে দিয়েছে তার কথা মনে হল। ছবির মত সাজানো এই দেশটাকে দেখলে কশ্যপের বুকের মধ্যে কষ্ট হয়। নিজেকে তার বড় দীন মনে হল। হীন-

মন্যুতার জ্বালায় জ্বলতে লাগল বুক। বিধাতাকে তার নিষ্ঠুর একচোখা মনে হল। এদেশের মানুষের জীবনে কোন কিছুর অভাব নেই। প্রকৃতি রাজরাণী হয়ে যেন তার ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার খুলে দিয়েছে। মানুষের সুখ, সমৃদ্ধি, শান্তি, উন্নতি যেন উথলে পড়ছে এখানে। কঠোর সংগ্রাম করে বাঁচতে হয় না এখানকার মানুষদের। এ মানুষ সুখী।—এই উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতায় তার বুক জ্বালা করে। অনুভূতির মধ্যে অগ্নিশিখার প্রদাহ। এই অনুভব নতুন তার। এর অব্যক্ত অভিব্যক্তির সঙ্গে তার জীবনের কোন ঘটনার মিল নেই। তবে অদিতির সঙ্গে অন্য পুরুষের মেলামেশা এবং কথা বলার সময় তার অন্তরের অনুরূপ একটা প্রদাহ হত। কিন্তু তার ব্যাখ্যা সে করতে পারত না। তবে বুঝতে পারত সে, ঐ ব্যক্তিকে সহ্য করতে পারছে না। তাকে কেন্দ্র করে বুকের মধ্যে একটা ঝড় উঠেছিল। কাঁটার মত কি একটা খচ্ খচ্ করে বিঁধছে, বিস্ময়ের ভেতর অনুভব করেছিল, একটা চকিত বিদ্ধ ব্যথার সঙ্গে হারানোর আশংকায় মন উতলা হয়ে পড়েছে। দুর্জয় ক্রোধে তখন তাকে দলে পিষে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে ইচ্ছে হত। মনের এই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষের একটা ভাব অবশ্যই ছিল। সুতরাং একে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বলা ঠিক। অনুভূতির ঠিক নামকরণ করতে পারার হর্ষে তার চিত্ত আপ্লুত হল। পরক্ষণেই ভাবল, প্রাণের যে যন্ত্রণা ক্রিয়াশীল এবং নানাবিধ অনুভূতির মিশ্রণে জটিল ও প্রতিহিংসাপরায়ণ তা হল ঈর্ষা। ঈর্ষা মানুষের প্রকৃতি। অন্যের ভাল দেখলে মনে যে অভাব জাগে, যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তাই থেকে ঈর্ষার জন্ম। সিন্ধু উপত্যকার সমৃদ্ধি এবং লোকজনকেও উন্নত মানের জীবন যাপন দেখে তার অন্তরে অনুরূপ অভাব এবং শূন্যতাবোধ জাগল। তাদের সৌভাগ্য তার মনে ঈর্ষার আগুন জ্বালল তাই, বুকের মধ্যে আক্ষেপের কষ্ট চিন্‌চিন্ করতে লাগল।

কশ্যপ নিজের মনের জিজ্ঞাসায় কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। নিজের অজান্তে নিজেকে আবিষ্কার করতে গিয়ে আর এক ঘটনা তার

মনের ওপর ছায়াপাত করল। জীবন্ত এবং চিত্রবৎ হল। সে হল তাদের আর এক পূর্বপুরুষের অক্ষয় কীর্ত্তি।

পরশুরামের একাদশ পুরুষ হলেন মনু। তাঁর সময়ে যাযাবর জীবনের অবসান হয়েছে। সন্তান সন্ততির সংখ্যা বেড়ে এ পরিবার হয়েছে আরো বড়। দিকে দিকে মানুষ বাসভূমি নির্মান করছে। নবোদ্যমে প্রকৃতির দেয়া মাটিতে তারা বীজ ছড়িয়ে কৃষিকাজ করছে। নিরীহ তৃণভোজী বন্য পশুদের ধরে তারা গৃহে পালন করছে। প্রতিপালক প্রকৃতিকে কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্যে দেবজ্ঞানে প্রকৃতির পূজা করছে। দেবতার তৃপ্তি ও সন্তুষ্টির জন্যে অগ্নিকুণ্ডে হবি এবং মাংস আহুতি দেওয়া হচ্ছে। যাযাবর থেকে তারা আশ্রমবাসী হচ্ছে। ঠিক এই রকম একটা সময় একাদশ মনুর আবির্ভাব।

নারীকে নিয়ে তখন কোন্দল আরম্ভ হয়েছে পরিবারের মধ্যে। যাযাবর জীবনে খুব কম সংখ্যক নারী নিয়ে পথে ঘুরত তারা। নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে কম বলে কতিপয় নারীকেই পরিবারের সমস্ত পুরুষকে বরণ করতে হত। সেজন্য পরিবারের মধ্যে বিবাদ লেগে থাকত। এই অবস্থার অবসানের জন্য একজন শক্তিশালী পুরুষের নিযন্ত্রণাধীনে আনা হল গোটা পরিবারকে। সে হল গোষ্ঠীর অধিপতি বা পরিবারের প্রধান। তার উপাধি হল মনু। এই মনুরাই তৈরী করেছে নানাবিধ প্রথা এবং রীতি নীতি। কিন্তু একাদশ মনু ছিল অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। বাল্য থেকেই সে চিন্তাশীল। সব কিছু গভীর করে অনুভব করে।

আদি মানুষের বংশধর মানব পরিবারকে আরো বৃহৎ এবং বহুজনের সমাজ করার জন্য সে চাইল বংশ বিস্তার। পৃথিবীর ভাণ্ডার অফুরন্ত। অসীম তার ভূখণ্ড। এর ভোগের জন্য চাই অসংখ্য মানব, চাই বংশ বিস্তার। চাই সন্তান। সন্তান আনতে দরকার স্ত্রীলোকের এবং পুরুষের। কিন্তু কোথায় অত নর-নারী? তাই নর-নারীর মিলন ছিল অবাধ।' ভ্রাতা-ভগ্নী, মাতা-পুত্র, পিতা-পুত্রী মিথুনে কোন দ্বিধা ছিল না। জন্ম দেবার জন্যে বিধাতা সৃষ্টি করেছেন

তাদের। সন্তান প্রজননই তাদের একমাত্র কাজ। এই বোধ ব্যাভিচারের দোষে এবং গ্লানিতে কখনও কলংকিত করেনি তাদের। তাই মিথুনে আসক্ত তারা। মিথুন হল সৃষ্টি। এইভাবেই মানুষের বংশধারা বেড়ে বিরাট হল। কিন্তু একদিন মনুর মনে প্রথম গ্লানি জন্মাল। নিজেকে সে প্রশ্ন করল ঃ

"একই রক্তে দেহ গড়া, একই পিতামাতা।
তবু বরিতে হবে পত্নীরূপে ভগ্নী শতরূপায় ?
ভ্রাতা ভগ্নী পরস্পরে হবে শয্যা সহচর ?
এ কোন নিয়ম বিশ্ববিধাতার ?
সংকোচ লজ্জা সব ত্যজি তবু এ মিথুন !!
সৃষ্টির কারণে শুধু এই আচরণ ?
জননী বলিয়া ডাকিব কাহারে ?
কাহাকে বসাইব মাতার আসনে ?
হাহাকার করি উঠে মনুর অন্তর।
মানুষ নামের কলংক দৈব বিড়ম্বনা ;—
কেমনে সহ্য করি এই অনাচার—সৃষ্টির লাগিয়া !
ভূতলে বসিল মনু, গণ্ড বেয়ে ঝরে আঁখিজল।
মর্মের অসন্তোষ তীক্ষ্ণস্বরে আর্ত্তনাদ করে উঠে—
করিনু শপথ—নরনারীর এই মিথুন লাগিয়া
সমাজে আনিব বিধি বদ্ধ বিবাহনুষ্ঠান
আমি নিজে সমাজের বিধান রচিব।
দেহে দেহে শিরায় শিরায়
এক রক্ত যেথা বয়ে যায়
তারা কভু হইবে না প্রেমের মিথুন।"

তাহলে অন্য গোত্র কিংবা বংশের ছেলেমেয়ে পাবে কোথায় ? তাই, বিবাহ হল আপন বংশধারার মধ্যেই। দূর সম্পর্কের ভাই-বোন, খুল্লতাত মাতুল এবং নাতি নাতনীর সম্পর্কের মধ্যে। কিন্তু তাদের কেউ এক পিতামাতার সন্তান হবে না কখনও। এভাবেই

বহু দম্পতির সৃষ্টি হল। এদের সন্তান সন্ততির ধারায় সেই মানব বংশ বিস্তার হয়ে চলল। যত লোক বাড়ল, তত মানুষ জঙ্গল কেটে নতুন বসতি স্থাপন করল, বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর শাখা প্রশাখা ছড়াতে লাগলো। মানুষের সমাজ বিস্তৃত হল। রীতি নীতি নির্ধারিত হল। মনু হল সেই সমাজের প্রথম নেতা। তাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে মানুষের পূর্বপুরুষ মনুর নামানুসারে নিজেদের পরিচয় দিল 'মনুষ্য' বলে। মনু থেকে সমাজও সভ্যতার পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা—তাই তারা হল মানব। সিন্ধুর এ সভ্যতা কোন মনুর সৃষ্টি?

মনের এক অতলান্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে কশ্যপ দূরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত দেখছিল। পাহাড়ের ঢালু অংশ যেখানে দিগন্তের বুকে মিশেছে তার কোল ঘেঁষে আঁকাবাঁকা নদী চলে গেছে। সৈকতে বিছানো সোনালী বালি পড়ন্ত রোদের আলোয় তক্‌তক্‌, ঝক্‌ ঝক্‌ করছে। কয়েকদিন আগে ঐখানেই সে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। এখনও হয়ত বালিতে পায়ের চিহ্ন রয়েছে তার। এদেশ এ মাটি তার মন ছুঁয়েছে। জীবনের এক পরম স্পর্শের জন্য বিধাতার ইচ্ছায় সে এখানে এসেছে—এই প্রত্যয় এখন দৃঢ় হল তার মনে। বিধাতা তাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেবে না বলেই দিতির মত এক মিষ্টি মেয়ের প্রেম, সেবা, যত্ন সে পেয়েছে। তার নিঃসঙ্গ জীবনের বোঝা হাল্কা হয়ে গেছে তার জন্যে। জীবনের বিপর্যয়কে সয়ে নেবার জোর এনে দিয়েছে মনে। তার কল্যাণেই ফিরে পেয়েছে জীবন, দিতিই তার মন, প্রাণ সব। নিজের অজান্তেই তাকে খুব ভালবেসে ফেলেছে। তার নিভৃত মনের প্রেম এই শান্ত নির্জন প্রকৃতির রূপরাজ্যে রস ও বর্ণের পশরা মেলে দিয়েছে। খুশিতে ঝলমল করে মন। দেহ সতেজ হয়ে উঠে। অন্তর ভরা ভাল লাগার প্রশান্তি নিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। দেহের শিরায় শিরায় রক্তের মৃদু গুঞ্জরণ। বাতাসে ফুলের সৌরভ। মনে মধুর আবেশ। পাখী ডাকা বিকেল, পড়ন্ত রোদের হলুদ রাঙানো আলোর বনভূমি কেমন যেন একটা ঝড় তোলে কশ্যপের মনে।

ভাষাহীন এক অনুভূতির তাড়নায় সে দিতিকে খুঁজতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে সে এল এক পাহাড় গুহার কাছে। এদিকটা কখনও আসেনি সে। শারীরিক অক্ষমতার জন্যে পাহাড়টা আজও তার ভাল করে সব ঘুরে দেখা হয়নি। পাহাড়ের উঁচু-নিচু অসমতল গা বেয়ে লাফিয়ে চলতে চলতে সে একটা বেশ উত্তেজনা এবং মজা অনুভব করছিল। এমনি করে চলার পথের বাধাগুলো সে এক একটা করে ডিঙোবে। কোন বাধাকেই বাধা বলে মানবে না। এ পাহাড়ী ঝর্ণার মত দুরন্ত, উদ্দাম তার গতি। এই মুহূর্তে কশ্যপ নিজেকে নতুন করে অনুভব করে। তার চোখের উপর ভেসে ওঠে এদের সমৃদ্ধি; ঐশ্বর্য। পৃথিবীর সাজানো গোছানো একটি সংসার। এখানে কোন কিছুর অভাব রাখেনি প্রকৃতি। মানুষকে খাদ্যের জন্য বনের পশুর ভরসায় থাকতে হয় না। পশু পালনের জন্য তৃণভূমির অভাব নেই। সবুজ শ্যামলে ভরে আছে ধরা। যত দেখছে তত বেশী লাগছে চোখে। বুকের ভেতর অতৃপ্তির সুর ভরে ওঠে। পর্বতরাজ্যের মত ওর অতলে নীরব মৌন একটি সত্তা হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে। এক নতুন অনুভূতিতে তার মন রোমাঞ্চিত হয়। এদেশ, এ মাটির আঘ্রাণ সমস্ত দেহ মন দিয়ে সে শুধু গ্রহণ করেনি, এর বায়ু তার জীবন দিয়েছে, জল তৃষ্ণা মিটিয়েছে, মাটি আশ্রয় দিয়েছে, বনের ফলমূল তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। সুতরাং এ দেশ এ মাটির উপর তার অধিকার জন্মেছে। কিন্তু সে অধিকার মানবে কে? কি করেই বা পাবে তার স্বামিত্ব? হঠাৎ মনের মধ্যে কামনার আগুন জ্বলে। কশ্যপের চাহনি বদলে যায়। বুকের ভেতর একটা অসাড় ভাব জেগে ওঠে। যন্ত্রণায় চিন্ চিন্ করে সারা শরীর। পাহাড়ের বনে বনে ঝড় উঠেছে। উতরোল ঝড়। ঝড় কশ্যপের বুকে। দূরে পাহাড়ী ঝর্ণার গর্জন শোনা যাচ্ছে। কশ্যপের শূন্য বুকে সেই শব্দ পাঁজরে ঘা খেয়ে যেন অট্টহাস্য করে ওঠে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কশ্যপ। নিবিষ্টমনে পাহাড় গায়ে ছবি আঁকছে দিতি। দুই চোখ তার ছবির উপর স্থির। মনে হল, সে যেন ধ্যান করছে।

অবাক চোখে রেখাচিত্রের দিকে তাকিয়ে ছিল কশ্যপ। চোখে তার মুগ্ধতা। বুকে সিন্ধুর কল্লোল। একি দেখছে সে ? বহুকাল আগে সে নিজেকে দেখেছিল হ্রদের স্বচ্ছ জলে। নিজেকে দেখা এবং অনুভব করার অনাস্বাদিত তৃপ্তি ও সুখের উল্লাসে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল সে। জলের ছায়ায় নিজেকে তন্ন তন্ন করে খোঁজে সে। নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করে সে নিজের ছায়া দেখে। তারপর থেকে এক অদ্ভুত দেখার নেশায় সে বহুবার গেছে সেই হ্রদের ধারে। দিতির অঙ্কিত রেখাচিত্রের সঙ্গে তার অবয়বের প্রতিকৃতির আশ্চর্য মিল। মিল নিশ্চয়ই চোখের, ঠোঁটের, হাসির, মুখের আকৃতির। পুরুষটির পেশীবহুল দেহের সবল বলিষ্ঠতা, তার দৃপ্তভঙ্গী, অনবদ্য আঁখি, উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত ললাট, প্রশান্ত মুখশ্রীর মধ্যে এমন একটা চুম্বক আকর্ষণ আছে যে সেদিকে না তাকিয়ে থাকা যায় না।

কশ্যপের দুই চোখের দৃষ্টি স্থির। তন্ময় হয়ে সে নিজের রূপ এবং আকৃতি দেখছিল ছবির রেখায়। আর কেমন একটা ভাল লাগার মুগ্ধ আবেশে তার চাহনি বিভোর হয়ে যায়। ছবির মধ্যে কশ্যপ শুধু নিজেকে দেখে না, আবিষ্কার করে। হ্রদের জলে সবল দেহের পৌরুষ কঠিন নির্ভয়রূপ তার দৃঢ়তা, তেজ, দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব এসব অতিরিক্ত কিছু দেখতে পাইনি। ছবির রেখায় আজ প্রথম অনুভব করল তাকে। বিস্ময় লাগে কশ্যপের। সত্তার গভীরে, রক্তের স্পন্দনে সে অনুভব করে তার এই শক্তি এবং তেজকে। কিন্তু তাকে এমন করে রেখায় ফুটিয়ে তুলল দিতি কেমন করে ? এ আশ্চর্য ক্ষমতা সে পেল কোথায় ? বিধাতা দিতিকে একটা আলাদা চোখ দিয়েছেন। সেই চোখে তাকে দেখেছে সে। পেশীবহুল দেহের খাঁজে খাঁজে, টানা ভুরুর নিচে দীপ্ত দুই আঁখির মণিতে, ওষ্ঠের রেখায়, ললাটের ভাঁজে, ঘাড় পর্যন্ত ঢেউ খেলানো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল এবং আকর্ণ বিস্তৃত হাসির সাংকেতিক রেখায় ফুটেছে তার বীরের রূপ। বিক্রম প্রকাশ করতে হাতে তার দীর্ঘ একটি ভল্ল দিয়েছে। কশ্যপ নিজের সম্পর্কে কৌতুক বোধ করল।

পাহাড় গায়ে আরো অনেক অস্পষ্ট, মলিন ছবি তার চোখে পড়ল। এরকম অনেক অপরিণত আঁকা সে সুমের দেশের পাহাড় গাত্রে দেখেছে। এগুলো খেয়াল বশে অনেককে আঁকতে দেখেছে। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে যে সেগুলো আঁকে তা সে জানত না। জানার কোন কৌতুহলও বোধ করেনি। সেগুলি ছিল নিতান্তই মামুলি, সাধারণ। বেশির ভাগ বনের বিভিন্ন পশুর প্রতিকৃতি। কিংবা হিংস্র পশুবধের কোন ছবি। নিজের প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে সে সবের অর্থ খুঁজে পেল আজ। চোখের উপর ভাসছে একটা ছবি। হিংস্র সিংহকে বধ করার জন্য তার পূর্বপুরুষেরা ভল্ল হাতে চতুর্দ্দিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলেছে। আর একটি চিত্রে সিংহটির নিরুপায় অসহায় ক্রোধের বন্য অভিব্যক্তি। অন্য একটি চিত্রে সিংহটি মানুষজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু তার দেহ অসংখ্য ভল্লে বিদ্ধ হয়েছে। সিংহটি তখনি মরে গেছে, পূর্বপুরুষেরাও এই পৃথিবী থেকে মুছে গেছে। কিন্তু তাদের এই চিত্র সাক্ষী হয়ে আছে তাদের জীবনের। এক সুদূর অতীত তার উত্তরাধিকারিদের চোখে জীবন্ত করে রাখার জন্যেই মানুষের এই চিত্র পরিকল্পনা। চিত্র চিরস্থায়ী করে রাখে সব কিছু। তা-হলে দিতিও তাকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যে পাহাড়ের গায়ে তাকে এঁকেছে। দিতির ছবি জীবন্ত, স্পষ্ট। তার এ মূর্ত্তি কোন কালে মুছবে না। আগামীকালের মানুষের কাছে তার পরিচয় চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য দিতি চিত্রলিপিতে কি সব লিখেছে। আনন্দে কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল কশ্যপের বুক। খুশীর আবেশে শরীর চঞ্চল হল। মন হল অস্থির। দেহের কোষে কোষে অস্বস্তিকর অনুভূতির যন্ত্রণা। নিজেকে বশে রাখা কঠিন হল কশ্যপের।

দিতির কাঁধ স্পর্শ করে সে অস্ফুট স্বরে ডাকল: দিতি।

তপ্ত হাতের হঠাৎ ছোঁয়ায় দিতির শরীর কেঁপে গেল। কশ্যপের কণ্ঠস্বরে তার চমক ভাঙল। অঙ্কনের উপর দৃষ্টি স্থির রেখে বলল: প্রিয়তম।

কশ্যপের হাত ছিল দিতির কাঁধে। প্রতিচ্ছবি সম্পর্কে কৌতুহল

প্রকাশ করতে কেমন যেন লজ্জা জাগল তার। কথা বলার সময় একটা সংকোচভাব প্রকাশ পেল তার গলায়। জিগ্যেস করল: এ কার ছবি আঁকছ তুমি?

অকম্পিত কণ্ঠে নির্লিপ্তভাবে বলল: আমার দেবতার।

কশ্যপের চোখে বিস্ময়। দিতি তাকে এত ভালবাসে? -তবু প্রেমিকের সংশয় তার মনে। ঠোঁটের কূলে টেপা কৌতুক হাসি। বলল: সে কে? কোথায় থাকে?

জানি না কে সে? আমার মনেতেই তার বাস।

হেয়ালী থাক। স্পষ্ট করে বল।

অস্পষ্ট হওয়ার মত কোন কথাই বলিনি।

তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

বোঝার চেষ্টা করছ কি?

এ কথা কেন বলছ? আমি তোমার আশ্রিত। অনুগত বান্ধব।

বিধাতার দূত তুমি।

উত্তর দেবার মত কথা যোগাল না কশ্যপের। অনেকক্ষণ নিরুত্তর থাকার পর চিত্র সম্পর্কে পুনরায় কৌতূহল প্রকাশ করল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে জিগ্যেস করল: তোমার আকা চিত্রের পাশে আঁকা ছবিগুলি কার? কে এঁকেছে ঐ অদ্ভুত মানুষটিকে?

অভিমানে দিতির কণ্ঠস্বর ভারী হল। বলল: জানি না। পূর্বপুরুষদের কেউ হয়ত এঁকেছে।

দিতির দুই চোখে অসহায় বিস্ময়। বুকে গভীর হতাশার ঘন নিঃশ্বাস। ভাঙা ভাঙা স্বরে বলল: আমার মত কোন অভাগিনী হয়ত এঁকেছে। চোখে দেখার তৃষ্ণা, কাছে পাওয়ার সাধ মেটাতে—

কথা তার আটকে যায়। কণ্ঠস্বরে তার অসহায় বেদনার আভাস। কশ্যপের স্বরে বিস্ময়ের সুর। তুমি নিজেকে অভাগিনী বলছ কেন? তোমার কিসের দুঃখ?

মুহূর্তে দিতির চোখের চাহনি বদলে যায়। চোখ ছলছলিয়ে উঠে। এক তীব্র অভিমানে গলার স্বর আচ্ছন্ন। বলল: আমার

চিত্রের কোন অর্থ হয় না। এসব আঁকি কেন? কি জন্য করি? কিছু জানি না। মানুষ একটা কিছু নিয়ে থাকতে ভালবাসে। নানাভাবে তার অবলম্বন খোঁজে। আমিও খুঁজি চিত্রের মধ্যে। কিন্তু পেলাম কৈ?

ঝটিতি উঠে দাঁড়াল দিতি। কশ্যপের বুক ঘেঁষে সে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা নিবিড় দৃষ্টি ওর দুই চোখে। মুখখানা এগিয়ে ধরে কশ্যপের চোখের উপর। থুত্নিতে হাত দিয়ে বলল: সোজা তাকাও আমার দিকে। ছাখ, আমার মনিতে তোমার মুখ। তারপর, তাকাও ওই চিত্রের দিকে। বল, কে, ওই রেখার বাঁধনে বন্দী মানব? বল? চুপ করে থেক না। চুপ করে থাকলে আমার উত্তর পাব না।

দিতির জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল বেদনা ও আর্তি। অনুসন্ধিৎসা তীব্র। একটা প্রচ্ছন্ন উদ্বেগও প্রকাশ পেল।

দিতির ঘন সান্নিধ্য কশ্যপের পুরুষ শরীরের প্রতিটি অঙ্গে দুরন্ত এক উত্তাপ জাগাল। নানা সংকোচ এবং বাধা নিচে চাপা পড়া রক্তের বারুদে যেন আগুন লাগল। নিজের অজান্তে সে দিতির মুখখানা দুই হাতে করে তার কৌতুক দৃষ্টির সামনে তুলে ধরল। প্রেমানুভবের তীব্রতায় চোখ তার জ্বলজ্বল করছিল। কিন্তু কেমন একটা সহিষ্ণুতা ওকে পীড়া দিচ্ছিল। গভীর সুখকর একটা অনুভূতির মধ্যে হারিয়ে যেতে যেতে সে বলল: দিতি তুমি এক আশ্চর্য সুন্দর নারী। কি অদ্ভুত তোমার ক্ষমতা। সামান্য কয়েকটা রেখায় আমাকে আকলে অনুপম করে। নিরুপমা তুমি। তোমাকে পেয়ে ধন্য আমি। সার্থক আমার জন্ম।

কশ্যপের মাথা নুইয়ে এসেছিল দিতির গালের উপর। দিতিও কি এক গভীর আবেশের মধ্যে ডুবে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরেছিল। কশ্যপ তার ঠোঁট স্পর্শ করেছিল। সেই স্পর্শ চুম্বনে অনভিজ্ঞ দিতির অনুভূতিতে স্বর্গীয়সুখের আবেশ আনল। কশ্যপের আবেগ তীব্রতায় সেও আত্মহারা। দুই হাতে চেপে ধরল বুকে। তারপর সুডৌল স্তনের উপর তার লোমশ বক্ষ স্থাপন করে একটু একটু করে চাপ দিতে

লাগল দিতি। আগ্রাসী তৃষ্ণার চুমুকে নিজেকে সম্পূর্ণ করে দান করার সুখে সে হারিয়ে যাচ্ছিল। তার চৈতন্য আচ্ছন্ন হল। সুখের উষ্ণতা দপ্ দপ্ করছিল। তবু, একটা লজ্জায় আড়ষ্ট এবং শক্ত হয়ে থাকে তার শরীর। কশ্যপের প্রবল ইচ্ছাশক্তি বাধা দেবার মত শক্তি ছিলনা তার, তথাপি একটা প্রবল লজ্জায় তার মুখ রাঙা হয়ে গেল। বুকের কাছে মুখ লুকিয়ে মৃদু আপত্তি জানাল। বলল : না, না, আমি পারি না। লক্ষ্মীটি—

তারপর এক ভাষাহীন স্তব্ধতার মধ্যে দুজনের নিঃশ্বাসের সংঘাতে সঘন শব্দ পাতার মর্মর ধ্বনির মত বাজছিল।

॥ তিন ॥

চতুর্দিক স্তব্ধ নীরব। মন্দিরে বেজে উঠে পূজার ঘণ্টা। দিতির অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ দূর দিগন্তে—পাহাড়চূড়ায়। এক অব্যক্ত অনুভূতির পুলক চাঞ্চল্য জাগায় দেহের প্রতি শোণিতকণিকায়। যৌবনের আবেশে বিভোর তার মন। আপন মনে হাসে, বিড়্‌বিড়্‌ করে কথা বলে। প্রজাপতির মত রঙীন বসন উড়িয়ে চঞ্চল ছন্দে ঘুরে বেড়ায় প্রাসাদের ছাদে, অলিন্দে, কুঞ্জে। কশ্যপের পৌরুষ স্পর্শ একটা অসাধারণ আলোড়ন এনে দিল জীবনচিন্তায়। চলার ছন্দে আনল একটি সুরচ্ছন্দ। যৌবনময় অন্তরে জেগে আছে এক মধুর স্মৃতি, আর কশ্যপের যৌবনদীপ্ত অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী ও লাবণ্য। বুকের ধক্ ধক্ শব্দে তার মৃদঙ্গনিনাদিত কণ্ঠধ্বনি অণুরণিত হয়।

দিতি, দেবতা বল না আমায়। আমি দেবতা নই। পৃথিবীর অন্য এক প্রান্তের মানুষ। তোমার মতই রক্ত মাংসের মানুষ। আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা আছে, কামনা-বাসনা, প্রেম মত্ততা আছে। আমি এই পৃথিবীরই মানুষ। তুমি আমার কামনার ধন। জীবন পথের দিশারী। তোমাকে

আমার ভীষণ প্রয়োজন। তাই'ত দেবতা পাঠিয়েছে তোমাকে। তুমি ঈশ্বরের দান। আমাকে অনুগ্রহ কর, কৃপা কর। বিদেশী বলে ত্যাগ কর না। বরণ করে আমাকে কৃতার্থ কর।

বিভ্রান্ত বিস্ময়ে আচ্ছন্ন গলায় দিতি অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করল: ঈশ্বর কে? কোথায় তাঁর বাস?

কশ্যপের প্রেমমুগ্ধ দুই নয়নে কিসের তন্ময়তা। কেমন একটি আচ্ছন্ন ভাব। থমথমে মুখ। বিভোর চাহনিতে ঐন্দ্রজালিক আবেশ। দিতির মুগ্ধ দুই নেত্রে মদির বিহ্বলতা। কশ্যপের মুখখানি নেমে এসেছে দিতির ঠোঁটের উপকূলে। আচ্ছন্ন গলায় দিতির প্রশ্নের উত্তরে বলল:

জলে স্থলে নভোমণ্ডলে তিনি আছেন। তাঁর রহস্য এবং অসীম বিস্ময় ক্ষমতা বিশ্বে পরিব্যপ্ত। প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যেও আছেন, বস্তুর মধ্যেও আছেন তিনি। সূর্যের তেজ, বায়ুর গতি, ঝঞ্ঝার বিভীষিকা, বজ্রের আতঙ্ক, বিদ্যুতের ঔজ্জ্বল্য, অগ্নির সর্বগ্রাসী ক্ষুধা, বর্ষণের দুর্ভোগ, সমুদ্রের প্লাবন এই সব প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে আদিম পূর্বপুরুষেরা সৃষ্টি কর্তার অসীম শক্তির অভিব্যক্তি বলে অনুভব করল। কুঠার ভল্লও মুষলের মধ্যেও অনুরূপ দানবীয় শক্তির ভয়ংকর ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করল। বিশ্বে পরিব্যাপ্ত এই শক্তিকে দেবশক্তির অভিব্যক্তি বলে ভাবল। সেই অনুভূতিই রূপান্তরিত হল দেব কল্পনায়। প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক শক্তিই ভিন্ন। প্রত্যেক শক্তি এক একটি স্বতন্ত্র সত্তা। তাদের ধর্ম-কর্ম, ইচ্ছা, অভিব্যক্তিও আলাদা। প্রাকৃতিক শক্তির এই রহস্যের কোন ব্যাখ্যা তারা খুঁজে পেত না। প্রাকৃতিক শক্তিকে ঐশী শক্তির অভিব্যক্তি মনে করে; তারা, চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, জল, বায়ুর পৃথক মূর্ত্তি কল্পনা করে তাকে পূজা করতে লাগল। আদিম পূর্বপুরুষের প্রাণবন্ত কল্পনায় দেবতা ছিল প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক। সেই আদিম অনুভূতিই আমরা পেয়েছি উত্তরাধিকার সূত্রে।'

দিতি!

সহসা পিতা প্রাচেতসের আহ্বানে ভেঙে গেল চিন্তার তন্ময়তা।

সবিস্ময়ে পিতার মুখপানে বোবা চাহনি মেলে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

প্রাচেতস সস্নেহে কন্যার চিবুক স্পর্শ করে মুখখানি উঁচু করে তুলে ধরল তার চোখের উপর। মৃদু কণ্ঠে বলল: তোমার কি হয়েছে? তোমার নামে নানা অভিযোগ শুনতে পাই। তুমি নাকি আজকাল সর্বক্ষন নন্দন কাননে কাটাও। পরিচারিকাদের সঙ্গে নাও না। নিষিদ্ধ পাহাড়ে একা যাও। ঐ পাহাড়ে নাকি অদ্ভুত দর্শনের এক আশ্চর্য সুন্দর মানুষ থাকে। অনেকেই দেখেছে তাকে। তোমার জননী ওখানে যেতে তোমায় নিষেধ করেছে, তবু তার কথা শোননি তুমি। লোকের সন্দেহ এবং অভিযোগের জবাব শুনতে তোমার কাছে এসেছি। যা শুনছি তা কি সব সত্য? স্বাধীনভাবে বনে জঙ্গলে একা একা ঘুরে বেড়ানো যে উচিত নয়, এটা বোঝার বয়স তোমার হয়েছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে একা একা ফেরা যে ঠিক নয় একথাও বোঝ তুমি, তবু আমার স্নেহ-দৌর্ব্বল্যের সুযোগ নিয়ে তুমি তা করছ। দিন দিন অবাধ্য দুর্বিনীত হচ্ছ। কেন?

সকরুণ বিহ্বল দৃষ্টিতে দিতি তাকিয়ে থাকে পিতার দিকে। তারপর বিনম্রস্বরে বলে—পিতা, তুমি কি আমায় শুধু তিরস্কার করবে? অভিমানে দিতির চোখ ছলছলিয়ে উঠল। ঠোঁটের উপকূলে তার চেপা কান্না।

প্রাচেতস অপ্রস্তুত হল। মাতৃহীনা কন্যার বিগলিত অন্তরের গোপন অশ্রুপাতে তার পিতৃহৃদয় বিচলিত হল। ব্যথায় চিন্ চিন্ করে উঠল। মুহূর্তে চোখের পাতায় একটা নিবিড়তা নেমে এল। অনেকটা আচ্ছন্নের মত সস্নেহে তাকে বুকে টেনে নিয়ে মস্তক আঘ্রাণ করল। পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে তার কষ্ট কিছুটা উপশম করবার চেষ্টা করল। পিতার স্নেহস্পর্শে শান্ত হল দিতি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল তাদের।

প্রাচেতসের কোঁচকানো ভুরু সরল হয়ে এল। কণ্ঠস্বরও সহজ এবং স্বাভাবিক হল। গাঢ় স্বরে বলল: তুমি স্বাধীন হও কিন্তু স্বৈরিণী

হয়ো না মা। সৎ হও, কপটচারী হয়ো না। প্রাণান্তেও মিথ্যাভাষী হবে না। বিস্মৃত হয়ো না মনুষ্যত্ববোধ।

বিপন্নের মত আর্ত্তকণ্ঠে উচ্চারণ করল দিতি। একটা কষ্টবিদ্ধ যন্ত্রণায় মুহূর্ত্তে তার মুখের ভাব বদলে গেল। উদ্‌গত নিঃশ্বাস বুকে চেপে পিতার দিকে তাকাল। অপ্রস্তুত ভাবে চোখের দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ নামিয়ে নিল। একটা বিব্রত লজ্জা এবং গ্লানি চকিতে বিদ্ধ করল তাকে। পিতা তার বন্ধু, সখা। কোন কথা কোনদিন গোপন করেনি তাকে। আজ অনুভব করল পিতাকেও সব কথা খুলে বলা যায় না, সম্ভবও হয় না। পিতার কাছে সত্যকে গোপন রাখা এবং ছলনা করার দুঃখ এত গভীরভাবে তার মনে বাজল যে, আচ্ছন্নের মত সে মাথা নাড়ছিল ; আর মুখ দিয়ে একটা "আঃ আঃ" আর্ত্তরব একবার ক্ষীণস্বরে বেরোল। যার অর্থ নানাবিধ এবং অপরিচ্ছন্ন।

দিতির কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠেছিল প্রাচেতস। তার পিতৃহৃদয়ে একটা অকারণ উৎকণ্ঠা জাগল। সাধারণভাবে সে সন্দেহপরায়ণ নয়। তবু তার দৃষ্টিতে কেমন একটা তীব্র অনুসন্ধিৎসা ছিল। যা দেখে দিতি অস্বস্তিবোধ করল। চোখে ফুটে উঠল তার অভিব্যক্তি।

প্রাচেতস বিহ্বল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, বৎস কি হয়েছে তোমার ? অমন করে আর্ত্তরব করলে কেন ?

দিতির মুখে লজ্জার ঝলক লাগল। আঁখিতে তার জমাট বাঁধা অশ্রু।

বিস্ময়ভরা সন্দিগ্ধ চোখে প্রাচেতস গভীরভাবে বারংবার তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল। তার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দিতি অস্বস্তিবোধ করছিল। আশংকায় কাঁপছিল তার ওষ্ঠ, চিবুক। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল। স্নেহদৃষ্টিতে দিতির দিকে তাকিয়ে বিলম্বিত উচ্চারণে কথাগুলো স্বগতোক্তি করল প্রাচেতস।

—একি মা ! তোর আঁখিতে অশ্রু ? আমার কথায় কি দুঃখ পেলি মা ?

পিতার সস্নেহ মধুর বচনে দিতি অভিভূত হল। চোখ দিয়ে

টপ্ টপ্ করে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল। কান্না ভেজা চাহনি মেলে প্রাচেতসের দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় বলল : পিতা আতুরকে সেবা করা কি অন্যায়? দীনজনে দরদী হয়ে হৃদয় দান করা কি অপরাধ? মনুষ্যত্ববোধ বিস্মৃত না হওয়ার শিক্ষা দিয়েছ তুমি। এখন সে কাজ করলে কি দোষী হব আমি? বল? বল, মানুষকে ভালবাসা কি অপরাধ?

এ প্রশ্নে প্রাচেতসের চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হল। বিস্ময়ভরা অপলক দৃষ্টিতে দিতির দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর, সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর করল প্রাচেতস—অপরাধ হবে কেন মা? সিন্ধুর মানুষ তার মহানুভবতা, উদারতা এবং মনুষ্যত্ববোধের জন্য গর্ব করে। দ্বেষ বিদ্বেষ বিধাতা লেখেনি তার বুকে। আকাশের মত বিশাল তার চেতনালোক।

তা হলে, আমাকে অভিযুক্ত করছ কেন? আমি'ত তোমার নির্দ্দেশ অমান্য করিনি। সিন্ধুর ঐতিহ্যও ক্ষুণ্ণ করিনি।

উৎকণ্ঠায় বিচলিত হল প্রচেতসের অন্তর। বলল : তোমার কথা আমার দুর্বোধ্য লাগছে। সংশয় কেবল দৃঢ় হচ্ছে। মনে হচ্ছে তোমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সমর্থনে তুমি এই সব কথা বলছ। উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছ। কিন্তু তা হতে দেব না। সত্য জবাব তোমায় দিতেই হবে। পিতার কাছে মিথ্যে বলতে নেই।

সত্য গোপনের কোন চেষ্টাই আমার নেই। বিবেকমত ঠিক কাজ করেছি কিনা ,তার প্রশ্ন করেছি। এখন আমার মনে কোন গ্লানি নেই। বলতেও কোন দ্বিধা নেই। তোমাকে গোপন করে শান্তি পাচ্ছি না। কিন্তু কিভাবে বললে যে ভাল হয়; তাও ভেবে পাচ্ছি না। কালিবঙ্গানে তুমি তখন অনুপস্থিত। সেই সময় ঘটল এক অবিশ্বাস্য বিস্ময়কর ঘটনা। নিজের অজান্তে আমি জড়িয়ে পড়লাম তার সঙ্গে।

যৌবনদৃপ্ত দেবকান্ত যুবক কশ্যপের দৃপ্ত পৌরুষভরা মুখচ্ছবি ভেসে উঠল তার অন্তরপটে। বিচিত্র হাসির আভা ফুটল তার মুখমণ্ডলে।

কশ্যপকে নিয়ে গল্পের এক ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করল দিতি। গল্পের চুম্বক আকর্ষণে মজে গেল প্রাচেতস।

প্রাচেতসকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল দিতি। কোন কথাই গোপন রাখল না। এমন কি সে যে কশ্যপের ভালোবাসায় মুগ্ধ, আবিষ্ট এবং তার অনাঘ্রাত যৌবন যে তাকে নিবেদন করেছে সে কথাও বলল অকপটে।

বিস্ময়ে পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হয়ে গেল প্রাচেতস। অবাক বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দিতির দিকে। অকারণ এক শংকায় তার পিতৃহৃদয় আবর্ত্তিত হল। ভ্রূযুগলে প্রকাশিত হল গভীর উৎকণ্ঠা। প্রাসাদ অলিন্দে দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট অন্তরে সচঞ্চলে পদচারণ করতে লাগল। একটা দারুন শঙ্কা, সংশয়, দুশ্চিন্তার কালো ছায়া তার ভাবনাকে গ্রাস করল। ক্লান্ত, অবসন্ন লাগল তাকে।

গোধূলি আকাশে সন্ধ্যাতারা এক দুই, তিন চার করে ফুটছিল, আর পূবের আকাশ ঘোর কালিবর্ণ হয়ে উঠছিল। কিন্তু দিতির মুখে কোথাও কলঙ্কের ছাপ ছিল না। সন্ধ্যাতারার অমলিন জ্যোতির মতই দীপ্ত সুন্দর তার মুখশ্রী। স্বর্গীয় প্রশান্তিতে কান্তিময়। দিতিকে ভীষণ রহস্যময় মনে হল প্রাচেতসের। আদিকাল থেকে দেবতা সম্বন্ধে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে যেসব কৌতূহল মানুষের আছে তারই সূত্রে এলোরার গল্প মনে পড়ল তার। এলোরা তাদের বংশেরই মহিলা। দিতির মত সেও এক দেবতার সংস্পর্শে এসেছিল। অতীতের মনে সেই গল্প প্রাচেতসের মনে আবর্ত্তিত হতে লাগল।

রাত্রির ঘন কালো অন্ধকারের যবনিকা সরিয়ে দিয়ে হঠাৎ উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হল ধরণীতল। পক্ষীরা ভয় পেয়ে আর্ত্ত চিৎকার করে এক বৃক্ষ থেকে আর এক বৃক্ষশাখায় উড়ে গেল। ঘুমের ভেতর চমকে উঠল এলোরা। চোখের পাতা দুটো আপনা হতে খুলে গেল তার। অন্ধকার গুহায় এক ঝলক আলো এসে পড়ল। সূর্যের আলোর মত প্রখর বা উজ্জ্বল নয়। রক্তাভ রঙের আলোয় রাঙা হয়ে গেলে চতুর্দিক। বিস্ময়ে সে বাইরে বেড়িয়ে এল। অমনি এক আলোর মশালে তার

চক্ষু ধাঁধিয়ে গেল। উজ্জ্বলিত আলোর কেন্দ্রবিন্দুতে এলোরা একজন জ্যোতির্ময় পুরুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। শিরে তার জ্যোতির কিরীট, অঙ্গে তার পিঙ্গল বসন। কটিতে উষ্ণীষ। এলোরার চোখের বাদামী তারায় বিস্ময়। কী অপূর্ব আকর্ষণীয় লালিত্যময় সুঠাম দেহাবয়ব তার। দৃপ্ত পৌরুষভরা মুখচ্ছবি।

এলোরার প্রস্তরীভূত প্রায় অবস্থা। অদ্ভুত আকৃতির মানুষটি এলোরাকে ইশারায় কাছে ডাকল। লোকটির মায়াদৃষ্টি এলোরাকে আচ্ছন্ন করল। তার ইচ্ছাশক্তি লোপ পেল। যন্ত্রচালিতের মত সে তার কাছে গেল। দীপ্ত দুই আঁখি মেলে আগন্তুককে এলোরা দেখতে লাগল। এলোরার চোখে এই প্রকৃতি, চরাচর মুহূর্তে অপরূপ এবং অলৌকিকরূপে প্রতিভাত হল। উদ্দীপ্ত, উন্মুক্ত দুই চোখের তারায় তার বিহ্বলতা নামল।

আগন্তুক এলোরার কাঁধে হাত রাখল। কানের কাছে মুখ রেখে চুপি চুপি বলল, আমি স্বর্গলোকের বাসিন্দা। দ্যোঃ। আকাশে ঐ নক্ষত্র দেশে আমার ঘর। আকাশ থেকে মর্তে এসেছি সঙ্গিণীর অন্বেষণে। তুমি আমার সঙ্গিণী হও এলোরা। এলোরার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ শিহরণ ছড়িয়ে পড়ল। সম্মোহিত অবস্থা তার। এলোরা কিছু বলার আগে দ্যোঃ তাকে নিয়ে ঊর্ধ্ব আকাশে উড়ে চলে। দুই হাতে এলোরার শরীরটাকে তার বুকের উপর জড়িয়ে ধরল। অঙ্গে অঙ্গে লেপ্টে রইল তার সঙ্গে। তারপর কেমন একটা সুখের অনুভূতির মধ্যে ডুবে গেল এলোরার চেতনা। চোখের সামনে ম্লান জ্যোৎস্নায় ঝাপ্সা আকাশকে আরো সুন্দর মনে হল। সবকিছু অলৌকিক বোধ হল, মনে হল স্বপ্ন।

কিছুক্ষণ উড়বার পর দ্যোঃ বলল ঃ এলোরা নিচের দিকে তাকিয়ে দেখ ; পৃথিবী কেমন বদলে গেছে।

দ্যো'র গায়ে গা মিশিয়ে এলোরা ভয়ে ভয়ে পৃথিবীর দিকে তাকাল। এক নতুন পৃথিবী দেখল সে। চেনা পৃথিবীটা তার হারিয়ে গেছে। পৃথিবীর রূপ গেছে বদলে। যা ছিল বিশাল বিরাট তা হয়ে গেছে

ক্ষুদ্র। গোটা পৃথিবীটা একটা সরার মত দেখাছে। বন উপবন পাহাড় নদী-প্রান্তর সব একাকার হয়ে গেছে। ঘন কালো বিন্দুর মত দেখাচ্ছে পৃথিবীকে। কিন্তু মাথার উপর বিরাট আকাশখানা ঠিক আছে, একটুও ছোট হয়নি তার আয়তন। বরং আরো বিশাল দেখাচ্ছে। মেয়েরা তাদের গা ছুঁয়ে ভেসে যাচ্ছে। আর সে হারিয়ে যাচ্ছে একটা স্বপ্নের মধ্যে। তারপর একসময় দ্যোঃ এর বুকের উপর ঘুমিয়ে পড়ল এলোরা। ক্রোধান্ধ দ্যোঃ তখন অভিসম্পাত দিয়ে তাকে আকাশ থেকে ঠেলে ফেলে দিল। শরীরটা বায়ুতে ভাসতে ভাসতে একদিন নিষিদ্ধ পাহাড় চূড়ায় এসে ঠেকল।

এলোরাকে তখন চেনার উপায় নেই। তার চেহারা বদলে গেছে। দেখতে সুন্দর হয়েছে। গায়ের রঙ পাল্টেছে। কেশে লেগেছে সোনালী রঙের ছোঁয়া। কথাবার্ত্তাতেও কেমন একটা অলৌকিক স্পর্শ। পৃথিবীর মানুষের মত তখন আর সে নেই। পাহাড় চূড়ায় যেদিন তার পদার্পণ ঘটল, বায়সেরা অমনি কর্কশস্বরে ডেকে উঠল। মোরগ আর্ত্তস্বরে চীৎকার করল। বনের পশুরা হুংকার দিল। আকাশ গর্জন করে উঠল। ঝঞ্ঝায় লণ্ডভণ্ড হল বন-উপবন। নদী তার গতি বদলাল, হ্রদের জল শুকিয়ে গেল। মেদিনী কেঁপে উঠল, জলোচ্ছাসে প্লাবিত হল লোকালয়। চতুর্দিকে অমঙ্গল আর অশুভের লক্ষণগুলি প্রকাশ পেল। এলোরা ভীত হল। বিচলিত হল। ওঝা এবং মাতব্বেরা বলল—এলোরা অভিশপ্ত। দেবতার অভিশাপেই এই বিপর্যয়। এলোরা কালিবঙ্গার অভিশাপ। সে ডাইনী। তাকে হত্যা কর। তারপর জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা বিধান হল। কিন্তু সে কথা শোনার পরেও এলোরার কোন প্রতিক্রিয়া নেই। সে নির্বিকার নিশ্চল।

নির্ভয়ে অগ্নির সামনে দাঁড়াল এলোরা। অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করার সময় উচ্চৈস্বরে বলল ওগো জ্যোতির্ময়। সর্বভুক্ দেবতা, তুমি জান; অন্তরের ক্রোধে দ্যোঃ আমাকে দিয়েছেন নির্বাসন, তাঁর সেই দম্ভে ক্রুদ্ধ হয়েছে প্রকৃতি, জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সে নির্যাতিত করেছে আমাদের; ক্রুদ্ধ

মানুষ তাই যন্ত্রণা দিয়ে বিদ্ধ করতে চায় আমাকে। আমি চেয়েছি সাহায্য, কেউ আমার হাতখানি ধরেনি, আমি কেঁদেছি কেউ আমার পাশে এসে দাঁড়ায়নি। দুঃখে আর্তনাদ করেছি, কেউ কর্ণপাত করেনি। এখন আমায় তুমি গ্রহণ কর। দুর্মতিগ্রস্ত মানব এরা, এদের বোধশক্তি নেই, কিন্তু যে পাপ করেছি আমি তার দণ্ড দাও, দণ্ড দাও প্রভু। এদের দেশ সুখের হোক, শান্তির হোক।

অকস্মাৎ প্রধান ওঝা তার আদেশ দণ্ড ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করে তাকে প্রদক্ষিণ থেকে বিরত হতে আদেশ করল। বজ্রগম্ভীর স্বরে এলোরাকে সম্বোধন করে বলল ঃ মুক্ত তুমি. নারী। দেবসন্তান গর্ভে বহে যে জন, সে'ত নমস্য সবার। মূর্খ আমি , না জেনে করেছি অপরাধ।

স্তব্ধ বিস্ময়ে দিতি পিতার মুখের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়েছিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত প্রচেতস কোন কথা বলল না। পিতার আকস্মিক ভাবান্তর দিতিকে আশ্চর্যান্বিত করল। হতাশ অন্তরে মহাব্যস্ততায় সে অস্ফুটস্বরে ডাকল, পিতা! পিতা তুমি কি অসুস্থ? এর আগে তোমাকে কখনো এত অন্যমনস্ক দেখিনি। তোমার কি হয়েছে? তোমার শুষ্ক মুখ, উদাস নয়ন, আমাকে উদ্বিগ্ন করছে। পিতা!

দিতির ব্যাকুলিত প্রশ্নে প্রচেতসের তন্ময়তা ভঙ্গ হল। আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল ঃ আমার কিছুই হয়নি মা। শুধু তোমার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হচ্ছি।

কেন? আমার কি হয়েছে?

ভালমন্দ বোঝার জ্ঞান তোমার নেই, তাই জান না নিজের অজান্তে কি সর্বনাশ করেছ তোমার?

সর্বনাশ কেন বলছ?

দেবতার সংস্পর্শ সুখের হয় না। এলোরা সুখী হয়নি। তার জীবন দুর্বিষহ হয়েছিল দেবতার অভিশাপে।

দিতি তৎক্ষণাৎ, একজন পরিণত নারী হয়ে উঠে। সহসা তার কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়। দু'চোখ বিস্ফারিত করে বলে—পিতা, মানুষের দুর্দ্দশার কারণ কখনো দেবতা নয়। তার জন্য দায়ী মানুষ নিজেই।

মানুষের নিজের মধ্যেকার ত্রুটি-বিচ্যুতি, কুসংস্কার, বিশ্বাস তার জীবনের অনিষ্টের হেতু। আসলে, অভিশাপ বলে কিছু নেই। মানুষই তার স্রষ্টা। এলোরার গল্প কিংবদন্তী। তবু, এলোরার জীবনে তাই হয়েছিল।

আরো কিছু বলার ইচ্ছা ছিল দিতির। দ্বারদেশে সহসা বিমাতা প্রস্তুতিকে দেখে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। কণ্ঠস্বর নীরব হল। প্রসন্ন মুখখানি হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল। বিব্রত অসহায়ভাব ফুটল তার দুই চোখে। বুকের ভেতর আতঙ্কিত অনুভূতির প্রতিক্রিয়া বুকের দ্রুত স্পন্দনে ওকে দুর্বল করে দিচ্ছিল। প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে উচ্চারণ করল ঃ মা এসেছেন কোন দরকারে। আমি যাই তবে।

প্রস্তুতির চোখে মুখে ত্রস্ত জিজ্ঞাসু অভিব্যক্তি দিতিকে যেন সাবধানের সংকেত করল। কিন্তু সেই মুহূর্তে প্রস্তুতির কণ্ঠস্বর যেন অনেকটা চাপা গর্জনের মত গবগর্ করে উঠল তার গলায়। বলল, আমি সব শুনেছি, সব জেনেছি। বলি, পাপ কখনো গোপন থাকে ? বিশেষত মেয়ে মানুষের। প্রশ্নগুলি সে দিতিকেই করল। আবার বাজখাই গলায় নিজে তার জবাব দিল—না। না !

প্রস্তুতির গোল গোল দুই চোখ খদ্যোতের মত জ্বলছিল। বিমাতার তিরস্কার, ভর্ৎসনা, সন্দেহের আবিল দৃষ্টি এক দুঃসহ অসহায় অবস্থায় ফেলল তাকে। রক্তের মধ্যে প্রোথিত একটা আশংকা এবং উৎকণ্ঠা তাকে বিব্রত করল। মাথাটা ঘুরছিল তার। আকাশ দিগন্ত হঠাৎ তার চোখে অন্ধকার হয়ে এল। শরীর ঝিম্ ঝিম্ করছিল। গলার মধ্যে বমির কট স্বাদ মুখের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছিল। শরীরটা ধরে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ঝাকুনি খেয়ে যেন নড়ে উঠছিল। আর, তখুনি বুকটা খামচে ধরে সে তার কষ্ট দমন করল। তথাপি নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল দিতি। বিমাতার দিকে না তাকিয়েও তার অনুসন্ধিৎসু ·নিবিষ্ট দৃষ্টি প্রতি অঙ্গে সে অনুভব করছিল। গত কয়েকদিন আগে বিমাতা সচেতন অনুভূতি দিয়ে তার সত্তার গভীরে কশ্যপের অস্তিত্বকে আবিষ্কার করল। খেতে খেতে বমির ভাব নিয়ে

দ্রুত পায়ে উঠে গিয়ে সে যখন সব উদগার করে দিল এবং চোখে অন্ধকার দেখছে বলে শুয়ে পড়ল তখন থেকে বিমাতার অভিজ্ঞ চোখে একটা ভ্রূকুটি সন্দেহের মত তাকে কেবলই অনুসরন করত। নারীর গোপন লুকোন লক্ষণগুলো নারীই বোঝে। বিশেষতঃ যে নারী জননী হয়েছে। একথা ভাবতেই তার শরীর আড়ষ্ট এবং শক্ত হয়ে গেল। নিজেকে শক্ত এবং স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল। কষ্ট চাপতে গিয়েও গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। অন্যমনস্কতার মধ্যেও কেমন একটা লজ্জা ওকে নাড়া দিল। নিজেকে তার কেমন অসহায় বোধ হল। মনে হল রক্তে প্রোথিত ভ্রূণ যেন শরীরের গুপ্ত গহ্বরে চন্দ্রকলার মত বড় হচ্ছে। সেই অনুভূতির আতঙ্ক জাগল বুকে। ডাগর সুন্দর দুই চোখে তার কষ্টের ছায়া। সাহায্যের প্রত্যাশায় অসহায় করুণ দৃষ্টিতে পিতার দিকে তাকাল।

পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে ছিল প্রাচেতস। তার দুইচোখ প্রসূতির চোখের উপর স্থির। দিতির করুণ চাহনির চুম্বক আকর্ষণ প্রাচেতসের দৃষ্টি ফেরাতে পারল না। নিজেকে তার অত্যন্ত একা এবং বিপন্ন মনে হল। তবে কি দোষী, অপরাধী সে? একটা কষ্ট বুকের ভেতর মোচড় দিল। গলার স্বর ফুটল না। দুর্বলতায় এবং ভীরুতায় তার দৃষ্টি নত করে দিল। তথাপি, বিমাতার মুখের দিকে তাকিয়ে একবার হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। সহসা এক প্রবল আত্মাভিমানের ঝাপটে তার চোখের কোণ বেয়ে টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল।

প্রসূতির দৃষ্টি খরতর শানিত। দিতির বেদনাবিদ্ধ মুখের করুণ অভিব্যক্তি কিংবা তার অশ্রুসিক্ত আঁখি প্রসূতির অন্তরে করুণা জাগাল না। তার চোখের তারায় জ্বলন্ত অঙ্গার। পাতায় ভ্রূকুটি। দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁটের কোন পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ এবং ঘৃণায় যেন বক্র হয়ে গেল।

প্রাচেতস কন্যার অসহায়তায় কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

প্রসূতির ভর্ৎসিত জিজ্ঞাসার কোন জবাব দিল না দিতি। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধতায় কাটল। শিকারের মত বন্দী হয়ে থাকা ওর নিশ্চল

দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে প্রস্মৃতি তীব্র স্বরে গর্জন করে উঠল। বলল : বলি, নিজের চেহারাটার দিকে তাকিয়ে দেখেছ কখনও? দুদিন বাদে ঢাকার অবস্থাও থাকবে না—তা জান? ঢি-ঢি পড়ে যাবে চারদিকে। তখন কলঙ্ক কালিমালিপ্ত মুখ নিয়ে কালিবঙ্গানে বাস করাই আমাদের দায় হবে। সেদিন কোন মিথ্যে দিয়ে এ পাপ চাপা দেবো।

দিতির মনের সমস্ত অনুভূতি অবশ হয়ে আসে। বিমাতার অঙ্গার চোখের দিকে তাকিয়ে তার অপরাধ বিমর্ষ মনে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব জাগল। প্রস্মৃতির কথা ও ইঙ্গিত অত্যন্ত কুশ্রী লাগল কানে। তবু, নিজেকে সে সংযত রাখল। কিন্তু তার নীরবতায় প্রস্মৃতির ক্রোধ চড়ে গেল। কালক্ষেপ না করে ঝাঁঝালো গলায় বলল : ছিঃ। ঘেন্না, ঘেন্না। এক একজন বেহায়া মেয়েছেলের জন্য সংসার তছনছ হয়। তাদের পাপের বেনো জল ঢুকে সংসারের আর পাঁচটা মেয়েকে নষ্ট করে। তারপর প্রাচেতসের দিকে তাকিয়ে রুক্ষ স্বরে আদেশের সুরে বলল : এ পাপ এখনি বিদায় কর। ও সব অলক্ষণে মেয়েমানুষ আমার ঘরে ঠাঁই পাবে না। তুমি এখনি এর একটা বিহিত কর।

একটা কষ্টবিদ্ধ যন্ত্রণায় চোখ বোজা তার। বন্ধ চোখের কোণ দিয়ে নির্গলিত অশ্রু তার গাল বহে নামে। টপ্‌টপ্‌ করে বুকের উপর পড়ে কাঁচুলি ভিজিয়ে দেয়। কান্না মথিত স্বরে ভেজা গলায় বলে—মা গো, নিষ্ঠুর হয়ো না। বিশ্বাস কর কোন পাপ আমি করিনি। নির্মল, নিষ্পাপ মন নিয়েই এক পৌরুষময় পুরুষকে নিবেদন করেছি আমার হৃদয়-মন-দেহ। সে কে জানিনা! শুধু জানি, আমার হৃদয়-দেবতাকে প্রেমপুষ্প নিবেদন করেছি। আমার প্রেম সত্য। প্রেমের চুম্বক আকর্ষণে আমরা মিলিত হয়েছি।

ঠোঁট উল্টে ভেংচি কেটে প্রস্মৃতি তার কথার প্রতিধ্বনি করল। প্রেম! প্রেম না ছাই। অল্প বয়সের ছেলে মেয়ে প্রেমের কি বোঝে। শরীরকে দেখার কৌতুক কৌতূহলকে প্রেম বলে না।

দিতির আড়ষ্টভাব দূর হয়েছে। এখন তার কণ্ঠস্বরে কোন জড়তা নেই, আচরণও সহজ স্বাভাবিক। বিমাতার ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে সে একটু

অপ্রস্তুত বোধ করল। তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর দিতে কুণ্ঠা হল। দ্বিধা এবং সংশয় কাটাতে কয়েক মুহূর্ত লাগল।

দিতির চিন্তার ও বিচারের একটা নিজস্ব মাপ ছিল। ছোট থেকেই তার মধ্যে একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ছিল। যে বিষয়কে সে অন্যায় বলে বুঝতে শিখেছিল সেটা তার কাছে অন্যায়ই, যে কেউই তা করুক। এ জন্য প্রসূতি কখনও ভাল চোখে দেখেনি তাকে। পিতা প্রচেতসের অন্তরে সেজন্য প্রচ্ছন্ন গর্ব ছিল। পারিবারিক গল্পে কথায় প্রায় হেসে হেসে বলত বেটির যা আত্মবিশ্বাস আর দৃঢ়তা তাতে জগৎপালিকা না হয়ে যাবে না। দিতির চিন্তার মধ্যে হঠাৎ সেই কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হয়ে তার চিত্তকে দুলিয়ে দিল। চুপ করে থাকা তার কঠিন হল। মনের মধ্যে একটা শক্ত প্রতিবাদ খাঁচার বন্দী পশুর মত গর্জন করছিল। মৃদু স্বরে প্রসূতির বক্তব্যকে সমর্থন করে সে বলল: প্রেম কখনও নর-নারীর ব্যক্তিগত শরীর সম্পর্কে সীমাবদ্ধ যে নয় এটা আমার চেয়ে তুমিই বুঝবে বেশি। ভাললাগা চোখের নেশা, আর ভালবাসা একটা সর্বব্যাপী অখণ্ড আনন্দ সত্তার উপলব্ধি। এই উপলব্ধি মানুষের অবিচারে, অত্যাচারে, অপ্রেমে অভিশপ্ত হয়ে ওঠে।

ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত স্বরে প্রসূতি বলল: কোথায় কোন্ কথা মানায়, কার সঙ্গে কি বলা উচিত, সে শিক্ষাই তোমার হয়নি। লঘু-গুরু পর্যন্ত মান না। তোমার স্পর্ধা, ঔদ্ধত্য দেখলে আমার গা জ্বালা করে। নিজের পেটের মেয়ে হলে, দিতাম গলা টিপে।

দিতির চোখ ছলছলিয়ে উঠল। একটা চকিত বিদ্ধ ব্যথায় মনটা তার বিরূপ হয়ে ওঠে। অপমানটা তার মনে গভীরভাবে বাজল। যন্ত্রণামথিত স্বরে উচ্চারণ করল: জন্মমুহূর্তে মাকে হারিয়েছি। জ্ঞান হওয়া থেকে তোমাকে দেখছি। আমার যা কিছু শিক্ষা তা তোমার কাছে পাওয়া। তোমার শিক্ষার ফল সবই। যেমন শিখিয়েছ তেমনি করেছি। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ব্যঙ্গে বিদ্রূপে দিতি তার বক্তব্যকে ক্ষুরধার করল।

প্রসূতি ক্রোধে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হল। শরীরের সর্বশক্তিকে কণ্ঠে সংহত করে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে চিৎকার করে উঠল। প্রাচেতসের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ শুনলে, শুনলে'ত নিজের কানে? দুধ কলা দিয়ে কি কালসাপ পালন করেছি, ছাখ! তুমি বল নিষ্ঠুর হয়ো না। এসব কথা শুনলে কার না রাগ হয়? তোমার এই মেয়ের মত আমার অন্য মেয়েরা মুখরা নয়। মুখে মুখে তারা তর্ক করতে জানে না। সতীনের পেটের দোষে এই বিষফল হয়েছে।

ক্রোধে দপ্ করে উঠল দিতি। দুঃখে ক্ষোভে তার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক রূঢ় হল। বলল ঃ রাগ কর না মা, বিষ তোমার জিভে। মা হয়ে তুমি মেয়ের নামে নির্দ্বিধায় কুৎসা গাও। কুৎসিৎ ইংগিত কর। যা খুশি তাই বল। তাহলে আমি তার জবাব দিতে পারব না কেন? কেন? বলতে বলতে কান্নায় ডুবে গেল দিতির কণ্ঠস্বর। প্রসূতি উত্তেজিত। নাসারন্ধ্র স্ফীত হল ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল ঃ কি জবাব দিবি তুই? জবাব দেবার তোর আছে কি?

দিতির কণ্ঠস্বর যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। বাধা তারের মত ঝংকার বাজল তার গলার স্বরে। বলল ঃ যা করেছি জেনেই করেছি। প্রকৃতির নিয়মে ফুল ফোটে। ফুল তার সমস্ত শোভা উৎসারিত করে মধুকরকে আহ্বান করে; তেমনি নারী করে পুরুষকে, যৌবন করে প্রেমকে। প্রেম প্রাকৃতিক নিয়মে পুরুষও নারীকে কাছে টানে। গণ্ডীতে বাঁধে। জীব-জগৎ রক্ষা পায়। বিশ্ববিধানের সেই নিয়ম পালনের মধ্যে কোন কলঙ্ক কিংবা লজ্জা গ্লানিও থাকে না। থাকতে পারে না। কেউ বললে আমি মানি না। পূর্বপুরুষেরাও চিন্তা করে ছিল যে, নারী গর্ভে সন্তান ধারণ করে পরিবার, সমাজ গড়ে তোলে, সৃষ্টি রক্ষা করে, মানবসভ্যতাকে চিরন্তনী ধারায় অব্যাহত রাখে। তাই সমাজে নারীকে তারা পুরুষের চেয়ে বড় করেছে। মায়ের পরিচয়েই সন্তানের পরিচয়। মানবীয় দায়িত্বের এই অংশীদারীত্ব নারীকে কখনও ছোট করে না, হেয় করে না। সিন্ধু জনপদে নারী আজীবন স্বাধীনভাবে থাকে, যে রকম জঙ্গলে মৃগ বিচরণ করে স্বাধীনভাবে। একথা জেনেও

তুমি মাতৃত্বের উপর গুরুতর শাস্তি চাপিয়ে দিতে চাইছ। কেন ? কার জন্যে ? কার স্বার্থে ?

দিতির উত্তেজিত স্বরে অকপট স্বীকারোক্তি শপথের মত শোনাল। তার উত্তোলিত মুখ প্রসূতির মুখের উপর স্থির। কান্নার আবেগ সামলাতে সে প্রসূতির বুকের উপর মাথা রাখল।

দিতির জবাব শুনে প্রসূতি অবাক হল। তার স্বীকারোক্তিতে কোন কিছুই অস্পষ্ট ছিল না। মুগ্ধতার সঙ্গে তার অবচেতন মনে তাই একটা গর্বও জাগল। নিজের অপ্রস্তুত আকস্মিক আনন্দের ভাষা বোঝাতে দিতির শরীর চেপে ধরল বুকে। অশ্রু মাথামাখি মুখ হাত দিয়ে মুছিয়ে দিল। আলতো হাতে চুলের মধ্যে বিলি কেটে দিল।

গোধূলির আকাশে কোথাও আলো ছিল না। অন্ধকারে ডুবে গেল জগৎ। নির্বাক সন্ধ্যার কালো অন্ধকারের সঘন নিঃশ্বাসের মত মৃদু সমীরণের আর্তস্বর বাজল অন্ধকারের বকে। গাছের ঝোপে ঝাড়ে পাখীর ডানা ঝাপ্টানোর শব্দও ছিল না আর। সব জিজ্ঞাসা, কৌতূহল মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। কেবল ঝিঁঝিরা নিরলস প্রার্থনায় ডেকে চলল। বাতাস স্তব্ধ। মস্তিষ্কের অন্ধকারের সীমানায় এক বিস্মিত জিজ্ঞাসা ঝিলিক দিল দিতির। পাতায় সড়্ সড়্ শব্দ বাজল। বেজে উঠে থমকে গেল। দিতির জিজ্ঞাসাও থমকাল। প্রশ্ন জাগল : জীবন কি অন্ধকারে হারিয়ে যায় ? অন্ধকারের গর্ভে কি আলোর জন্ম ?

প্রসূতির শরীর জড়িয়ে থাকতে থাকতে তৃপ্তি ও সুখ অনুভব করল। মনে তার পূর্বের অস্বাভাবিক আক্ষেপ ছিল না। প্রসন্ন প্রশান্ত মনে একটা নামহীন ইন্দ্রিয় টিপটিপ করে জ্বলছিল। সেই আলোর বিন্দুতে ওর অনুভূতি নিজের কাছে সাড়া দিল। মন্ত্রাচ্ছন্নের মত বলল : অন্ধকারে আমরা হারিয়ে যাই বলে আলোর জন্য রাত্রির নীরব প্রার্থনাকে উপলব্ধি করতে পারি না। সত্যকে চিনতে, বুঝতে উপলব্ধির দরকার। অন্ধকারে বসে তাকে অনুভব করা যায়। তাই যোগীরা চক্ষু বুজে ধ্যান করে, আর ভোগীরা চক্ষু উন্মুক্ত করে আলোর

সুধা পান করে। আলো দেয় বিস্তৃতি আর অন্ধকার দেয় উপলব্ধি। আজ এই অন্ধকারের ভেতর;আমাদের সেই অনুভূতি হল। অন্ধকার থেকে আমরা আলোয় এসে দাঁড়ালাম।

দিতির সরল নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে প্রসূতির শক্ত স্নায়ুতে একটু শৈথিল্য ভাব জাগল, মনেতে স্বস্তি বোধ করল। দিতির শরীরী স্পর্শতার অনুভূতিকে রাঙিয়ে দিল। আবেগান্বিত হয়ে সে তার গালে গাল ছোঁয়াল। চুমু দিল। সেই ঘন স্পর্শের স্বাদ সমস্ত অনুভূতি দিয়ে গ্রহণ করল দিতি। রোমাঞ্চের পুলক লাগল দেহে। স্খলিত নিচু স্বরে বলল—সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা, ক্ষোভ-বিদ্বেষ বিচ্ছেদ-মিলন জীবনের বেগেই খেলা করে। প্রতিমুহূর্ত বাঁচার কথা ভেবেই-জীবন তার খেলা-ঘরের খেলা সাজায়। কোনটা সত্য, আর কোনটা মিথ্যা—জীবন কিছুই বলে না। শুধু চিনে নেবার জন্যে সে বিচিত্র খেলার আয়োজন করে—তাই না মা!

প্রসূতির চোখে মুগ্ধতা। খুশির অনুভূতি তার মন ছুঁয়ে থাকল। দৃষ্টির পলকে একবার দিতিকে দেখে নিয়ে সে চোখ ফেরাল। অপ্রস্তুতের মত হাসল। জীবন সত্যকে বুঝতে পারার কৌতুক তার অবাক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে হাসিতে উদ্ভাসিত হল।

প্রাচেতস নির্নিমেষ নয়নে তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। তারা চলে যেতেই সে আত্মসম্বিৎ ফিরে পেল। দিতি ও প্রসূতির কথাবার্তা, উত্তেজিত বাদানুবাদের মধ্যে সে ছিল নির্লিপ্ত, নির্বিকার, উদাসীন এবং অন্যমনস্ক। অন্য এক ভাবনায় সে ছিল নিমজ্জিত। আয়ত চোখের কালো তারা স্থির বিদ্ধ হয়েছিল প্রসূতির চোখের উপর। কিন্তু তার সমস্ত অনুভূতি এবং চেতনা একটি বিন্দুতে কেন্দ্রিত হয়ে অন্য চিন্তায় মগ্ন রেখেছিল।

মহারাজ দিবদাস মৃত্যুর আগেই কালিবঙ্গানের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করেছিলেন তাকে। এমন কি মহাধূমধামে তার অভিষেক অনুষ্ঠানও করেছিলেন। পুত্র ইলোর ছিল বদ্‌মেজাজী, নিষ্ঠুর প্রকৃতির এক উচ্ছৃংখল যুবক। সুরা ও নারীতে সে অধিক আসক্ত। তাই

প্রশাসকের দায়িত্ব তাকে অর্পণ করতে কুণ্ঠা ছিল তাঁর। কালিবঙ্গানের সিংহাসন কোন রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। সিংহাসন দেশের জনগণের। উত্তরাধিকার সূত্রে বংশ-পরম্পরায় পুরুষানুক্রমে সিংহাসনের অধিকার ভোগের নিয়ম নেই সিন্ধু বিধৌত রাজ্যগুলিতে। প্রজানুরঞ্জন প্রশাসন ক্ষমতা যাঁর থাকে তাঁকেই দেয়া হয় শাসন ভার ;—তা তিনি যে কুলেই জন্মগ্রহণ করুন। শ্রেষ্ঠ এবং যোগ্য ব্যক্তি আজীবন রাজপদে থাকেন। রাজার পুত্রের অগ্রাধিকার থাকে সিংহাসনে, যদি জনগণের কাংখিত হন। সর্বক্ষেত্রে মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচন এবং অভিষেক, সম্পন্ন করে যান। সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠী এবং ভূ-স্বামীদের মধ্যে থেকেই রাজা নির্বাচিত হয়। প্রাচেতস-সৎ-ধার্মিক, আদর্শবান, বুদ্ধিমান, মহৎ-বাক্তিত্ব সম্পন্ন একজন পুরুষ বলেই দিবদাস তাঁর হাতে নিঃসংকোচে রাজ্য ভার দিলেন। পুত্রস্নেহে দুর্বল হল না তাঁর হৃদয়। উত্তরাধিকার নির্বাচনে একবারও দ্বিধা জাগল না অন্তরে।

দিবদাসের মহানুভবতায় বিস্মিত হয়ে রাজপুরোহিত বৃক বলল—মহারাজ আপনি যথার্থ-ই মহান। কিন্তু আপনার বিভ্রান্তি দেখে আমি বিচলিত বোধ করছি। পিতা হয়ে পুত্রকে বঞ্চিত করা অত্যন্ত গর্হিত কার্য।

এক অদ্ভুত বিচিত্র হাসিতে বর্তুল হল দিবদাসের মুখ। বলল—জনগণের বিশ্বাস ভঙ্গ করা ততোধিক গর্হিত কর্ম মাননীয় রাজপুরোহিত বৃক। ইলোরকে আপনি স্নেহ করেন। কিন্তু সে অত্যন্ত উচ্ছৃংখল, নিষ্ঠুর। স্বভাবও তার ভাল নয়। সুরা-নারীতে সে অত্যন্ত আসক্ত। দেশের মানুষের প্রতি তার মনোযোগ নেই। তাদের প্রতি তার আচরণ রূঢ়, উদ্ধত, অমানবিক। এ রাজ্যের মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে সে। আমার পুত্র বলে তারা কিছু বলে না। নীরবে, হাসিমুখে তার সব জুলুম, অত্যাচার মেনে নেয়। কিন্তু তাদের মনের গোপন প্রতিক্রিয়া আমার অবিদিত নয়। চরের মুখে শুনেছি, কালিবঙ্গানের মানুষ ইলোরকে ঘৃণা করে। একজন'ত তার কুত্তার নাম দিয়েছে ইলোর। প্রজাদের আতংক। তরুণীদের বিভীষিকা।

তার লালসা থেকে নিষ্কৃতিলাভের জন্য যুবতীরা লিঙ্গরাজের মন্দিরে তার মৃত্যু ধ্বংস কামনা করে। এসব জেনে শুনেও যদি আমি চুপ করে থাকি, বিধাতা আমাকে ক্ষমা করবেন না। কালিবঙ্গানের মানুষের যে শ্রদ্ধা আমি পেয়েছি, তাও হারাতে হবে। আমাকে রাজার কর্তব্য করতে দিন।

মহারাজ, তবু বলি, আপনার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করুন। ইলোর ছেলেমানুষ।

রাজপুরোহিত বৃক, কালিবঙ্গানের কোন প্রজার সন্তান যদি ইলোরের অনুরূপ আচরণ করত, তা-হলে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হত তাকে। কিন্তু সে আমার পুত্র বলে, সেই শাস্তি ভোগ করতে হল না, পিতা হয়ে এই শৈথিল্যটুকু দেখানোই যথেষ্ট। এর অধিক কিছু করলে আমি বিবেকের কাছে, ধর্মের কাছে চির অপরাধী হয়ে থাকব। সংকল্পচ্যুত হয়ে কোন কাজ আমি করব না।

কিন্তু আপনি পিতা।

আমাকে দুর্বল করবেন না রাজপুরোহিত।

মহারাজ কালিবঙ্গানের সিংহাসন আপনাদের দাস-পরিবার পুরুষানুক্রমে কয়েক পুরুষ ভোগ দখল করে আসছে। এ দেশের মানুষ ভেবে নিয়েছে, আপনার অবর্তমানে সিংহাসনের উত্তরাধিকার হবে আপনার পুত্র ইলোর।

হ্যাঁ তাদের সেই ধারণার অবসান করব বলে এই আয়োজন। বিলম্ব না করে প্রাচেতসের অভিষেকের আয়োজন করুন। মনে রাখবেন দিবদাস কারো প্ররোচনায় মহৎ সিদ্ধান্ত বদলায় না।

পিতা!

প্রচেতস চমকে উঠল তার স্বপ্নের মধ্যে। আচ্ছন্ন গলায় উচ্চারণ করল ঃ এঁ্যা!—তারপর চারদিক তাকিয়ে খুঁজল দিতিকে। কিন্তু কোথাও দেখতে পেল না তাকে। ভীষণ অবাক লাগল। দিতির গলা অনুকরণ করে অস্ফুট স্বরে তা হলে তাকে ডাকল কে? কে? পিতার মনের ব্যাকুল উৎকণ্ঠা, আশঙ্কা থেকেই কি এই রব তার কানে

বাজল ? অবচেতন মন দিতির গলার স্বর কেন অনুকরণ করল ? নিজের মনের এই নির্বাক জিজ্ঞাসায় প্রাচেতস অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ইলোরের ভাবনা তাকে যে কখন আচ্ছন্ন করল, জানতে পেল না সে।

অভিষেকের দিনে ইলোর কালিবঙ্গানে ছিল না। তার অনুপস্থিতি সকলের চোখে পড়েছিল। নানা মহল থেকে নানা রকম সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। প্রাচেতসের মনও সে সন্দেহ থেকে মুক্ত ছিল না। অভিষেকের দিন থেকেই ইলোর তার চির শত্রু হয়ে রইল।

কিছুকাল যেতেই ইলোরের বিরোধিতা স্পষ্ট হল। প্রাচেতসকে রাজনৈতিকভাবে জব্দ করা এবং তাকে অপদস্থ করাই ছিল তার মতলব। কিন্তু তার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিল প্রাচেতস। ইলোর কিন্তু তাতে হতাশ হল না। কিংবা রণে ক্ষান্তিও দিল না। কেবল কৌশল বদলাল। সে কৌশল অসাধারণ কিছু ছিল না। কেন না তা একান্ত অসহায় মানুষের কৌশল। তবু, তাতেই সে জয়ী হবে ভেবে গোপনে পিশাচ, কিমিদিন, যাতু প্রভৃতি বৈরীদের সঙ্গে সে হাত মেলাল।

কিংবদন্তী আছে, এলোরার সন্তান থেকেই এইসব জাতির উদ্ভব। এদের পূর্বপুরুষের প্রতিজ্ঞা অহিরা তাদের জননীকে নির্বাসিত করেছে। জীবনে অনেক দুঃখ, কষ্ট, বঞ্চনা সে সয়েছে। এজন্য অহিদের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতাই দায়ী ছিল। তাই তাদের অবিচার অত্যাচারের প্রতিশোধ তারা হিংসা আর বর্বরতা দিয়ে গ্রহণ করার শপথ করেছিল। প্রয়োজনে পুরুষানুক্রমে ধরে চলবে প্রতিহিংসা গ্রহণের পালা।" কালিবঙ্গানের নাগরিকদের নিশ্চিন্তে এবং সুখে শান্তিতে বাস করতে কোনদিন দেয়নি। শুধু কালিবঙ্গান কেন, সমস্ত সিন্ধুদেশ জুড়ে তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করল। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ক্ষিপ্রগতিতে অতর্কিতে হানা দিয়ে তারা নগর, গ্রাম লোকালয় জ্বালিয়ে দিত। আত্মরক্ষায় অপ্রস্তুত মানুষের অসহায় ভয়চকিত বিড়ম্বনা, মৃত্যু বিভীষিকা মুহূর্তে, নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশুর সন্ত্রস্ত আর্তনাদে ক্রন্দনে এক বীভৎস নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হত। ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন, নারী-গাভী হরণ সিন্ধুর গণপতিদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করল। দুধর্ষ, বর্বর পার্বত্য অধিবাসী যাতু,

পিশাচ, কিমিদিন'দের অতর্কিত আক্রমণ ঠেকাতে দিবদাসের পূর্বপুরুষ সম্বরদাসের নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক সম্মেলন হল হরযুপীয়াতে। একুশটি রাজ্যের ছোট বড় নৃপতি মিলে স্থাপন করল রাষ্ট্রসংঘ। স্থির হল তারা যৌথভাবে এই উৎপাত বন্ধ করার জন্য বিশাল রাজ্য সীমানা জুড়ে শাল মহুহায়, বাঁশের এবং কণ্টক জাতীয় উদ্ভিদের নিবিড় বন তৈরী করবে। এবং গভীর পরিখা বিস্তৃত খননের উপর গুরুত্ব অর্পণ করবে। নগরে নিরাপত্তার জন্য নির্দিষ্ট নগরকার নির্মাণের ব্যবস্থাও হল। একদিন তাদের বর্বর আক্রমণ প্রতিরোধের যে ব্যবস্থা পূর্বপুরুষেরা করেছিল, তার স্বার্থ বিপন্ন করে ইলোর নিজের কোন্ স্বার্থরক্ষা করবে, ভেবে পেল না প্রাচেতস ?

ইলোরের পরামর্শদাতা রাজ-পুরোহিত বৃক। চরের মুখে সব খবর জেনেও প্রাচেতস ইলোরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি। তার গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে সে ষড়যন্ত্রকে তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল। ইলোর বন্দী হলে বৃককে চেনা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। ইলোরের যোগসূত্রগুলি কি এবং কোথায় তার সঠিক তথ্য অনুসন্ধানে বাধা পড়বে। সেজন্য তার চলাফেরার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ রাখল না। রাজনৈতিকভাবে শক্তিহীন করার জন্যে কয়েক শত সন্দিগ্ধ চোখ তাকে অনুসরণ করতে লাগল। ইলোর যে তার শত্রু এবং তার চলাফেরা যে প্রাচেতস সন্দেহের চোখে দেখে এই বিষয়টা তার গোচরীভূত রেখেই প্রাচেতস তার স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টি করল। এর ফলে এক রাজনৈতিক আতংক জাগল তার মনে। ইলোরকে বিচ্ছিন্ন এবং রাজনৈতিকভাবে নিঃসঙ্গ করতে প্রাচেতস ওঝাদেরও কাজে লাগাল। সাধারণ মানুষ থেকে সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত ব্যক্তি সকলেই ওঝাদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ এবং যাদু শক্তির উপর আস্থাশীল। অর্থের লোভে ওঝারা প্রচার করল যে এক অপ্রাকৃতিক শক্তি ইলোরকে ভর করেছে, তাই সে এত দুর্বৃত্ত এবং দুরাত্মা। দিবদাসের মত মহাত্মাও পারেনি তার আচরণ সংশোধন করতে। আসলে, একটা শয়তান বাস করছে তার বুকের ভেতর। সে একটা ডাইন। তার নিঃশ্বাসে মানুষ শুকিয়ে দড়ি হয়ে

যায়। সংস্পর্শে মানুষ ভাগ্যহীন হয়। দেশ ধ্বংস হয়। বন্যা, মহামারী দুর্ভিক্ষ হয়। এই সব প্রচারে আদিম নরখাদক পার্বত্য অধিবাসী, যাতু কিমিদিন পিশাচেরা পর্যন্ত ভয় পেল। তারাও ইলোরকে এড়িয়ে চলল।

ব্যর্থ ইলোর দমল না তাতে। হতাশও হল না। ইলোরের প্রতিহিংসার আগুন কশ্যপ দিতির মেলামেশার ইন্ধন পেয়ে পুনরায় জ্বলে উঠল। প্রাচেতস বিরোধিতার মোক্ষম তীর পেল সে হাতে। প্রাচেতসের বাৎসল্যের দুর্গে আক্রমণ হানার জন্যে এলোরার গল্প চাঙ্গা করে তুলল। দিতির নির্বাসনের দাবি সোচ্চার হল নগরে গ্রামে। প্রিয়তম কন্যা দিতি নির্বাসিত হলে প্রাচেতস মনের দিক দিয়ে যে ভীষণ ভেঙে পড়বে এই সত্য জেনেই ইলোর অগ্রসর হয়েছে। সে যে অত্যন্ত ধূর্ত্ত, কৌশলী এবং সাবধানী তাতে সন্দেহ নেই। তবু, তার বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত দিতির জনপ্রিয়তা খর্ব করতে পারবে না। কিন্তু এরকম চিন্তার কোন ভিত্তি ছিল না। তাই থমকে গেল তার ভাবনা। কালিবঙ্গানের মানুষ সত্যিই ইলোরের দ্বারা বিভ্রান্ত। যে কোন সময় তারা দিতির নির্বাসন প্রার্থনা করতে পারে। সে কথা ভেবে উৎকণ্ঠিত হল প্রাচেতস। দু'চোখের মনিতে তার উদ্বেগ ফুটল, মুখেতে শংকা ছায়াপাত করল। ক্ষিপ্ত, অবুঝ জনগণকে কি বলে ফেরাবে সে? কেমন করে বোঝাবে তাদের যে, এ ইলোরের চক্রান্ত? এলোরার কিংবদন্তীর বিশ্বাস, তাদের মন থেকে কোন্ যাদুমন্ত্র দিয়ে সে মুছবে?

হঠাৎ বাইরে কোলাহল শুনে চমকে উঠল প্রাচেতস। অবুঝ জনতা তা হলে সত্যই এল তার দ্বারে? বুকের ভেতর একটা খিল ধরা যন্ত্রণার অব্যক্ত কষ্ট হল প্রাচেতসের। তার শঙ্কিত মুখ কালো হয়ে উঠল। এই প্রথম দিতিকে হারাবার শঙ্কায় তার বুক বিদ্ধ হল। একটা হাহাকার বাজল তার বুকে। অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাতে চোখ পড়ল দিতির উপর। সম্ভবতঃ কোলাহল শুনে সেও উৎকণ্ঠায় বেরিয়ে এসেছিল খোলা বারান্দার ছাদে। পিতার সঙ্গে তার মুখোমুখি দেখা হয়ে যাবে ভাবেনি কখনও। প্রাচেতসের দৃষ্টি স্থির, অপলক।

দিতি অস্বস্তিবোধ করল! চোখ নামিয়ে নিল। একটা অপরাধবোধে বিদ্ধ হল তার মন। অমনি লজ্জায় রাঙা হল তার মুখ। বিন্দু বিন্দু স্বেদ জমল তার মুখের ত্বকে। কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উপরে উঠে গিয়ে সে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

প্রাচেতস ভ্রূকুটি শক্ত মুখ ফিরিয়ে দূরের পল্লীর দিকে তাকিয়ে রইল। ঘন আঁধার কালো অন্ধকারের ফাঁক দিয়ে দূরে রাঙা আলোর আভা দেখা যাচ্ছিল। দলছুট বন্য হিংস্র জন্তু তাড়ানোর জন্যে এরকম-ভাবে মশাল জ্বালিয়ে-হৈ-হুল্লোড় করে অরণ্যবাসীরা। এ হয়ত সেরকম কান ঘটনা ভেবেই প্রাচেতস ধীর পদক্ষেপে আপন শয়নকক্ষে গেল।

॥ চার ॥

কশ্যপ গম্ভীর স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে। তার কপাল কুঞ্চিত। গভীর-ভাবে সে ভাবছিল দিতি সন্তান সম্ভবা। যে সন্তান সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত এবং একান্ত প্রার্থিত। আগামীদিনের উজ্জ্বল স্বপ্ন যাকে ঘিরে চিন্তায় জড়িয়ে থাকে। দিতির মত আরো অনেক নারীর প্রণয়ের প্রয়োজন তার। সে এক নয়; বহু। হাজার হাজার কশ্যপের সৃষ্টি হবে তার থেকে। সে বিশাল। বিরাট আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের মত কোটি কোটি প্রাণের অঙ্কুর রয়েছে তার বীর্যে। উদ্যম-উদ্যোগ, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য সংযুক্ত হলে এক বৃহৎ মানব-সমাজের জনক হতে পারে সে। আর সেই জনসমাজের জনয়িত্রী হল নারী। নারী হল তার শক্তি। নারীর মাতৃসত্তা থেকে উৎপত্তি হবে জনগণের। সন্তানের বংশ পরিচয় তাদের জননীর নামানুসারে হবে। বিভিন্ন ভার্যার সন্তানদের চিহ্নিতকরণের কাজটি তাতে সহজ হবে। এক একটি গোষ্ঠীরূপে তারা এক এক অঞ্চলের অধিপতি হবে। গোষ্ঠীর বিভেদ দ্বন্দ্বের সংঘর্ষে যদি অনিবার্য হয় তা হলে ঐক্য ও সংহতি আনবে কাশ্যপেয় নাম। কাশ্যপেয় একটি গোষ্ঠীর নাম নয়। সমগ্র গোষ্ঠীর নাম। একটি প্রজাতির জনক।

দিতি অনেকক্ষণ কশ্যপের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করেছিল। উৎকণ্ঠায় তার মুখ থমথম করছিল। চোখে তার আতঙ্কের ছায়া।

কশ্যপ নিরুত্তর। তার কোন ভাবান্তর নেই। ঠোঁটে তার হাসির ঝিলিক। একদৃষ্টিতে দিতির দিকেই তাকিয়েছিল সে, কিন্তু তার দৃষ্টি ছিলনা দিতির চোখের উপর। অপলক স্থির দৃষ্টি বিদ্ধ হয়েছিল দূরের সমতল ভূমির সবুজ শ্যামল প্রান্তরের বুকে।

দিতির অনুভূতিসমূহ তখন অতি তীব্র আলো অন্ধকারে নিকষ এবং ঝলকানো যা অনেকটা পাহাড়ের পাদদেশে স্রোতস্বতী নদীর জলরেখার মত মেঘ ও রৌদ্রে পলকে পলকে যার রঙ বদলায়, ছায়ায় বিমর্ষ দেখায়, আবার সূর্যালোকে কলকলিয়ে উঠে। কশ্যপের স্তব্ধতা দিতির অনুভূতিতে অনুরূপ মোহ, মায়া, সংশয়, বিতৃষ্ণা, ক্ষোভ, বিদ্বেষ এবং প্রতিবাদে তোলপাড় করে। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল : তবে কি এই বিশ্বাস নিয়ে ফিরে যাব, মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ।

হাসল কশ্যপ। ভারী সুন্দর মিষ্টি হাসি। মৃদুস্বরে বলল : তোমার কথায় যে কোন উত্তর হয় না তুমিও জান। তাই'ত মনে সংশয়। উত্তর পাওয়ার প্রতীক্ষা। তোমার কথা মেনে নিলে আমাকে থেমে যেতে হয়। প্রাণের মায়ায় আত্মার বন্দীত্ব মেনে নিতে হয়। কিন্তু তা যে কোন পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়, এ সত্য তুমিও বোঝ।

দিতির কণ্ঠে উৎকণ্ঠা। বলল : তোমার নিরাপত্তার জন্য এখানে থাকা দরকার। অজানা দেশে একা একা বেড়ানো নিরাপদ নয়।

এখন আমি সুস্থ সবল। এই নিভৃত পাহাড়চুড়ায় আত্ম-গোপনের আর কোন যুক্তি নেই। এইভাবে বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না। তা ছাড়া আত্মরক্ষার জন্যে তুমি আমাকে প্রচুর অস্ত্র দিয়েছ। তীর, ধনু, ভল্ল, ঢাল কোন কিছুর অভাব নেই। তুমি অকারণ ভয় পাচ্ছ।

না, গো না, এদেশের মানুষকে তুমি ভাল করে জান না।

তাই'ত পাহাড় থেকে সমতলে নেমে যেতে চাইছি। এদেশকে ভাল করে চেনা হয়নি। এখানকার মানুষের সঙ্গে পরিচয় বাকী

এখনও। আমায় তুমি নিবৃত্ত কর না, আমাকে এগোতে হবে। থেমে থাকার জন্যে আমি আসিনি। আমি চাই বিস্তার। বিধাতারও সে উদ্দেশ্য নয়। তাই মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে আমাকে বাঁচিয়েছেন তিনি। তোমার মত জীবনদায়িনী প্রণয়িণী মিলিয়ে দিয়েছে। আমি ধন্য।

কশ্যপ দিতির শরীর জড়িয়ে ধরার জন্য তার দুই হাত প্রসারিত করে দিল। কিন্তু দিতি ঠেলে তাকে, সরে দাঁড়াল। তার দুই চোখে ভ্রূকুটি তীক্ষ্ণ উৎকণ্ঠা। দিতির কালো চোখের তারার উদ্গত অশ্রুর রেখা চিক্ চিক্ করছিল। উদ্বিগ্ন স্বরে বলল : তোমার শরীর, আকৃতি, কেশ, চোখ, মুখ এমনই অসাধারণ যে লোকে কখনও দেখেনি। দেহই তোমার বৈরী। ছলনাময় দেবতা ভ্রমে এদেশের মানুষ তোমাকে বন্দী করবে, হত্যা করবে। প্রাণ থাকতে আমি তা দেখতে পারব না। সইতেও পারব না। বলতে বলতে অবরুদ্ধ কান্নায় দিতির স্বর বন্ধ হয়ে গেল।

অবাক বিভ্রান্ত কশ্যপ দিতির পিঠে হাত রেখে বিহ্বল কণ্ঠে বলল : দিতি তোমাদের মত সুখের নীড়ে মানুষ হইনি আমরা। শক্ত মজবুত ঘর ছিল না আমাদের। ছিল পাতার ছাউনি করা মাথা গোঁজার ঠাঁই। জঙ্গলের হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করে আমাদের বাঁচতে হত বিপদ ভয়কে তুচ্ছ করে। এসব ভেবে মন খারাপ করি না। বরং দুর্জয় সাহস আমাদের বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। তাই, বিপদ আসার আগে টের পাই। তুমি অনুমতি দিয়ে আমাকে নিশ্চিন্তে থাকতে পার।

দিতির ছলছল চোখের তারায় সংশয় আর সন্দেহ অতি তীব্র আর একাগ্র হয়ে উঠেছিল। সেই সংশয়ের মধ্যে একটা মৃত্যুর আতঙ্ক তাকে কাঁটার মত বিঁধছিল। দিতির মুখের কষ্টের ছায়া কশ্যপের বুকে বাজল। তার চোখের দৃষ্টি দেখে কশ্যপের মনে হল, দিতিকে বোঝানোর চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়েছে। তাই, পুনরায় তাকে প্রবোধ দেবার জন্য বলল : আমাকে যদি দেবতা ভেবে ভুল করে তারা, সে'ত মঙ্গল আমার। সেই'ত আমার আত্মরক্ষার বড় অস্ত্র। এদেশের

মানুষের মনে আমিও এই বিশ্বাস সৃষ্টি করে যেতে চাই। দেবতার ক্রোধের কথা চিন্তা করে তারা আমার কোন ক্ষতি করতে সাহস পাবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

দিতি অবাক চোখে তাকিয়ে করুণস্বরে বলল: নিশ্চিন্ত থাকতে পারছি কৈ ?

অস্থির হলে পারবে কি করে? ভেবে দেখ, দেবতা রুষ্ট হবে ভেবেই তোমাদের পূর্বপুরুষেরা শেষমুহূর্তে এলোরাকে মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যহতি দিয়েছিল। তেমনি আমার কোন ক্ষতি তারা করবে না। কখনও না।

এই মুহূর্তে দিতির মনে হল কশ্যপ যেন একটি সরল, নিষ্পাপ শিশু। তার প্রফুল্লিত দুই চোখের তারায় ঝকমকে হাসির আভাস। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল: দ্যৌঃ কে তারা দ্যাখে' নি কেউ। কিন্তু তার অপরূপ শরীর ও আকৃতির যে ছবি তাদের মনে আঁকা রয়েছে তার সঙ্গে বর্ণে বর্ণে মিল তোমার। সেজন্য তোমার দেবত্বকে পরীক্ষা করবে তারা।

কশ্যপ অনায়াস সহজ আনন্দে বলল: করবে! তাতে ভয় পাওয়ার আছে কি ?

মুহূর্তে দিতির সমস্ত ভাবনা থমকে যায়। উৎকণ্ঠিত কষ্ট তার কিশোরী প্রাণে একটা যন্ত্রণায় পাক দিয়ে উঠছিল। কশ্যপের চোখের তারায় এক রহস্যের দ্যুতি দেখতে পেল দিতি। মনটা তার আনন্দে পরিপূর্ণ হল। কিন্তু তার সব কথা বুঝতে পারল না। নিখাদ আবেগে কশ্যপের মন পূর্ণ। সব সময় সব কথা ভেবে বলে না, হিসেব করেও চলে না। ও শুধু চলতে চায়। চলাটাই ওর মন্ত্র। বিড়্ বিড়্ করে সর্বক্ষণ বলে "চরৈবতি, চরৈবতি"। ওর ধারণা চলার বেগে বাধা সরে যায়। চলাটাই মুক্তি, চলাটাই সত্য। কশ্যপের অদ্ভুত স্বভাবের কথা ভাবতে ভাবতে দিতির নিজের প্রাণও দ্যুতিময় হয়ে উঠল। কিন্তু মনের দিগন্তে তার কোন আলো পড়ল না। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে তার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। মনের

কষ্ট চেপে কথা বলার সময় নিঃশ্বাস পড়ল তার। বলল ঃ আমার ভয় ওঝা আর পুরোহিতদের নিয়ে। মানুষের উপর এদের প্রভাব অপরিসীম। তাদের সেই প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব যদি কারো দ্বারা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাকে ক্ষমা করে না তারা। এমনকি সে যদি নিজের পুত্র-জামাতা হয়, তবুও নয়। স্বার্থ, কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব, রক্ষার জন্য এরা প্রতিদ্বন্দ্বীকে কৌশলে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। তাদের চাতুরী বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। এরা প্রত্যেকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। সাধারণ মানুষ তাদের যাদুতে বিভ্রান্ত হয়। তাই ভয় পাই। ওদের সাথে তোমার বিরোধ বাঁধবেই। তোমার চরিত্র, মাধুর্য, ব্যক্তিত্বের চুম্বক আকর্ষণ, অপরূপ দেহ লাবণ্য, হিরণ্ময় কেশ, স্বপ্নালু নীলাঞ্জনে মুগ্ধ মানুষের আনুগত্য ভালবাসা একদিন ওঝা আর পুরোহিতদের স্বার্থ খর্ব করবে। তোমাকে শত্রুর চোখে দেখবে। বিপন্ন স্বার্থরক্ষার জন্য তারা ভয়ংকর হয়ে উঠবে।

কি করে বুঝলে? কশ্যপ অবাক স্বরে জিগ্যেস করল।

দেবতা ভ্রমে মানুষ যখন তোমায় সম্ভ্রম করবে, শ্রদ্ধা করবে, ভক্তি করবে, মান্য করবে – তখন তারা সে সইতে পারবে না। বাঁধবে লড়াই সাচ্চায় ও মিথ্যায়। মানুষের অন্তরে তোমার পরিচয়কে মুছে ফেলার জন্য গণসভা ডাকবে। সেখানে তোমার বিচার হবে। দেবত্ব পরীক্ষার জন্য তারা অগ্নিকুণ্ড জ্বালাবে। তারপর, সর্বভুক অগ্নিতে দেবে তোমায় আহুতি।

এ তোমার অনুমান।

এ সত্য। দেবতা যে হয় তাঁর অলৌকিক শক্তি আছে। তাঁর মৃত্যু নেই। তিনি অবিনশ্বর। এমন কি অগ্নি পর্যন্ত তাকে ধ্বংস করতে পারে না। অলৌকিক শক্তি বলে দেবতা আপনাকে রক্ষা করেন। কিন্তু তুমি মানুষ। দেবতার সেই অদ্ভুত আশ্চর্য শক্তি তোমার কোথায়? দিতির কণ্ঠস্বরে যুগপৎ বিস্ময় ও উৎকণ্ঠা ফুটল।

কশ্যপের অধরে স্মিত হাসির রেখা বঙ্কিম হল। মৃদুস্বরে বলল ঃ যদি বলি আছে!

বিদ্যুত চমকের মত কথাটা ঝলকিয়ে উঠল দিতির অন্তরে। অবাক কৌতূহল প্রকাশ করে বলল ঃ আছে।

এমন বিস্ময়কর কথা দিতি আগে কখনো শোনেনি আর। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক স্বরে বলল ঃ তা'হলে বল ; সত্যের অপলাপ করেছ আমার কাছে।

না। তোমাকে যা বলেছি, তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়। কুহক বিদ্যায় মানুষকে সম্মোহিত করতে আমিও জানি যাদু বলে মানুষকে যা দেখানো যায়, তাই সে দেখে। সম্মোহিত মানুষের নিজের কোন স্বাতন্ত্র কিংবা ইচ্ছা বলে কিছু থাকে না। সে তখন যাদুর বশে আচ্ছন্ন।

কশ্যপের চোখের উপর দিতির সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। মুখে সংশয়ের ছায়া। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে বলল ঃ তোমাকে আমার কেমন অদ্ভুত লাগে। তবু বলি, ওঝা এবং পুরোহিতরা ইন্দ্রজাল সৃষ্টিতে পারদর্শী। ডাকিনী-বিদ্যায় তারা অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। তাদের বিভ্রান্ত করা খুব শক্ত কাজ।

সংঘর্ষকে এড়িয়ে চলা আমার নীতি। কৌশলও বলতে পার। আমার উপর আস্থা রেখে দেখ ঠকবে না। বিপদ-বাধার ভয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা পুরুষের ধর্ম নয়। কর্মেই পুরুষের পরিচয়। নিরাপদ গৃহসুখ নারীর কাম্য। কিন্তু পুরুষ চায় জয়। বিপদ-বাধা-ভয় জয় করার ভেতর যে একটা অদ্ভুত উন্মাদনা আর রোমান্স আছে নীড়াশ্রয়ী নারীরা তার খোঁজ রাখে না বলেই পদে পদে পুরুষের শক্তিকে নিবৃত্ত করে। গণ্ডীতে বাঁধে।

দিতির সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তার প্রাণে একটা ভয় ছিল। কাঁটার মত সেই আতঙ্ক এবং উদ্বেগ সর্বক্ষণ বুকের ভেতরে খচ্‌খচ্‌ করছিল। স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে একটা কষ্ট এবং লজ্জা অনুভব করছিল। আড়ষ্টভাব কিছুতে কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। কথা বলার সময় একটা কষ্টে তার চোখে ছলছলিয়ে উঠল। ধরা গলায় বলল, বেশ তা-হলে তোমায় আর আঁটকাব না। তোমার মন যা চায়

কর। করুণা করে, এই অভাগিনীকে ভুল না। একটু মনে রেখ— এই আমার মিনতি।

চাপা কান্নায় তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হল। তীব্র অভিমানে বুকের ভেতর টনটন করছিল। বুক চাপা কান্না নিয়ে সে কশ্যপের বুকের উপর মাথা রাখল। থেকে থেকে তার সর্বাঙ্গ ফুলে উঠছিল। কথা বলার সময় কয়েক বার মুখ উঁচু করেছিল। বুক ঠেলে কান্না এসে প্রতিবারই তার কণ্ঠরোধ করে দিল। দিতির বিহ্বলতা কশ্যপের বুকে সোহাগ বর্ষণ করছিল। রক্তে তার বাসনার দাহ, বুকে মমতার প্লাবন। দিতির মাথার উপর চিবুক রেখে, তার কেশের মধ্যে আঙুল দিয়ে সে নীরব সোহাগ জানাচ্ছিল। প্রাণের বিগলিত ধারায় একটা আগ্রাসী চুম্বন এঁকে দিল তার ঠোঁটের উপর। এক অর্ধচেতন তৃপ্তি ও সুখের মধ্যে হারিয়ে যেতে যেতে স্খলিত ভেজা স্বরে দিতি বলল: তোমার সন্তান আমার গর্ভে। এ দেশের প্রথানুসারে সে পাবে তার মায়ের পরিচয়। পিতার কি পরিচয় দেব তাকে?

কশ্যপের অনুভূতি চমকে উঠল। গভীর সুখের উষ্ণতায় দপ্ দপ্ করছিল তার রক্ত। আপনা থেকে তার মুখ নেমে এল দিতির দুই স্তনের উপর। মাংসের ঘ্রাণ নিয়ে সুডৌল নরম কোমল মাংসের দলাটা মুখের মধ্যে পুরে আস্তে আস্তে ভিজিয়ে দিচ্ছিল। আর, একটু একটু করে তাকে দুই হাত দিয়ে বুকের মধ্যে চেপে ধরছিল। নিঃশ্বাসের সংঘাতে শব্দ হয়। দিতির চোখ বোজা। কশ্যপের বুকে জোরে ওঠা নামা করে একসঙ্গে অনেক কথা। একটা আশ্চর্য সুখের মধ্যে হারিয়ে যেতে সে গাঢ়স্বরে উচ্চারণ করল: এই মাটির বুকে যে সন্তান আমি নিয়ে এলাম সে পাবে তার পিতৃপরিচয়। কশ্যপের ঔরস জাত সব জাতক জাতিকার পরিচয় হবে কাশ্যপেয়।

কথার মধ্যে দিতি শারীরিক যন্ত্রণার একটা সকরুণ শব্দ করে বলে— উঃ। আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

দূরে ধীবর পাড়া থেকে মোরগের ডাক ভেসে আসে।

॥ পাঁচ ॥

পঞ্চনদের দেশে যার জীবনের যাত্রাপথ মৃত্যু সম্ভাবনা দিয়ে অভিষিক্ত হল, তার শেষ পরিণতি যে কোথায়, কেমন করে যে তার পূর্ণচ্ছেদ টানবে কেউ তা জানে না। স্বয়ং বিধাতাও বলতে পারেন না তাঁর সৃষ্টির পরিণতির কথা। পারলে, সৃষ্টির কাজ ব্যাহত হত। মানুষের যাত্রা থেমে যেত। চলার গতি ফুরিয়ে যেত। কার্যের পরিণতির পরিমাপ গোড়ায় করা যায় না বলেই একটা আশা নিয়ে সে অগ্রসর হয়। তারপর. কাজের নেশা তাকে টেনে নিয়ে চলে। সাফল্যের চূড়োয় না পৌঁছনো পর্যন্ত তার তৃপ্তি নেই। নিরন্তর অতৃপ্তি থেকে পায় সে চলার বেগ। এই চলাটাই সত্য। চলাটাই জীবনধর্ম। বিধাতাও চলেছেন তার সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে নবনবরূপে আত্মপ্রকাশ করতে করতে। সেই চলা ভৈরবী বৈরাগিনী অনন্তপথযাত্রিনী—তার পথের দুই ধারে সৃষ্টি ও ধ্বংস, জন্ম ও মৃত্যু। কারো দিকে দৃষ্টিপাত করার সময় নেই তার।

বিধাতা যাকে স্রষ্টা করে সৃষ্টি করেন তাকে একটু স্বতন্ত্র পৃথক করেই গড়েন। সকলের ভেতর থেকেও সে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। সৃষ্টির জন্য তাকে কখনও বা মধুর আবার কখনও বা নিষ্ঠুর হতে হয়। তার জীবনও সব সময় সুখের হয় না। অশেষ কষ্ট আর বাধা বিপত্তি তার সঙ্গী। সৃষ্টির নেশা তাকে চুম্বকের মত টানে। তাই কারো মনোরঞ্জন করার সময় তার নেই। নিরাসক্ত নির্বিকার হয়ে চলতে হয় তাকে। আবার দুর্বলতাবশতঃ কারো মুখের দিকে তাকিয়ে কালক্ষয় করা তার সাজে না বলেই বিধাতা তার প্রকৃতিকে অন্য ধাতু দিয়ে গড়েছেন। ভোলানাথের মত সে নিষ্ঠুর, নিরাসক্ত, নির্বিকার! চলাই সত্য তার কাছে।

পাহাড় থেকে সমতলভূমিতে নেমে এলে কশ্যপের সেই কথাই বারংবার মনে পড়ল। দিতির মুখখানা বারংবার তার নয়নপথে ভেসে উঠছিল। অদিতিও তার চিন্তা থেকে বাদ ছিল না। প্লাবনের ধাক্কায় কোথায় ভেসে গেল তারা, কি হল তাদের? এসব জানার জন্য মন তার ব্যাকুল হল। অদৃশ্য দেবতার কোন অমোঘ নির্দেশে তার জীবনটা এরকম এলোমেলো বিশৃঙ্খল হল, জানে না কশ্যপ। তবে সে অনুভব করে জীবনে পাওয়াটাই বড় কথা নয়। পেয়ে যেমন অনেকে হারায়, তেমনি হারিয়েও আবার অনেকে অনেক কিছু পায়। যেমন, সে পেল দিতিকে। কিন্তু তাকে পেয়েও ধরে রাখল না। যা পায়নি, পাবে কি না তার জানা নেই, তার আক্ষেপ বুকে নিয়ে সে আবার বিরাগী হল। আসলে, সে লক্ষ্মীছাড়া। কি চায়, নিজেও ভাল করে বোঝে না। তাই বা হয় কি করে? এক বিশাল সাম্রাজ্যের স্বপ্ন তার দুই চোখে। এই বিশাল ভূখণ্ডকে সে তার সন্তানদের বাসভূমি করে যাবে। নির্বোধের প্রলাপ এ নয়, এ তার দৃঢ় অঙ্গীকার। তাই, সমস্ত দেশটা সর্বাগ্রে তার পরিক্রমা করা দরকার। খুব সাবধানেই একা এগোতে হবে তাকে। দিতির পরামর্শমত লোকালয় এড়িয়ে, মানুষের দৃষ্টি আড়াল করে চলতে লাগল। কতদিন কত কাল বেড়াল তার মনে নেই। তবে একটা ঋতু পার হয়ে যেতে দেখেছে।

চলতে চলতে কত যে অদ্ভুত লোক এবং নানা জাতের মানুষ এবং দৃশ্য সে দেখল তার কোন হিসাব নেই। তার মনটাকে রাঙিয়ে দেবার জন্যে, ভেতর থেকে জাগিয়ে তোলার জন্যে বোধ হয় বিধাতা এসব আয়োজন করেছে। মূক ধরিত্রী রমণীর মত অফুরন্ত সৌন্দর্য মেলে ধরে তাকে যেন প্রলুব্ধ করছে। স্মরণ চিহ্ন রেখে দেয়ার আকূতি জানাচ্ছে।

দু'চোখে তার দেখার তৃষ্ণা। যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত সে দেখে। এ দেখার কোন তৃপ্তি নেই, আছে শুধু নেশা। তাই চলায় সে কোন ক্লান্ত অনুভব করল না। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে সে দেখল সপ্তসিন্ধুর জমি, মানুষ, প্রকৃতি, গাছপালা, পশুপাখী, নানা জাতের ও

গোত্রের মানুষ। তাদের পৃথক জীবন, প্রথা, আচার, সমাজ, সংস্কৃতি উন্নতি।

নদীর দুই তীর জুড়ে মানুষের বসতি। দৃষদ্বতী, সরস্বতী, ইরাবতী, চন্দ্রভাগার তটভূমি ছুঁয়ে আছে নগর, গ্রাম। ক্ষেতগুলি শ্যামল সবুজ শস্যে ভরা। বিশাল তৃণভূমির প্রান্তরে গৃহপালিত গবাদি পশুর ভীড়। মাঠে মাঠে চাষীদের উদাস করা গানের সুর। কশ্যপ অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

আনমনে পথ চলছিল সে।

কশ্যপকে লুকিয়ে রাখা বিধাতারও অভিপ্রায় নয়। তাই এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার ধাক্কায় তার সব আড়াল ভেঙে গেল।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে কশ্যপ চলেছিল আনমনে। কোনদিকে তার নজর ছিল না। কণ্ঠে একটা সুর তার গুণগুণ করছিল। অকস্মাৎ একদল উদ্ভিন্ন যৌবনা রমণীর মুখর রসিকতা ও কলহাস্য শুনে থমকে দাঁড়াল। তাড়াতাড়ি তাদের দৃষ্টির অন্তরালে আত্মগোপন করার জন্য একটা ঝোপের পাশে লুকোল। পাতার ফাঁকে চোখ রেখে তাদের দেখতে লাগল।

নানা বয়সের মেয়ে পাহাড়ের ঢাল ধরে চলেছে। কিন্তু রসিকতায় তাদের বয়সের কোন ব্যবধান ছিল না। সম্ভবতঃ তারা ঝর্ণায় স্নান করতে গিয়েছিল। তাদের চলার গতিতে ছন্দ। পায়ে নূপুরের ঝিম্ ঝিম্ শব্দ। কোমর থেকে হাঁটুর উপর পর্যন্ত ঘাঘরার মত পোশাক। উর্ধ্বাঙ্গে কাঁচুলি আঁটা, গলায় বনফুলের মালা, কারো কারো পুঁথি এবং সুদৃশ্য রঙীন পাথরের মালা। কুন্তল আলুলায়িত চুলে ফোঁটা ফোঁটা জল মুখ ও গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে আসছিল। জলে ভেজা শরীরের উপর সূর্যের আলো পড়ে ঝিক্‌মিক্ করছিল। কৃষ্ণবর্ণ ত্বকের উপর বসন এঁটে ধরেছিল। ভিজে কাঁচুলী তাদের সুডৌল স্তনযুগলকে আরো উদ্ধত করে তুলেছিল। নির্নিমেষ নয়নে তাদের যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে রইল কশ্যপ।

হঠাৎ তাদের যাত্রার তালভঙ্গ হল। অগ্রবর্ত্তী দলের একজন বয়স্ক রমণী "যাতু! যাতু! কিমিদিন বলে চিৎকার করে পশ্চাদবর্ত্তীদের

সতর্ক করে দিল। কিন্তু তার ভয়ার্ত আর্ত্তনাদে গোটা দলটা চমকে উঠল। মৃৎপাত্র তাদের হাত থেকে স্খলিত হয়ে ভেঙে চৌচির হল। জল পড়ে পিচ্ছল হল জায়গাটি। যে যেদিকে পারল আত্মরক্ষা করতে ছুটল। কিন্তু চতুর্দিক থেকে নরখাদক এবং সমাজবিরোধী যাতু, কিমিদিন তাদের ঘিরে ধরল। পালানোর পথ বন্ধ হল। হিংস্র রক্তচক্ষু মেলে কিম্ভুত কিমাকার সেইসব মানুষ দৌড়ে এসে তাদের ধরে ফেলল। কিন্তু মেয়েরা খালি হাতে আঁচড়ে কামড়ে লড়াই করল। কতিপয় মেয়ে হঠাৎ রণরঙ্গিণী হয়ে শত্রুদের লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে লাগল। দস্যুরা তাদের বাগে আনার জন্য মাথায় ডাণ্ডা মেরে অজ্ঞান করে ফেলল। পেয়ে বেশ কয়েকজন রমণী মূর্ছা গেল। এর ফাঁকে কিছু রমণী পাহাড়ের গা বেয়ে দ্রুত উপরে উঠতে লাগল। সাহায্যের জন্য যাতু! যাতু! বলে চিৎকার করতে লাগল। তাদের সে চীৎকার বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছে গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্যপ্রান্ত থেকে কোন সাড়া এল না। রমণীদের কাছে এরকম নির্ভয় আক্রমণাত্মক আচরণ প্রত্যাশা করেনি যাতুরা। তাই তাদের প্রতিহত করার জন্যে এবং তাদের ক্ষিপ্ত আস্ফালন বন্ধ করার জন্যে তারা তীর ছুঁড়ল। দেখতে দেখতে রমণীদের কয়েকজন ধরাশায়ী হল। আত্মরক্ষার হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সবাই একসঙ্গে পাহাড়ে উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ল। একটা আতংক সৃষ্টি করে দস্যুরা রমণীদের রজ্জুবদ্ধ করল। লুণ্ঠিত ধনরত্নের মত তাদের রজ্জুবদ্ধ করে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত চানছদড়োর রক্ষীবাহিনীর সাহায্য এসে পৌঁছল না দেখে বাদী এবং পলাতক উভয় রমণীরা অত্যন্ত অসহায় বিপন্নবোধ করল। নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে হাউ হাউ করে কাঁদছিল তারা। আর ব্যাকুলস্বরে দেবতার নাম জপ করছিল।

অসহায় রমণীকুলের দুর্দ্দশা এবং দুর্গতি কশ্যপকে বিচলিত করল। বীরপ্রাণ সহানুভূতিতে আর্দ্র হল। দুরন্ত ক্রোধে মাথার ভেতর রি-রি করছিল। আত্মগোপন করে থাকা তার কঠিন হল। ঘটনার নীরব দর্শক হয়ে থাকার আত্মগ্লানি তাকে নিরন্তর দগ্ধ করতে লাগল। রক্ত

উঠল টগ্‌বগিয়ে। কিন্তু আক্রমণকারীরা সংখ্যায় বহু। প্রত্যেকেই অস্ত্রে সুসজ্জিত। আর সে একা। এমতাবস্থায় আত্মপ্রকাশ করা আদৌ সমীচীন হবে কিনা ভাবছিল। নির্বোধের আস্ফালন এবং বৃথা দর্প শুধু বিপদ অনিবার্য করে তোলে। যত বড় তীরন্দাজ হোক সে; একা তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করা তার সাধ্যাতীত। তা-হলে, সে করবে কি? কি করলে এই রমণীরা রক্ষা পায় তার উপায় চিন্তা করতে লাগল। কিন্তু কোন আলো দেখতে পেল না। দলের সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে তারা লোফালুফি করছিল। তাদের শরীরের কামোদ্দীপক অংশগুলি নানাভাবে নিপীড়ন করে ক্রীড়া করছিল। ব্যাভিচারের এই বীভৎস দৃশ্য কশ্যপকে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত করল। রাগে তার দাঁত কড়মড় করল। চোখ দিয়ে আগুন বেরোতে লাগল। মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হল। উত্তেজনায় সেই দুই হাতে ধনুর্বাণ তুলে নিল। তারপর, কি ভেবে উত্তোলিত ধনু নামিয়ে রাখল। কশ্যপের মনে পড়ল, এরা দস্যু তস্কর; লুণ্ঠনকারী। প্রকৃতিতে এরা খুবই ভীরু এবং কাপুরুষ। পাহাড়ের উপর থেকে এদের উপর অতর্কিতে তীর বৃষ্টি করলে এরা পালিয়ে যাবে। কিন্তু বন্দী রমণীদের ফেলে যাবে না, তাদেরও সঙ্গে নেবে। এদের সঙ্গে অশ্ব আছে। সুন্দরী রমণীদের অশ্বপৃষ্ঠে নিয়েই পালাবে। তীর ছুঁড়ে আতংক সৃষ্টি করে বন্দীদের সে রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু শৃখংলিত রমণীদের দস্যুর কবল থেকে উদ্ধার করবে কেমন করে, ভেবে পায় না! দুর্গম অঞ্চলে পালানোর একমাত্র রাস্তা সরু গিরিপথ। ঐ পথটা আঁটকে দিলে তাদের যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ঐপথ একা বন্ধ করা তার কাছে খুবই দুরূহ। তবু, মস্তিষ্কের মধ্যে চিন্তা যখন ঝিলিক দিল, তখন কিছু না ভেবেই কশ্যপ বুকে হেঁটে পাহাড়ে উঠতে লাগল।

নরখাদক এবং সমাজবিরোধী দস্যু যাতু, কিমিদিন পঞ্চনদের অধিবাসীদের জীবনে অভিশাপ। এদের উপদ্রব দৌরাত্ম্য বন্ধের জন্য সিন্ধু রাষ্ট্রসংঘ বহুকাল ধরে চেষ্টা করেও কিছু করতে সক্ষম হল না। অতর্কিত আক্রমণ, লুটপাট, নারীহরণ যে-কে সেই। সুতরাং এই

বিরাট দলটিকে পর্যুদস্ত করতে পারলে সে পঞ্চনদবাসীর হৃদয় জয় করবে। তারা চিরকৃতজ্ঞ থাকবে তার কাছে। দিতির আশঙ্কা, ভয় দূর হবে। মানুষের সঙ্গে মেলামেশার পথও অবারিত হবে। লক্ষ্যের পথে পৌঁছানোও হবে সহজে। দেবতাভ্রমে যদি সত্যি সমাদর করে তারা, ভক্তির স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়ে পূজা করে, তা হলে সেই ভুলকে মূলধন করেই সে তার যাত্রাপথ সুগম করবে। দিকে দিকে কশ্যপের বংশ ছড়িয়ে দিয়ে এদেশকে তার নিজরাজ্য রাজধানী করবে।

একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিল কশ্যপ। হঠাৎ, একখণ্ড পাথর তার পৃষ্ঠদেশে পড়ল। মাথা উঁচু করে দেখতে পেল একজন আত্ম-গোপনকারী রমণী তার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে আরো একটি ভারী প্রস্তর খণ্ড। রমণীর দুই চোখ প্রতিহিংসায় জ্বলছে। কিন্তু কশ্যপকে দেখে সে কেমন সংকুচিত হল। হাত থেকে তার প্রস্তর খণ্ড স্খলিত হল। অবাক বিস্ময়ে সে কশ্যপের মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। মুগ্ধ চোখে কশ্যপ তার দিকে তাকিয়ে বলল ঃ বালা, আমি বন্ধু তোমার। আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পার। তোমাদের সকলকে বাঁচানোর জন্যেই আমি এসেছি। ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, মজা দেখতে পাবে।

মেয়েটির নাম দনু। নরপতি দক্ষের কন্যা। অবাক চোখে সে কশ্যপের নীলপদ্মের মত বিরল আঁখিযুগলের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। বুকের ভেতর তার এক অনুভূতপূর্ব শিহরণ জাগল। তড়িৎ প্রবাহের মত তার ধমনীতে বইতে লাগল যৌবনের উষ্ণ শোণিত প্রবাহ। সেই চরম দুঃসময়েও ভাললাগার এক অনির্বচনীয় আনন্দে তার মন প্রাণ আচ্ছন্ন করল। নির্ণিমেষ নয়নে সে কশ্যপের গমন পথের দিকে তাকিয়েছিল।

আর্ত্তনাদ করে দুস্কৃতকারীদের একজন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সঙ্গীরা অপ্রত্যাশিত আকস্মিক মৃত্যুতে তারা হকচকিয়ে গেল। ভয় পেল। সংঘবদ্ধ হয়ে পরিকল্পিত আক্রমণ রচনা করার আগেই পাহাড়ের উপর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে তাদের বিদ্ধ করতে

লাগল। অতর্কিত জোরালো আক্রমণে শত্রুরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। মুহূর্তে ছত্রভঙ্গ হল তারা। প্রাণভয়ে তারা পালাতে লাগল।

রমণীরা বিভ্রান্ত বিস্ময়ে হতবাক্ হল। অবাক চোখে অবাকতর করে তারা দেখল অনিন্দ্য সুন্দর দিব্যজ্যোতিসম্পন্ন এক আশ্চর্য সুন্দর পুরুষ পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে একমনে তীরবৃষ্টি করে চলেছে। প্রতিটি তীর তার মৃত্যুবাণ। কিন্তু কোন তীর তাদের কারো দেহ বিদ্ধ করেনি। তার ক্ষিপ্র আক্রমণে দুস্কৃতকারীরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালানোর সুযোগ পর্যন্ত পাচ্ছে না। তবু, কিছু দুঃসাহসী লম্পট যাতু যুবক সুন্দরী রমণীদের অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়ে দ্রুত চম্পট দেয়ার জন্য যখন অশ্বে আরোহণ করতে যাচ্ছিল তখনই এক ঝাঁক তীরে বিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। হঠাৎ, কশ্যপের চোখে পড়ল, কিম্ভূতাকারের দৈত্যর মত একজন লোক সংজ্ঞাহীন একটি সুন্দরী রমণীকে কাঁধে নিয়ে খাঁড়াই পাহাড়ে পিঠ-ঠেকিয়ে খুব সন্তর্পণে ঝরণা পার হচ্ছে। ঝরণা ডিঙিয়ে যেই সে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়েছে অমনি একটি তীর তার পিঠে বিঁধল। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। তীর তার মেরুদণ্ড বিদ্ধ করেছিল বলে উঠতে পারল না। সেখানে পড়ে সে হাত-পা খিঁচতে লাগল।

নিমেষে জায়গাটা রণক্ষেত্রে পরিণত হল। আহত মানুষের যন্ত্রণাকাতর আর্ত্তক্রন্দন আর ভয় চকিত জিজ্ঞাসায় থম থম করতে লাগল। রমণীরা প্রস্তরমূর্ত্তির মত স্তব্ধ। অপলক স্থির নেত্র বিস্ময়ে ভয়ে উৎকণ্ঠায় বিহ্বল। কিন্তু কশ্যপের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। ব্রজ-পাষাণে নির্মিত পৌরুষ কঠিন মূর্ত্তি পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে মেঘমন্ত্র রবে উচ্চারণ করল : শোন দস্যুদল। প্রাণ নিয়ে যদি স্বজনের মধ্যে ফিরে যেতে চাও তা হলে লুকিয়ে থেক না। অস্ত্র সংবরণ করে আত্মপ্রকাশ কর নইলে আমার ভয়ংকর ক্রোধ থেকে তোমাদের কেউ পরিত্রাণ পাবে না। চেয়ে দেখ, কে আমি ?

আত্মগোপনকারী দস্যুরা সবিস্ময়ে দেখল : কশ্যপের দৈর্ঘ্য আকৃতি, গাত্রবর্ণ, কেশ ও আঁখির রঙ মানুষের মত নয়। তাদের ধ্যান-ধারণার দেবতার যে মূর্তি অঙ্কিত এই পুরুষ তারই প্রতিরূপ। তবে কি দেবতা

কুপিত হয়েছেন তাদের প্রতি ? তাই কি নিজে তাদের ধ্বংস করতে উদ্যত ? দেবতার সশরীরে আগমন তাদের কাছে বিস্ময়কর। কশ্যপ যে দেবতা এ সম্পর্কে তাদের মনে কোন সন্দেহ নেই। দেবতার শক্তি ব্যতীত কোন মানুষী শক্তি ও বুদ্ধিতে এরকম অভাবনীয় যুদ্ধ এবং বিপর্যয় সম্ভব হত না। সিন্ধুর মানুষ দীর্ঘকাল ধরে চেষ্টা করেও পারেনি দুঃসাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। কুপিত দেবতার ক্রোধ শান্ত করতে তারা অস্ত্রত্যাগ করে নতজানু হল তার সম্মুখে। তাদের অপ্রত্যাশিত আচরণে কশ্যপ নিজেও কম বিস্মিত নয় !

নারীর আর্ত্ত চিৎকার শুনে সেনানী মণ্ডন দাস খুব শীঘ্রই একটি বাহিনীকে অস্ত্র সুসজ্জিত করে অগ্রসর হল। মণ্ডন দাস যখন পৌঁছল সব শান্ত এবং স্তব্ধ তখন। দস্যুদল অস্ত্রত্যাগ করে নতজানু হয়ে আছে। তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে দনু। বিস্ময়ে হতবাক হল মণ্ডন। কোন্ মন্ত্রবলে দনু বশ করল দস্যুদের ? সে কথা গভীর করে ভাবার অবকাশ ছিল না তখন। তার হাতের ইশারায় শিক্ষিত সৈন্যেরা দস্যুদের পিঠে বর্শা ছোঁয়াল। তারপর, অন্য একদল সৈন্য তাদের হাতে পায়ে শৃংখল পরিয়ে দিল।

দনুর পশ্চাতের একটি ঝোপ থেকে কশ্যপ বেরিয়ে এসে তার নিজস্ব শিঙা বাজিয়ে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করল। কশ্যপের গোলাপ রাঙা তনু, হিরণ্ময় চূড়া বাঁধা কেশ, নীলপদ্মের মত নীল আঁখিযুগল, দীর্ঘদেহ উন্নত নাসিকা বিশাল চেহারা মণ্ডনকে বিভ্রান্ত বিস্ময়ে আচ্ছন্ন করল। আচ্ছন্নতা সম্যক উপলব্ধির দিগন্ত স্পর্শ করতে পারে না। অসংযত চিন্তা-ভাবনা, বিশ্রস্ত এলোমেলো হয়ে মস্তিষ্কের সীমানা স্পর্শ করে মিলিয়ে যায়। চোখের দৃষ্টিতে একটা আতঙ্কভাব ফুটে উঠল। প্রস্তরবৎ আচ্ছন্নতায় কেঁপে উঠল মণ্ডন। তরঙ্গায়িত অনুভূতিতে স্বর্গ-দেবতার ভাবনা। মস্তিষ্কের বদ্ধকুঠুরিতে চিন্তা ঝিলিক দেয়। হৃদয় মথিত হয়। এক অব্যক্ত আবেগ, বিহ্বলতায় তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। বিস্ময় স্খলিত স্বরে অস্ফুট উচ্চারণ করল ঃ সাক্ষাৎ দে-ব-অ-তা-আ ! স্ব-র্গে-র মানুষ।

কথার প্রতিধ্বনি কশ্যপের অনুভূতির মধ্যে ঢেউর মত ছড়িয়ে পড়ে। প্রবল ঢেউএর ঝাপ্টা মস্তিষ্কের কোষে কোষে আঘাত করে হৃদয় দোলায়। প্রত্যাশার ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে যায়। কল্পনার অতীত কিছুর স্বপ্ন দেখে। যা তার প্রাণের মূলে প্রতিমুহূর্ত নিজের দ্বারা সৃষ্টি।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

মণ্ডনের চোখে ত্রস্ত জিজ্ঞাসা। অপরিচিত ব্যক্তিটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সবিস্ময়ে মধুস্বরে বলল: মহাত্মন, আপনি কে? দেবত বলে প্রত্যয় হয়। এখন সত্য পরিচয় দানে কৃতার্থ করুন কিংকরকে।

কশ্যপের বুকে চকিত শিহরণের তরঙ্গ খেলে গেল। স্বপ্নের ঘু চোখের পাতায় নিবিড় হল। পরক্ষণেই একটা আশংকায় বুক দুরদু করল। মনের চাঞ্চল্য এবং উদ্বেগ যাতে মুখে ফুটে না উঠে তারই চেষ্ট করল প্রাণপণ। দেবতা নামের এই ভ্রমটুকুই সে চায়। এটাই তা মূলধন। তাকে নিয়ে ইতিমধ্যেই রহস্য ঘনীভূত হয়েছে পঞ্চনদে দেশে। সেই কথা মনে পড়ায় আপনা থেকে মাথা নড়ে গেল। কো কথা সরলো না মুখে। আয়ত চোখের তারায় প্রসন্ন কৌতুকে ঝিলিক তাকে রহস্যময় করে তুলল। রহস্যগম্ভীর পর্বতের মত তাবে শান্ত, স্তব্ধ, নির্বিকার মনে হল।

মণ্ডনের, অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। আশ্চর্য উজ্জ্বল অথচ দ্বিধাভর চোখে সে তাকিয়েছিল কশ্যপের দিকে। দৃষ্টিতে তার মিনতি। কাঁপা ঠোঁট, ভাঙাগলায় বলল: মহাত্মন্, আমার প্রণাম ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। তারপর বিব্রত স্বরে বলল: স্পর্ধা করে আপনার পরিচয় জিগ্যেস করার জন্য আমি অনুতপ্ত। আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করুন, দেব! দেবলোকের মানুষকে নরলোকে পাওয়ার পুণ্য অর্জন করেছে আমাদের দেশ। আপনার শুভ পদার্পণে পবিত্র হল আমার দেশের মাটি। আজ আমাদের পরম সৌভাগ্যের দিন। হে দেবপুত্র, কৃপা করে অধীনের গৃহে পদার্পণ করে চরিতার্থ করুন আমায়।

কশ্যপ হাসি হাসি চোখে তাকিয়েছিল তার দিকে। কিন্তু মণ্ডনের

কথায় তার মন ছিল না। নিজের মনের জিজ্ঞাসায় অন্যমনস্ক। অনেক দূরের এক স্বপ্নের পৃথিবীতে তখন সে বিচরণ করছিল।

কশ্যপের সাড়া না পেয়ে মণ্ডনদাস বন্দীদের নিয়ে ফিরে গেল। পশ্চাতে পশ্চাতে রমণীদের সেই দলটিও চলল। কিছুদূর গিয়ে থমকে দাঁড়াল দনু। পিছনে তাকিয়ে দেখল অপরিচিত আগন্তুক পরদেশীর অপলক দৃষ্টি তাদের অনুসরণ করছে। পরদেশীর বোবা উৎসুক নীল চোখের দৃষ্টিতে কেমন এক আচ্ছন্নতা তার। দনুর চোখে চোখ পড়তে কশ্যপের হাসি বিস্তৃত হ'ল। হাসিতে তার রহস্যের ঝিলিক। দনুর বুকে ঝড় উঠল। প্রবৃত্তিগত স্বভাবগত আকর্ষণের সঙ্গে সৌন্দর্য-চেতনা কৃতজ্ঞতাবোধ, এবং মুগ্ধ বিহ্বলতা তাকে আবিষ্ট করল।

অনুভূতির মধ্যে অভিব্যক্তিহীন আশ্চর্য আকাংখা আত্মদানের আবেগে থর থর করে কেঁপে উঠল। চোখের পাতায় নেমে এল নিবিড়তা। রক্তের তরল আগুনের স্রোত। প্রাণটা কিসের আকর্ষণে এক পা এক পা করে আগন্তুকের দিকে এগোতে লাগল। দনু যেন ঘুমের ভেতর হাঁটছিল। অনেকটা আচ্ছন্নের মত সে কশ্যপের সামনে এসে দাঁড়াল।

দনুর মুখের কাছে মাথা নামিয়ে এনে গাঢ় স্বরে কশ্যপ জিগ্যেস করল: তুমি যে ফিরে এলে?

বিহ্বল দৃষ্টিতে দনু তাকিয়ে থাকে তার দুই চোখে। স্নিগ্ধ-হাসি তার দুই অধরে। মধুস্বরে মৃদুকণ্ঠে বলল: তোমায় কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে যাই কেমন করে?

কশ্যপের চোখে দুষ্টুমি। ঠোঁটের কোণে টেপা হাসি। বলল: অঃ! আর কিছু না?

দনুর মুখে লজ্জার ঝলক লাগল। আপনা থেকে মাথা নত হল। শূন্য অপলক চোখে বিব্রতভাব। কণ্ঠস্বরে দ্বিধা। বলল: তুমি কে, আমি জানি না, জানতে চাইও না। তোমার বীরত্ব আমায় মুগ্ধ করেছে। তোমায় অভিনন্দিত করার ভাষা আমার নেই। এতগুলো নারীকে তুমি রক্ষা করেছ। তাদের জীবন ও সম্ভ্রম বাঁচিয়েছ!

তুমি'ত বেশ সুন্দর কথা বল। তোমার নাম কি সুন্দরী।

দনু আমার নাম। মহারাজ দক্ষ আমার পিতা।

কশ্যপের উজ্জ্বল নীল চোখে খুশির ঝলক লাগল। চোখেমুখে তার গভীর আগ্রহের ভাব ফুটে উঠল। বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, আচ্ছা! তুমি চানছদড়োর রাজকন্যা!

দনু কয়েক পলক কশ্যপের দিকে তাকিয়ে থেকে সবিস্ময়ে বলল : তুমি কি চেন তাঁকে।

কশ্যপ মণিহীন চোখে চেয়ে আছে দনুর দিকে। কিন্তু কেমন একটা অন্যমনস্কতা সেখানে। দিতির মুখ ভাসে তার চোখের তারায়। এদেশের রাজা পুরোহিত ওঝা এবং অভিজাতদের সম্পর্কে তার সতর্ক ওর সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করল।

কশ্যপের নীরবতায় দনু বিস্মিত হল। আহত অভিমান আর একটা অপমানবোধ তীব্র যন্ত্রণায় তার অনুভূতিতে ক্রিয়াশীল। কষ্ট দমনের জন্যে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল। ভীরু দ্বিধা আর সংকোচে তার কণ্ঠস্বর স্খলিত হল। আস্তে আস্তে বলল : আমি কৃতজ্ঞ। তোমার কাছে ঋণী। আমার দেবার ধন কিছু নেই। সামান্য রমণী আমি। তোমার কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি দেব কি দিয়ে?

কশ্যপ সম্বিৎ লাভ করল। শশব্যস্ত হয়ে বলল : না, না এসব কি বলছ তুমি? কৃতজ্ঞতা লাভের প্রত্যাশায় কার্য করিনি। কর্ত্তব্য করেছি অন্তরের প্রেরণায়। তোমাদের সাহায্য করে আমি বিবেক যন্ত্রণা মুক্ত হয়েছি। এজন্য তোমার কুণ্ঠা শোভা পায় না। অকারণ নিজেকে বিড়ম্বিত করে কষ্ট দেয়ার কোন অর্থ নেই।

এলোমেলো ঝড় ওঠে দনুর বুকে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার বিস্ময়। নির্বাক চাহনিতে কেমন একটা আচ্ছন্নতা। প্রীতির উষ্ণতার স্পর্শে চঞ্চল হল মন। আত্মসমর্পণের আবেগে থর থর করে কাঁপে বুক। তৃপ্তির আবেশে তার দুই চোখ বোজা। দনু কথা বলতে পারল না। নিজেকে প্রকাশ করার ভাষা তার ছিল না। মনের ভাষা মুখর হল তার নীরবতায়। একটা পরম স্পর্শের স্বাদ লাভের জন্য সে উন্মুখ

হয়ে রইল। সারা দেহ মনে তার সুর ভরে গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত কাটল এইভাবে। ধীরে ধীরে চোখ মেলল দনু। বিমুগ্ধ চাহনি মেলে ধরে কশ্যপের অনুসন্ধিৎসু দুই চোখের তারায়। বাতাসের স্বরে বলল : পাখি গান গায় নিজের আনন্দে, কারো ভাল লাগে কিনা সে খোঁজ পাখি রাখে না। তোমার সান্নিধ্যে আমিও তেমন আনন্দ পেয়েছি। মন আমার তোমাতে আসক্ত হয়েছে আমার এই রত্নহার তোমায় নিবেদন করলাম। গ্রহণ করে কৃতার্থ কর আমায়।

কশ্যপ মাথা নীচু করে দনুর হার পরল গলায়। তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আরো গাঢ় স্বরে বলল : আমিও তোমার বশীভূত সুন্দরী

এক ঝলক বাতাস এসে লাগল কশ্যপের মুখে। বিস্রস্ত লম্বা লম্বা কেশে ঢেকে গেল তার মুখখানি। চুলগুলো যেন নিজের খুশিতে নিজের আনন্দে মেতে তার চোখ-মুখ-নাক-কান সব জড়িয়ে ধরল। দনুর মুখেও লাগল তার ছোঁয়া। শিহরণ লাগল তনুতে। কমনীয়তায় ভরে উঠল মুখ। প্রেমময়ী চিরন্তনী নারী জেগে উঠল তার সত্তায়। হাসি হাসি মুখ করে কশ্যপের মুখের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিল দনু। ভাষাহীনতার এই স্তব্ধ অনুভূতি মনটাকে অকারণ খুশিতে ভরিয়ে রাখল।

কশ্যপের মনেও তার মধুর স্পর্শ লাগল। খুশির আভা তার মুখে। স্তব্ধ দৃষ্টি মেলে দেখছিল দনুকে। পড়ন্ত সূর্যের সোনার রঙ এর প্রতিবিম্ব পড়েছে দনুর মুখে। স্বর্ণ গোধূলির আভায় শ্যামবর্ণ মেয়েটির মুখশ্রী সবুজ কমমীয়তায় ভরে উঠেছে। নীরব বনভূমির মত ভাষাহীন সুর জাগল কশ্যপের বুকে।

সূর্যের আলো পড়েছে হ্রদের জলে। ওর গহন অতল বুকে নীল স্বপ্নপুরীর রাজ্য। তার অধরা সৌন্দর্যের মায়ায় বন্দী মন প্রজাপতির মত ডানা মেলে উধাও হয়ে যায় রূপময়ী অসীম বিশ্বের সৌন্দর্য আকাশে।

কশ্যপের ঠোঁটের সজীব উত্তপ্ত স্পর্শ পেয়ে অনভিজ্ঞতায় চমকে উঠল দনু। সারা দেহে তার বিদ্যুত তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল। দুরন্ত

উত্তাপ রক্তের মধ্যে দপদপিয়ে উঠল। কশ্যপের ভ্রূক্ষেপ নেই। কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে বলল : দস্যুরা কিন্তু আমাদের উপকার করেছে। তোমার আমার প্রেমের সেতুবন্ধ তাদের জন্যেই হল।

দনু একপলকের জন্য কশ্যপের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল।

দনুর আকর্ষণে কশ্যপ এল চানহুদড়ো। পঞ্চনদের প্রধান স্রোতধারার বাঁদিকে সবুজ গাছগাছালিতে ঢাকা পর্বতমালা, পাহাড় থেকে আছড়ে পড়া ঝরণা, আর দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে আন্দোলিত যব ও গমের ক্ষেতে সুশোভিত অঞ্চল প্রকৃতির লীলাভূমি। চানহুদড়ো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বকর্মার হাতে তৈরী তৃতীয় ভুবন। কালিবঙ্গানের চেয়েও এর শোভা এবং সমৃদ্ধি চতুর্গুণ বেশি।

চানহুদড়োর মানুষের সবচেয়ে বেশি গর্ব, পাথরের দেয়ালে ও পাইন গাছের বনাঞ্চলে আবৃত সুউচ্চ গিরিচূড়া সমন্বিত বৃহৎ রাজপ্রাসাদ আর নিজেদের মনোরম বাসগৃহ। সব বাসগৃহই পাকা অথবা কাঠের কারুকার্য খচিত গৃহ।

রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারের সামনে থমকে দাঁড়াল কশ্যপ। দুই চোখে তার বিস্ময়! বড় বড় চোখ অপলক, স্থির। জীবনে এত বিস্মিত হয়নি সে কখনও। রাজা, রাজপরিবার রাজপ্রাসাদের কথা সে আগে শোনেনি কখনও। পঞ্চনদের মাটিতে পা দিয়ে সে শুনল প্রথম। কিন্তু রাজপ্রাসাদ তার দেখা হয়নি। কেবল তার একটা কল্পনা ছিল মনে। কিন্তু সে ধারণাও খুব পরিচ্ছন্ন ছিল না। সিংহদুয়ারে দাঁড়িয়ে স্বপ্নের সেই প্রাসাদ দেখার সৌভাগ্য হল তার। প্রথম দেখার বিস্ময় ও চমৎকারিত্বে অভিভূত হল। মানুষ যে এত বিশাল শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে তার কল্পনায় আসে না। জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতার চমক লাগল তার দুই চোখে। বিশ্বাসই হয় না, এটা কোন

মানুষের সৃষ্টি। এই বিশাল বাড়ী বানানোর বুদ্ধি তাকে কে দিল? এ শক্তি, সাহস মনোবল সে পেল কোথা হতে? কি অদ্ভুত উপায়ে এক, দুই, তিন করে উপরে উঠল! একটার পর একটা তলা সাজানোর কৌশল কেমন করে শিখল? একি নিজের বুদ্ধিতে সম্ভব হয়েছে তার? এইসব অসংখ্য প্রশ্ন তার বুকে। মানুষ তা-হলে আকাশ ছোঁয়ার স্পর্ধা রাখে। প্রাসাদের সুউচ্চ চূড়ায় একটা বিশাল পতাকা পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। সেই দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পতাকার মধ্যস্থলে বলীবর্দ্দের চিত্রটির উপর তার দাদুর মুখখানি ভেসে উঠল।

ছোটবেলায় দাদুর মুখে গল্প শুনেছিল যে, পূর্বদেশীয় দানবের ক্ষমতা অসীম। চোখের নিমেষে তারা অদ্ভুত অদ্ভুত ঘর-বাড়ী তৈরী করে। দেবতারা পযন্ত তাদের কর্মকুশলতায় অবাক হয়। দৈত্যদের তারা ঈর্ষা করে । আকাশটাকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার জন্যে দৈত্যেরা ধরিত্রীর বুকে পাথরের উপর পাথর চাপিয়ে তাতে সিঁড়ি লাগিয়ে ক্রমাগত উপর দিকে উঠতে লাগল। তাই দেখে, দেবতারা গেল ভয় পেয়ে। তাদের হাত থেকে নীল আকাশ নিজেকে বাঁচানোর জন্য আরো উপরে উঠল। তখন দৈত্যরা সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠে গেল। তবু নীল আকাশ তাদের নাগালের বাইরে রইল। দেবতাদের সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্য আকাশ নিজেকে শুধুই দূরে সরিয়ে নিল।

ঠাকুর্দ্দার কল্পিত কাহিনীর একটা সূত্র সে খুঁজে পেল। এদেরই হয়ত ঠাকুর্দ্দা পূর্বদেশীয় দানব বলেছে। কিন্তু এরা দানব হল কেন? দানব কাকে বলে? প্রভূত বুদ্ধি আর কৌশলে যারা অপরাজেয় শক্তি ক্ষমতা করায়ত্ত করল, অক্ষম অপদার্থ ব্যক্তিরা তাদের কৃতিত্বকে হেয় করার জন্যেই বোধ হয় দানব শব্দ ব্যবহার করল।

ঠাকুর্দ্দার বলা আরো একটি গল্প তার মনে পড়ল। বন্য বরাহের একটি দল রাত্রিতে ক্ষেতের মাটি খুঁড়ে নষ্ট করে দিয়েছিল। কশ্যপের পিতা সেই জমির উপর তখন পুনরায় বীজ ছড়িয়ে দিল। খুব অল্প-

দিনেই তেজী স্বাস্থ্যবান গাছ জন্মাল। পূর্বের থেকে তার সংখ্যা হল বেশি। দেখতে দেখতে গাছগুলি ছাপিয়ে উঠল। ফললও ভাল। কশ্যপের পিতা প্রজাপতির ধারণা হল, মাটি খোঁড়ার জন্যই এই উদ্বৃত্ত ফসল তারা পেয়েছে। পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর জন্য বরাহের খোঁড়া একখণ্ড জমিতে এবং তার পাশের আর একখণ্ড শক্ত সমান মাটিতে প্রজাপতি বীজ বুনল। খোঁড়া জমির চারা গাছের মত পাশের সমান শক্ত জমির চারাগুলো কিন্তু সবল, তেজী হল না। ফসলও খোঁড়া জমির মত হল না। প্রজাপতি স্থির করল, এবার থেকে মাটি খুঁড়ে বীজ বুনবে। ঠাকুর্দ্দাকে সে কথা জানাতেই পাঁচকথা শুনিয়ে দিলেন প্রজাপতিকে। বলল ঃ ছিঃ ছিঃ মাটি হল মা। সেই মা'র বুকে পরশু বসাবি? এত নরাধম তুই। তোর সঙ্গে পূর্বদেশের দানবদের পার্থক্য রইল কোথায়? তারা দস্যুর মত ধরিত্রীর বুক দোহন করছে। মায়ের বুক চিরে রক্ত বার করে খাচ্ছে! নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর। ধরিত্রীর কীট নরাধমেরা খেতে পাচ্ছে না। পাপী। পাপী তারা। মাটির বুক চিরে ধরিত্রীর দেহের মাংস টুকরো টুকরো করে ওরা বীজ বোনে। তুই না আর্য! আর্যদের মাটির বুকে আঁচর কাটা পাপ। মাটি কাটা মাতৃহন্তার সামিল। ভগবানের তৈরী ধরিত্রীর বুক ফেড়ে তার মাংস টুকরো টুকরো করার অধিকার কোন আর্যের নেই। এক দানবরাই এই অপকর্ম, অধর্ম করে। দানব বলেই এরা রীতি নীতি মানে না। তারা দস্যু। তারা লুঠেরা। ধরিত্রীকে নির্যাতন করে তার অস্থি-মজ্জা মেদ নিঙড়ে তারা ভোগের ক্ষেত্র বাড়িয়ে তুলছে। এই সব নরাধমদের নাম উচ্চারণও পাপ। আমাদের দেশে তাদের পাপ আমি কিছুতে ঢুকতে দেব না। না—।

প্রজাপতি অসহিষ্ণু হয়ে পিতার মুখের উপর প্রশ্ন করল—একে তুমি পাপ বলছ কেন? বরাহ ও ধরিত্রীর বুক চিরে তার খাদ্য বার করে খাচ্ছে। তাতে কি পাপ হয় তার?

নাস্তিকের মত কথা বল না পুত্র। তুমি নির্বোধ, তাই মুখে মুখে তর্ক কর। মায়ের বুকে সন্তান মুখ গুঁজে তার স্তন পান করে তেমনি

বরাহও ধরিত্রীর বুকে মুখ গুঁজে স্তন পান করছে। এটা তার ধর্ম। একে পাপ বলে না।

আমারও সেই কথা—এ পাপ নয়।

দুয়ের এক অর্থ নয় বৎস।

পিতা, ঈশ্বর বরাহকে দিয়েই মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছেন। মাটির বুকে লুকোন খাদ্য ভাণ্ডার বরাহের মতই খুঁড়ে বার করে নিতে হবে। দু'দুবার বরাহের দাঁতালে ছিন্নভিন্ন মেদিনীর বুকে বীজ বুনে যে ফসল পেয়েছি তার এক চতুর্থাংশও পায়নি শক্ত মাটি চাষ থেকে।

বৎস তর্ক কর না। যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা বিশ্বাস সংস্কার তোমার একার ইচ্ছায় ভেঙে খান্ খান্ হতে পারে না। এতে আমাদের কোন কল্যাণ হবে না। কেবল নানা দুঃখই বাড়বে। যেমন শুরু হয়েছে পূর্বদেশে দৈত্য নগরীতে। কুপিত ধরণীর অভিশাপে বাসরে যাচ্ছে, শিকারযোগ্য পশু অদৃশ্য হচ্ছে। অরণ্য নিশ্চিহ্ন হচ্ছে। আকাশের অবিরল বর্ষণ বন্ধ হয়েছে। মাঠ তৃণশূন্য হয়েছে। মুক্ত মাঠ হয়েছে রণাঙ্গণ। নিজেরাই সেখানে তারা হাতাহাতি করে মরছে।

প্রপিতামহের সত্য মিথ্যায় রচিত কাহিনীর সঙ্গে এদেশের জীবন-যাত্রার একটা মিল অবশ্যই আছে। অন্ততঃ কশ্যপের মনে এ প্রত্যয় দৃঢ় হল। কিন্তু দৈত্য দানব-ঈশ্বর প্রভৃতি লৌকিক ধারণা ঠাকুর্দার গল্পে এক জটিল রূপক। ঠাকুর্দার পূর্বপুরুষদের কেউ আগে পূর্বদেশে গিয়েছিল। তার অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য বিবরণ গোষ্ঠীর বৃহত্তর স্বার্থেই কদর্য করা হয়েছিল। গোষ্ঠীর লোকদের দৃষ্টি পূর্বদেশ থেকে সরিয়ে আনার জন্যেই লৌকিক বিশ্বাসগুলিকে ভয় ও আতঙ্ক ছড়ানোর কাজে লাগানো হল। কিন্তু বিধাতা তাকে সেই বন্ধন থেকে অব্যাহতি দিল। পশ্চাতের কোন আকর্ষণ তিনি রাখলেন না তার। চলার মন্ত্র দিলেন তাকে। রক্তের ধমনীতে কশ্যপ তার সে বাণী শুনতে পেল। আপন মনে উচ্চারণ করল চরৈবতি চরৈবতি।

প্রিয়তম! হঠাৎ পিছন থেকে বামাকণ্ঠের মধুর আহ্বান শুনে

চমকে উঠল কশ্যপ। অন্যমনস্কতার জগত থেকে এক নিমেষে সে বাস্তবে প্রত্যাবর্ত্তন করল। ঘাড় ফেরানোর সঙ্গে খিল খিল করে হেসে উঠল দনু। সুদূরলোক থেকে তার হাসির কল্লোল যেন ভেসে এল কশ্যপের কানে।

দনুর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব বিস্মিত করল কশ্যপকে। অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে বলল তুমি !!

তু'চোখে দনুর বিলোল কটাক্ষ। ওষ্ঠে চতুরা অভিনয়পীয়াসী নায়িকার মুগ্ধ হাসি। বিব্রত অপ্রস্তুতভাব গোপন করার জন্যে দনুর চোখে চোখ রেখে হাসল কশ্যপ। রহস্যময় অদ্ভূত হাসির ঝলক লেগে দনুর মুখখানিও অপরূপ লাবণ্যময় হল। কশ্যপের বিস্মিত জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে নীরব স্মিত হাস্য করে বলল: তোমার সাক্ষাতের প্রত্যাশায় পরিচারিকাদের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম পথে। বিধাতার অসীম কৃপায় অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হল এখানে।

সহাস্যে কশ্যপ বলল: আমি এসেছিলাম বন্দী দস্যুদের বিচার দেখতে।

আমার মত তুমিও বোধ হয় হতাশ হয়েছ।

একথা বলছ কেন ?

পিতা বন্দীদের তস্করবৃত্তি করা, দস্যুবৃত্তি বন্ধ করার যে দীর্ঘ উপদেশ দিলেন তা শুনে তারাও হেসেছে।

মহারাজ দক্ষ মহানুভব। তাঁর মহত্ত্ব ও ঔদার্যে আমি বিস্মিত। গতানুগতি বন্দী হত্যার নিষ্ঠুর আনন্দে তিনি মাতেননি। তাঁর অভিনব বিচার দস্যুদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রাণ- ফিরে পাওয়ার জন্যে নিশ্চয়ই তারা মহারাজের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। ভবিষ্যৎ আচরণবিধিও হয়ত তারা সংশোধন করবে।

হাসল দনু। বলল: পরাজিত বন্দী দস্যুরা মুক্তি পেয়ে যে, কৃতজ্ঞ এ তাদের হাবভাবে প্রকাশ পায়নি। বরং, প্রচ্ছন্ন ঘৃণায় বিদ্রূপে তাদের ওষ্ঠপ্রান্ত কুঞ্চিত হয়েছিল।

দনুর কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারল না কশ্যপ। অবাক

চোখে তার দিকে তাকাল। কানে তার দক্ষের কথাগুলো অনুরণিত হচ্ছে।—শোন ভাই যাতু কিমদিম আমরা তোমাদের শত্রু নই। একই বংশের লোক আমরা। আমাদের শোণিত প্রবাহে একই রক্ত-ধারা বইছে। তবু আমরা পৃথক। কিন্তু এহো বাহ্য। অন্তরধর্মে আমরা যে আজও এক তার প্রমাণ আমাদের দেহাকৃতি এক। আমরা পরস্পরের ভাষা বলতে ও বুঝতে পারি। সে কারণে আমাদের মধ্যে কোন বিদ্বেষ, বিরোধ থাকা উচিত নয়। বরং উঁচু পাহাড়ের দেশে যে যাযাবর এসেছে নতুন, তারা আমাদের শত্রু। অদূর ভবিষ্যতে তাদের সঙ্গে এক হয়ে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। তাই আমরা মৈত্রী চাই, শান্তি চাই। সংঘর্ষ চাই না। এস আমরা হাতে হাত মেলাই।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে কাটল। দনু বলল ঃ আমার কথা বিশ্বাস হল না বোধ হয়। পিতার কাতর আবেদনের তারা কোন সাড়া দেয়নি। মাথা নিচু করে তারা নিজেদের ভেতর লঘুস্বরে কথা বলছিল।

কশ্যপ মৃদু হেসে বলল ঃ পরাজিত দলের মুখে আত্মশ্লাঘা কিংবা শান্তি প্রস্তাবের আবেদন মানায় না বলে তারা চুপ করেছিল।

ক্ষমা যেখানে দুর্বলতার প্রকাশ শান্তির প্রস্তাব সেখানে নিরর্থক।

দুর্বলতা! কশ্যপের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের অভিব্যক্তি।

হ্যাঁ। বিলাস ব্যসনে মত্ত দেশে প্রতিরক্ষা বলে কিছু নেই। রাজার নিজেরও নেই কোন স্বাধীনতা। তিনি দেশের সমস্ত, বণিক, ধনিক, পুরোহিতদের নির্দেশে রাজ্য শাসন করেন। প্রজাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার গুরুতর অভাব সঙ্কট, বাতাসে তাদের অসন্তোষের গুঞ্জন। কিন্তু সেকথা শুনবার মানুষ নেই। জমিদার, অভিজাত পুরোহিতদের পাপে প্রজারা দুঃখ পাচ্ছে। প্রতিকারের কোনো উদ্যোগ নেই। নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবেই তারা যাতু, কিমিদিনকে মুক্তি দিল। শাস্তি দিলে দস্যুদের ক্রোধ, প্রতিহিংসার আগুন জ্বলবে গ্রামে গ্রামে। তাই ক্ষমা ছাড়া উপায় ছিল না কোন। ক্ষমা তাদের আত্মরক্ষার

কৌশল। একে মহত্ত্ব, মহানুভবতা বলে আত্মসন্তুষ্টি করতে লজ্জা পাচ্ছি।

হঠাৎ তাদের কথাবার্তার মধ্যে একজন ভল্লধারী প্রহরী পথরোধ করে দাঁড়াল। কশ্যপের নীল চোখে ছিল যাদু। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে সে হতবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল। সম্ভ্রমে তার মাথা নত হয়ে গেল। বর্শা হাতে সে সরে দাঁড়াল। কশ্যপের যাত্রা রুদ্ধ হল। ওষ্ঠপ্রান্তে কৃত্রিম স্মিত হাস্য সঞ্চার করে বলল : তা হলে বিদায় সুন্দরী।

আলাপের মধ্যে এরকম আকস্মিক ছেদ পড়ায় দনু বিস্ময় বোধ করল। আহত আত্মাভিমানে বলল : সে কি ? কল্পনাও করি না তোমাকে ছেড়ে থাকার। তুমি আমার জীবন রক্ষক। আমার জীবনের প্রেমপুষ্প নিবেদন করেছি তোমায়। আমি চাই তোমাকে।

টানা টানা দুই অপলক চোখ কশ্যপের চোখে রাখল দনু, সেই চোখের দৃষ্টি প্রেমের নির্ঝরিণী হয়ে কশ্যপের মনপ্রাণ প্লাবিত করল। অসহায় বিহ্বলভাবে দাঁড়িয়ে রইল কশ্যপ। তাকে এভাবে থমকে দাঁড়াতে দেখে দনু শান্ত গলায় বলল—এখনও দ্বিধা প্রিয়তম ?

বিমূঢ়ভাবে দনুর দিকে তাকাল কশ্যপ। তারপর তাকে অনুসরণ করে এগোতে লাগল। একটা ভয় চকিতভাবে তাকে সংকুচিত করল। তাই কোন কথাই মনে আসছিল না। দনুর সঙ্গে একটা ব্যবধান রেখে সে হাঁটছিল।

দূর থেকে যে প্রাসাদকে পাহাড় বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল, কাছাকাছি হতে তার মায়ারূপ অপসারিত হল। দেবদারু-পাইন গাছে ঢাকা প্রাসাদটি দুর্গ বোধ হল। ভিতরের রূপ আলাদা। অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি বিশাল প্রাসাদের সম্মুখভাগের সারি সারি স্তম্ভ, স্তম্ভশীর্ষের খিলান পাত্রে লতা-পাতা, ফুল-ফল অঙ্কিত কারুকার্য। চোখ জুড়োনো রূপের বাহার।

সু-উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত প্রাচীরের গায়ে সারি সারি গৃহ। এগুলি সৈন্য এবং প্রহরীদের থাকার জন্য নির্মিত। প্রাচীরের মাঝে অনেক-গুলি বর্হির্দ্বার। এগুলি পেরিয়ে তবে রাজপ্রাসাদে পৌঁছনো যায়।

প্রাসাদের মধ্যে বিরাট চত্বর। চতুস্পার্শ্বে তার অসংখ্য গৃহ। প্রায় শত সংখ্যা কক্ষ আছে। সেখানে থাকে দাস-দাসী এবং আশ্রিতেরা। মধ্যে বিশাল সভাকক্ষ। স্তম্ভ ঘেরা চওড়া বারন্দা দিয়ে শোভিত। সভাগৃহের পাশে প্রশস্ত মন্ত্রণাগৃহ। উপরতলের বাঁধানো প্রাঙ্গণের গায়ে মেয়েমহল, রাজমহল, রাণীমহল। প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র কক্ষ। এ-ছাড়া প্রাসাদ চত্বরে রয়েছে আরো বহু অট্টালিকা। সেখানে রাজকীয় অতিথিরা থাকেন। মনোরম অট্টালিকাটি রাজার প্রমোদ গৃহ। প্রমোদ গৃহের অনতিদূরে বিশাল অস্ত্রশালা। তারই গায়ে বৃষভশালা, রথশালা, অশ্বশালাও আছে।

প্রাসাদ চত্বর অতিক্রম করার সময় কশ্যপ আরো লক্ষ্য করল, রাজপথের বিভিন্ন মোড়ে মৃতের সমাধি স্তূপের অনুরূপ বহু সুদৃশ্য এবং বড় স্তূপও রয়েছে।

প্রাসাদ চূড়া থেকে গোটা নগরটা দেখা যায়। বিশাল নগর পূব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত। পশ্চিমের নদীতীরে বিত্তশালী বণিকদের বাস। নগরের মধ্যস্থলে সাধারণতঃ ধনী সামন্ত এবং আমাত্যেরা বাস করে। শহরে পাকা রাস্তার জাল বিছানো। সমস্ত নগরটি জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত আছে। রাস্তার ধারে ছোট-বড় অসংখ্য ইটের বাড়ী। অগুনতি দোকান এবং বাজার। প্রচুর লোকসংখ্যা। অধিবাসীদের সকল শ্রেণীর মানুষ আছে। রাজকর্মচারী থেকে আরম্ভ করে মণিকার, চর্মকার, কর্মকার, দোকানদার, বণিক, চারুশিল্পী, কৃষক, শ্রমিক, মজুর, পুরোহিত, বণিক, ওঝা সকলেই আছে। পুরোহিত, বণিক এবং ওঝাদের সম্মান এবং প্রতিপত্তি খুব বেশি। নগরে শস্য মজুত করার জন্য বড় বড় গোলা-গুদামও আছে। বিধাতার আশীর্বাদে ধন্য এ নগর। মানুষের বুদ্ধি-কৌশলে-পরিশ্রমে-অধ্যবসায়ে পৃথিবী যে স্বর্গলোক হয়ে উঠে এই অনুভূতি কশ্যপের।প্রথম। স্বর্গ কোথায়? কেমন দেখতে? কশ্যপ জানে না। দেখেও নি কখনও। কোনদিন দেখা যাবে কিনা জানে না। তবু স্বর্গ সম্পর্কে যুগ-যুগান্তের মানুষের মনে যে অখণ্ড-কল্পনা আছে, চানছদড়ো তাকেও অতিক্রম করে যায়।

বোধ হয়, সুদূর অতীতে এই দেশ দেখতে যে পরিব্রাজক এসেছিল সেও কশ্যপের মত বিস্মিত হয়েছিল। এই অপরূপ নগরী মানুষের হাতে গড়া বলে প্রত্যয় হয়নি তার। তাই একে অদৃশ্য দেবতার নামে চালানোর এক গল্প তৈরী করল। ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র বিশ্বকর্মাকে অবাধ্যতার জন্য স্বর্গলোক থেকে নির্বাসিত করে, মানুষের দাসত্ব করতে পাঠাল পৃথিবীতে।

দৈত্যরাজ ঈশ্বরের পুত্রকে আদেশ করলেন, আমার এই পুরীকে যদি তোমার স্বর্গের রাজ্যের চেয়ে আরো সুন্দর করে সাজাতে পার তাহলে তোমাকে মুক্তি দেব। পুরী এমনই হবে যা দেখে ঈশ্বরও ঈর্ষায় জ্বলবে। শত্রু আক্রোশে ফুলবে, কিন্তু আক্রমণ করে তারা দুর্গের একখানি ইটও খুলতে পারবে না। তোমার কাজে যদি আমি সন্তুষ্ট হই তা-হলে প্রত্যাশিত মুক্তি মিলবে সত্বর। আমার প্রতিশ্রুতি কখনও মিথ্যা হয় না।

তারপর একটানা এক বৎসর কঠোর পরিশ্রম করে নগর নির্মাণ শেষ করল। রাজা খুশি হল। প্রতিশ্রুতিমত বিশ্বকর্মাকে মুক্তি দিল। তাকে বিদায় দেবার জন্যে রাজা তার সঙ্গে নগরের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত এলেন। বিদায়ী বিশ্বকর্মাকে হাত নেড়ে বিদায় জানালেন। অমনি বিশ্বকর্মার দেহে তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হল। তার দু'খানা হাত একেবারে অবশ হয়ে অকাজের হয়ে গেল। বিশ্বকর্মা চেঁচিয়ে বলল ঃ রাজা তুমি বিশ্বাসঘাতক। আমার বাহুর সমস্ত শক্তি তুমি হরণ করে নিচ্ছ।

দৈত্যরাজের অধরে ক্রূর হাসি স্ফুরিত হল। বলল ঃ মিছে কথা। আমার শর্তভঙ্গ করিনি। এ রাজ্যের অভিশাপে তুমি শক্তিহীন হয়েছ।

অভিশাপ ?

হ্যাঁ, ঈশ্বর পুত্র। এ দেশের অন্নজল যে গ্রহণ করে তার অন্যত্র যাওয়ার অধিকার নেই। যখন কেউ যায় তখন তার হাত দু'খানা ওরকম শক্তিহীন হয়ে পড়ে।

কুপিত বিশ্বকর্মার দুই চোখে আগুন জ্বলে উঠল। রোষ কষায়িত

নেত্রে দৈত্যরাজের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ যার যা কিছু ভাল, তার সব ক্ষমতাটুকু নিঙড়ে নিয়ে তোমরা উচ্ছিষ্টের মত ছুঁড়ে ফেলে দাও এ তোমাদের কেমন রীতি? তোমরা মানুষ নও দানব। তোমরা দস্যু। মূর্তিমান পাপ। ঈশ্বরকে যাদু করার স্পর্ধা যারা করে তারা কোনদিন ঈশ্বরের ক্ষমা পায় না। আমিও দৈব দুর্লঙ্ঘতার যে মন্ত্র দিয়ে এই প্রাচীর নির্মাণ করেছি একদিন সিন্ধুর বিশাল ঢেউ এসে তাকে গ্রাস করবে। প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট সময়ে নগর ভাসবে। তোমার যাদুশক্তির সাধ্য নেই, সিন্ধুর দুর্বার গতিকে ফিরিয়ে দেয়।

প্রিয়তম। দনুর কণ্ঠে সুরের ঝংকার। চুপ করে কেন? কথা বল। চুপ করে থাকলে দূরত্ব ঘোচে না। জটিল সংশয়ে মনকষ্ট পায়।

কশ্যপের আত্মবিহ্বলতার অবসান হল। স্বপ্নের ঘোর কেটে গেলে বুকের ভেতর একটা কষ্ট হচ্ছিল তার। দুই চোখের মণিতে তার কষ্ট বিদ্ধ ব্যথা থমথম করছিল। এই দেশ, এই রাজ্য সত্যাই ঈর্ষার বস্তু। ঈর্ষায় বুক চিন্ চিন্ করে। পরিব্রাজক তার নিজের ঈর্ষাকে ঈশ্বরের ঈর্ষায় রূপান্তরিত করে সান্ত্বনা খুঁজেছিল। কিন্তু কশ্যপ সেরকম কোন প্রবোধ মনকে দিতে পারল না। তার কামনা বাসনার আগুন দপ্‌দপ্‌ করতে লাগল রক্তে। দনুকে মনের সেই অস্বস্তিকর যন্ত্রণার কথা বলার নয়, তাই সে বিব্রত স্বরে বলল ঃ দোষ কি শুধু আমার একার? তোমার নয়! তুমিও চুপ করে আছ। তাই'ত দ্বিধা সংশয়ে আমিও মন খুলতে পাচ্ছি না।

দনু অপ্রতিভ হল। অধরে ঈষৎ কৌতুক হাস্য স্ফুরিত হল। ভ্রূকুটি করে বলল ঃ মেয়েদের বেশি কথা বলা বারণ। প্রবীণেরা বলেন এতে আকর্ষণের ধার কমে যায়। প্রকৃতির গাছপালা, পাহাড় নদীর মত তারা চুপ করে থাকবে। ভ্রমর যেমন ফুলের কানে কানে গুঞ্জন করে, ঝর্ণা পাহাড়কে খুশি করার জন্যে তেমন নৃত্য গীত করে। বায়ু হিল্লোলে নদী যেমন কল্লোলিত হয়, সাগর উত্তাল হয়, তেমনি পুরুষও নারীকে নন্দিত করে, উদ্দীপিত করে, রোমাঞ্চিত করে, তার দেহমনকে

আত্মসমর্পণে ব্যাকুল করে তোলে এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। তার ব্যতিক্রম বেমানান। সুরের তালভঙ্গ হয়।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে কশ্যপ তার দিকে তাকিয়ে হাসল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে বলল: সুন্দর কথা বল তুমি। তোমার মত এমন সুন্দর করে কথা বলতে পারি না বলেই'ত চুপ করে থাকি।

কশ্যপের মুখের কথা ফুরিয়ে গেল। অবাক চোখে দনুকে দেখে। বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর সে অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাল।

বিহ্বল কণ্ঠে দনু জিগেস করল: সব সময় তুমি কি ভাব বলত? কি হয়েছে তোমার?

দনুর প্রশ্নের কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না কশ্যপ? তবে, দনুকে নিয়ে এক নতুন সান্ধিক্ষণ সৃষ্টি হতে পারে এরকম একটা কল্পনা তার মনে জাগল। রাজনৈতিক পতিপত্তি, রাজকীয় গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে তাদের প্রেম। এসব কথা বিদ্যুৎ চমকের মত তার মনে উদ্ভাসিত হল। কিন্তু এসব কথা দনুর কাছে বলা সম্ভব নয়। নিজের স্বার্থেই তা গোপন রাখা দরকার। রাজনীতি সম্পর্কে তার স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। অভিজ্ঞতা থেকে একটু একটু করে সে শিখছে, বুঝছে। সুতরাং এই মুহূর্তে দনুর সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা খুবই দরকার। কিন্তু মনের সুগোপন উদ্দেশ্যকে কখনও তার কাছে ব্যক্ত করা চলে না। সামান্যতম অন্যমনস্কতাও এরকম ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতির কারণ ভেবে সে অন্য কথা বলল।

জান দনু, এদেশে আমি নির্বাসিত। এখানকার মানুষের কাছে আমি এক আজব লোক। আমাকে নিয়ে তাদের কৌতুক কৌতুহলের অন্ত নেই। তাদের অবিশ্বাস, সংশয় সন্দেহই আমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করছে। আমি একা, সহায়হীন, সম্বলহীন আশ্রয়হীন।

কশ্যপের স্বরে বিষণ্ণ সুর। দনু চমকে উঠেছিল। জিজ্ঞাসা নিবিড় দৃষ্টি ওর চোখে বিদ্ধ হয়ে কেমন অন্যমনস্ক করে দিল। কশ্যপের মত তার চোখেও ঘনিয়ে উঠল বিষাদের ছায়া। কশ্যপকে আশ্বাস

দেবার সম্বল তার নেই। সান্ত্বনা দেবার ভাষাও তার জানা নেই কশ্যপ বাইরের পৃথিবীর মানুষ। এদেশের মাটি ও রাজ্যের উপর তার কোন অধিকার নেই। দক্ষের জামাতা হলেও না। দনুর অন্যমনস্কতার মধ্যে কেমন একটা লজ্জা নাড়া দিল। দৃষ্টির আচ্ছন্নতা কেটে গেল। চোখের বড় কালো তারায় ধীরে ধীরে প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাসের ভাব ফুটল। কণ্ঠস্বরে তার সখীসুলভ সহানুভূতির সুর বাজল। বলল ঃ পিতা দক্ষ তোমার সহায়। তুমি নির্ভয় হতে পার।

তিন তলার খোলা বারান্দায় দাঁড়ালে সিন্ধুর চক্রবাল পর্যন্ত চোখ পড়ে। পাশাপাশি ওরা দু'জন বসে সিন্ধুর দিকে তাকিয়েছিল। কল্লোলিত নদীর চঞ্চল স্রোতের উপর ওদের দৃষ্টি স্থির। চোখের মণিতে তরঙ্গ দুলছে। দনু কশ্যপ উভয়ে নির্বাক। নীরবতা অনেক সময় কথার চেয়ে বেশী গভীরে পৌঁছে দেয়। দু'জনের সম্পর্কটা এত নিবিড় হয়েছিল যে প্রকাশের ভাষা কারোরই ছিল না। কেবল সান্নিধ্যের ছোঁয়ায় তাদের মন ভরে ছিল।

ঠিক এরকম একটা সময় প্রতিহারী এসে ডাকল ঃ রাজকুমারী।

সহসা স্বপ্নের ঘুম ভেঙ্গে গেল তাদের। দনুর দুই চোখে কেমন একটা আচ্ছন্নতা। প্রতিহারী মাথা হেঁট করে অভিবাদন করল। তারপর নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল ঃ মহারাজ নবাগত অতিথিকে নিয়ে আপনাকে তাঁর কক্ষে আসতে আজ্ঞা করেছেন।

দনুর চোখে অবাক বিহ্বলতা। আর কশ্যপের বুকের মধ্যে দোলায়িত জিজ্ঞাসার আবর্তন।

সুসজ্জিত কক্ষে পা রাখল তারা। দক্ষ চমকে তাকাল কশ্যপের দিকে। মুহূর্তে এক অলৌকিকতার ছায়া ঘিরে ধরল তার চেতনাকে। একটা অজ্ঞাত উদ্বেগ এবং ভয় তার মস্তিষ্ক জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। কারোর মুখে কোন কথা ছিল না। অভূতপূর্ব অসহায়তা তার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ক্রিয়াশীল।

চুপ করে কাটল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বিব্রত অস্বস্তিতে হাসবার চেষ্টা করেও গম্ভীর হয়ে গেল দক্ষ। ভুরু কুঁচকে দু'জনের

দিকেই জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল ঃ যুবক তোমার কৃতিত্বের জন্য আমার কন্যার সম্ভ্রম ও জীবন দুই রক্ষা পেয়েছে। আমি তার জন্য কৃতজ্ঞ। সেজন্য তুমি যে পুরস্কার চাইবে তাই আমি দেব তোমায়।

তারপর ভ্রূকুটি চোখে ঘাড় বাঁকিয়ে গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করল ঃ আচ্ছা তুমি কে? তোমার সত্য পরিচয় কি? কেন তুমি এসেছ এখানে? তোমার মতলবই বা কি?

কশ্যপ চমকাল! এতগুলো প্রশ্নের সঠিক জবাব দিলে তার দাঁড়ানোর মত মাটি থাকে না। রহস্যের দেয়াল যাবে ভেঙে। তার স্বার্থ বিপন্ন হবে। এ অবস্থায় কি বললে ভাল হয়, সব দিক রক্ষা পায় তার উপায় সে চিন্তা করছিল।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে দক্ষ ভ্রুকুটি তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে জিগ্যেস করল ঃ কথা বলছ না কেন যুবক?

এক অসহায় অভিসম্পাতের মত হল তার অবস্থা। চরম সংকটেও মনোবল হারায় না কশ্যপ। অসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে নিজেকে সে অবিচলিত শান্ত ও সংযত রাখল। প্রতিকূল অবস্থা জয় করার জন্যে নির্ভয়ে সবিনয়ে সে পাল্টা প্রশ্ন করল ঃ মহারাজ অধীন অনুমানের কথা জানলে কৃতার্থ হয়।

কশ্যপের বাক্ চাতুর্যে বিস্মিত হল দক্ষ। তার চমকান গোপন করে রুষ্ট কণ্ঠে বলল ঃ হুঁ! তুমি খুবই চতুর। প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার কৌশলটি তোমার চমৎকার।

আমাকে অকারণ দোষী করে অপরাধী করবেন না।

বণিকের মত মন ভোলানো কথা তোমার। কিন্তু আমাকে তুমি বিভ্রান্ত করতে পারবে না। আমার অনুমান যাই হোক, সে কথা বলে আত্মগোপনের সুযোগ তোমাকে দেব না।

আপনার কথা বোধগম্য হচ্ছে না আমার। আত্মগোপনের মত কোন কাজ আমি করিনি।

তাহলে আমার অনুমান জেনে লাভ তোমার?

বিভ্রান্তি এবং অহেতু বাক্‌বিতণ্ডা পরিহার করার জন্যই জানতে

চাওয়া। অন্য কোন উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় আমার নেই। দুর্ভাগ্য, সেই সরল কথাটা না বুঝে মহারাজ গোড়া থেকে আমাকে সন্দেহ করছেন।

রাজনৈতিক ব্যক্তির মত মাপা কথা বল তুমি। রেখে ঢেকে বলার কৌশলকে তারিপ করি। একটা বাজে কথা নেই। বুদ্ধির ধার কথায়। তুমি কে, জানি না! গুপ্তচর বলে যদি কেউ সন্দেহ করে তা হলেও অবাক হব না।

হাসল কশ্যপ। বলল: মহারাজ আপনার অনুমান যে সঠিক নয় সে কথা বলতে পারি। আমি বণিক নই, গুপ্তচর নই, রাজনীতিকও নই।

দক্ষের এবার অবাক হওয়ার পালা। কশ্যপ সম্পর্কে যে সন্দেহ তার কথায় প্রকাশ পেল তার নির্ভুল পাঠ নিতে কশ্যপের ভুল হল না। ক্ষণকালের জন্য দক্ষ স্তম্ভিত হল। মুখে তার কথা সরল না। দক্ষের দৃষ্টিতে বিভ্রান্তি বাড়ল। এত নিশ্চিতভাবে যুবক তার সন্দেহকে আচ করল কি করে? কে দিল তাকে এই ক্ষমতা? তবু তাকে ভাল করে পরখ করার জন্যে বলল: হাঁ, লোকের তাই ধারণা। মিথ্যা হলে প্রমাণ কর তুমি।

কশ্যপ চিন্তাগ্রস্ত। বলল: সেই'ত মুস্কিল। তারপর কি ভেবে নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল: আমি কশ্যপ। এইটাই আমার একমাত্র পরিচয়। আর সব অতীতকালের গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তাকে খুঁজে লাভ কি? আমি যাযাবর। পথে পথে ঘুরি। চলাই আমার ধর্ম। কোন মতলব নিয়ে চলি না। তবু ফন্দীবাজ মানুষের মতলব আমায় নিয়ে। এটাই আমার বিস্ময়! এর অধিক প্রশ্ন করে আমাকে বিব্রত বা বিভ্রান্ত না করতে অনুরোধ করব।

যুবক সত্যিই মানুষের বিস্ময় তুমি। এই বিস্ময়ের মূল তোমার আকৃতি প্রকৃতি, ব্যক্তিত্ব, কৃতিত্ব, অসাধারণ বাক্‌চাতুরী এবং তোমার নম্র শান্ত আচরণ! নিশিডাকের মত মন্ত্রমুগ্ধ করে কাছে টানে। এই ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার বলে তুমি মানুষের হৃদয় হরণ কর। আমিও

মুগ্ধ তোমার আচরণে। কিন্তু সম্পূর্ণ মোহগ্রস্ত হওয়ার আগে এ পুরী থেকে বিতাড়িত করব।

সে'ত আমার পরম পুরস্কার। কশ্যপের কথার মধ্যে উত্তেজনা নেই, শান্ত। কিন্তু তার অপলক দৃষ্টি দনুর দিকে। দনুর দৃষ্টিও তার সঙ্গে মিলিত হয়। এক অদ্ভুত মুগ্ধতা দনুর দুই চোখে দেখল দক্ষ। দনুর দৃষ্টিতে সাবধানী সংকেত। কন্যার অভিলাষ বুঝতে অসুবিধা হল না দক্ষ'র। নিজের অগোচরে তার বুক কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই সংবিত ফিরে পেল। বিব্রত বিস্ময়ে জিগোস করল ঃ পুরস্কার ! পুরস্কার কেন বলছ ?

অপলক চোখে সিন্ধুর দিকে তাকিয়েছিল কশ্যপ। সিন্ধুর তরঙ্গ নিরন্তর অবাধ্য। দৃষ্টিতে কেমন আচ্ছন্নতা। বিহ্বল কণ্ঠে বলল ঃ পথে চলার আনন্দ যাযাবরের সম্পদ। সিন্ধুর ঐ ছুটে চলা তরঙ্গের মতই যাযাবর মুক্ত এবং স্বাধীন। ঘর সে একটা অবশ্যই চায়, কিন্তু তার মোহে বাধা থাকবে না কখনও। অফুরন্ত চলার নেশায় ঘরছাড়া সে।

দক্ষ অবাক হয়ে থেমে যায়। কথাটা অযৌক্তিক মনে হয় না। ভ্রুকুটি চোখে ঘাড় বাঁকিয়ে গম্ভীর স্বরে তাকে বলে ঃ তোমার কথায় ভুলছি না আমি। এ পুরীতে তোমার কোন স্থান নেই, এ রাজ্যেও জায়গা হবে না তোমার।

দক্ষের মস্তিষ্কের চকিত চিন্তার ঝিলিক দিল। দনুর মুখ ভেসে উঠল তার চোখে। কশ্যপের দৃষ্টিও কেমন অদ্ভুত দেখাল। তার অপলক চোখের তারায় এমন একটা অনির্বচনীয়তা ছিল ;—এমন একটা ইঙ্গিতে অর্থপূর্ণ ছিল, যা কথার চেয়ে অতিরিক্ত বাঙ্ময়। অজান্তে দক্ষের শ্বাস পড়ল। হৃদয় কেঁপে উঠল। মন দুর্বল হল। বুকের মধ্যে ভয়ের আশংকা, চমক ও জিজ্ঞাসা একসঙ্গে তাকে বিহ্বল করে দিল। সঙ্গী নির্বাচনে দনু এত মনোবল পেল কোথা থেকে ? কশ্যপের কি আছে ? মেয়েটা কশ্যপের অবস্থা বুঝে না, ভাল করে অনুমানও করতে পারে না। তবু, তার নির্ভয় যাত্রা, রাজ্য, ঐশ্বর্য, সুখ, আরাম, বিলাস থেকে মুক্ত, বেপরোয়া দুর্নিবার। ভাবতে ভাবতে দক্ষের দুই চোখে

এক অপ্রতিরোধ্য মুগ্ধতা নেমে এল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে কশ্যপের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল ঃ আমার কাছে তোমার প্রত্যাশা কি ?

দক্ষের জিজ্ঞাসায় কশ্যপের আত্মবিহ্বলভাব দূর হল। ভুরু কুঁচকে গেল। আস্তে আস্তে বলল ; আমি এক ভবঘুরে। চালচুলো কিছু ইনে। আপনার পারিবারিক মর্যাদা যদি বিপন্ন না হয় তা হলে আপনার প্রতিশ্রুত পুরস্কার স্বরূপ রাজকুমারী দনুকে আমার ভাষা হওয়ার সকল ব্যবস্থা করুন।

দক্ষের সম্মতি প্রাপ্তির আশায় তাকাল কশ্যপ। চোখে তার তীব্র ব্যাকুল জিজ্ঞাসা। মুখেতে অবিচলিত ভাব।

চমকে উঠল দক্ষ। রক্ত দপ্‌দপিয়ে গেল। ভ্রুকুটি তীক্ষ্ণ চোখে প্রায় রুদ্ধস্বরে বলল ঃ যুবক, তোমার স্পর্ধায় আমি বিস্মিত। রাজ্যের চেয়েও বড় যে সাম্রাজ্য, তার অধিকার তোমার হাতে তুলে দেব কেন

আপনার প্রতিশ্রুতি পালন করবেন বলে।

ভুল বলেছ তুমি। দনু বাগদত্তা। তাকে তুমি দাবি করতে পার না। শান্ত গলায় বলল দক্ষ।

দক্ষের মুখের উপর কশ্যপ দিল অবিস্মরণীয় উত্তর—তার সঙ্গে দনুর সম্বন্ধ কি ? সে তখন ছোট। বিবাহের কিছুই বোঝে না। রাজনৈতিক বিরোধ এড়ানোর জন্য আপনি পুরোহিতের পুত্রের সঙ্গে তার সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। কন্যার অমতে তার স্বামী পছন্দ করতে আপনিও পারেন না।

স্তব্ধ হও যুবক।

মহারাজ যাতু কিমিদিন তাকে যদি হরণ করত, তা-হলে আপনার বাগদান্ কেমন করে রক্ষা পেত ? দনুকে আমি জয় করেছি। সেই জয়ের কণ্ঠেই পরাব আমার বিজয়মাল্য।

পরস্ত্রীর দিকে হাত বাড়িও না যুবক।

মহারাজ সংস্কারের চেয়ে ধর্ম বড়। নীতির চেয়ে হৃদয় বড়। আপনার ধর্ম রক্ষা করা যেমন কর্ত্তব্য, তেমনি নীতি পালনে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

আমাকে তুমি ভয় দেখাচ্ছে যুবক।

না, মহারাজ, এ আমার কর্তব্যপালনের অঙ্গীকার। আমি চাই জয়। যে কোন মূল্যে সেই জয় আমি আদায় করে নেব। আমার কথা কখনও মিথ্যে হয় না।

এর অর্থ যুদ্ধ।

আসল যুদ্ধ ভাগ্যের সঙ্গে। ভাগ্যকে আমি স্বীকার করে নিয়েছি, অপেক্ষা করে আছি ভাগ্যের অমোঘ দানের ফলশ্রুতির প্রত্যাশায়।

ক্রুদ্ধস্বরে দক্ষ বলল: তুমি লোভী। কৌশলে দনুকে হাত করে তুমি চাও এই সিংহাসন। বামন হয়ে চাঁদ ধরার স্বপ্ন তোমার চোখে।

রাজসিংহাসন না পেলেও হৃদয় সিংহাসনের প্রার্থী আমি। সে দাবি থেকে আমি একচুল সরে যাব না।

কশ্যপের দৃঢ় প্রত্যয় অবাক করল দক্ষকে। নির্বাক, বিহ্বল কন্যাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে দক্ষ ব্যাকুলস্বরে অনুনয় করে বলল: তোরও কি সেইকথা মা! তুই কি আমাকে ছেড়ে চলে যাবি? আমার কথা একবারও ভাববি না। স্নেহ ভালবাসার কি কোন মূল্য নেই? চুপ করে থাকিস না, উত্তর দে-মা। তুই চলে গেলে রাজ্যের প্রজাদের কাছে আমি মুখ দেখাব কি করে? থাকব কেমন করে?

দনুর চোখ বোজা। গলিত অশ্রু গাল বেয়ে নামে। কান্না মথিত স্বরে বলল: বাবা, কেন বোঝ না আমিও আমার হৃদয়ের কাছে তোমার মতই অসহায়! তোমার কথা মানতে গেলে আমাকেও হারতে হয়, হারাতে হয়। আমরা দু'জনেই একই চেতনার কেন্দ্র বিন্দুতে দাঁড়িয়ে পরস্পরে জিততে চাইছি। তোমার মর্যাদা যেমন বড় তোমার কাছে তেমনি প্রেমে চরিতার্থ হওয়ার আনন্দও আমার কাছে মুখ্য। কেউ কারো দাবি ছাড়তে রাজি নই বলেই সমস্যাটা আমাদের জটিল হয়ে উঠেছে। জীবনের কামনা বাসনা আকাংখা মর্যাদার সঙ্গে মানুষ কখনও সন্ধি করে? না করতে পারে? তুমি পারছ কি? যা নিজে পার না, তা অন্যের কাছে প্রত্যাশা কর কেন?

দনুর স্বরে কান্না নেই, কিন্তু ভেজা স্বরে লেগে থাকে সমবেদনার

আর্তি। দক্ষের বুক থেকে নামল গভীর দীর্ঘশ্বাস। ভ্রুকুটি কুটিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কশ্যপের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ এখন তুমি যেতে পার যুবক। পরে আমাদের দেখা হবে আবার।

কশ্যপ দ্বারের দিকে পা বাড়াল। দনু পিছন থেকে অসহায় কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করে উঠল ঃ দাঁড়াও দেবপুত্র, আমি যাব তোমার সঙ্গে।

চমকে উঠল দক্ষ। আকুল স্বরে আর্ত্ত চিৎকার করে ডাকল ঃ দনু!

শান্ত গলায় দনু বলল ঃ পিতা ডেকো না আমায়। জিনদাসকে পছন্দ নয় আমার। আমি যাকে চাই, সে ঐ দেবপুত্র।

দক্ষের রোষকষায়িত দুই চক্ষে দপ্ করে আগুণ জ্বলে উঠল। দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় করে শব্দ হল ঃ এত বড় স্পর্ধা।

দনু দাঁড়াল না, শুনল না পিতার কথা। ফিরেও দেখল না একবার। কশ্যপের পিছন পিছন সেও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ, একটা দারুণ কষ্টে তার বুক টনটন করতে লাগল। নিঃশ্বাস যেন আটকে এল। মুহূর্ত্তে বদলে গেল তার কণ্ঠস্বর। চোখের চাহনি ব্যথায় সুনিবিড় হল। কণ্ঠস্বরে অভিমানহত পিতৃত্বের ব্যাকুল আর্তি। দনুর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ পিতার প্রতি টান নেই তোর? দেশের প্রতি ভালবাসা নেই? এত হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর তুই'ত কোন দিন ছিলিস না মা!

মহারাণী দক্ষিণা কক্ষান্তরে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। আগলে দাঁড়াল দনুকে। বুকে টেনে নিয়ে তাকে স্নেহ করে বলল ঃ অমন করে ঘরের বাইরে চলে যেতে নেই।

প্রেম পাগলিনী দনু দু'হাতে চেপে ধরল মা'কে। অস্ফুট স্বরে ডাকল ঃ মা! কথা দাও দেবপুত্রকে বরণ করে নিতে দেবে। বল বাধা এলে মানবে না। শপথ কর—

করলাম।

তারপর, কশ্যপ দনু পাশাপাশি অলিন্দ দিয়ে হাঁটতে লাগল। সোহাগদৃষ্টিতে দনুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল কশ্যপ ঃ রাজকুমারী, সব খোয়ানো, সব হারানো এই প্রেম নিয়ে কেন তুমি আসছ?

প্রেম বিহ্বল দুই আঁখি মেলে দনু তাকাল। রূপের বিদ্যুতে ধাঁধিয়ে গেল তার চোখ। তার চকিত ছোঁয়ায় শিহরিত হল তার আঁখি। বলল—তোমার জন্যে।

আমার কি আছে? কিছু নেই।

ধনবত্ন কিংবা সিংহাসনের জন্যে তোমাকে চাইনি। তোমার কি আছে আর নেই, তা জানারও কোন ঔৎসুক্য নেই। আমি শুধু দিতে চাই। ফুলের মত নীরবে আমি আমার প্রেম দেব তোমায়।

কিন্তু আমি যে কী তা তো তোমাকে জানতে হবে।

আমার মন দিয়ে তোমাকে অনুভব করেছি।

অলিন্দের একটি স্তম্ভে ঠেস দিয়ে কশ্যপ চুপ করে রইল।

অন্ধকার এল ঘনিয়ে। চক্রবালে মিলিয়ে গেল সিন্ধুর তীরভূমি। চাঁদের ম্লান আলো পড়ল দনুর মুখে। চিক্ চিক্ করতে লাগল তার দুই চোখের মণিতে। দু'হাতের তালুতে দুটি গাল ভরে নিয়ে কশ্যপ তার মুখখানি চোখের উপর তুলে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর বিহ্বল গলায় বলল: তা-হলে এবার যাই।

অপলক চোখে তাকিয়ে দনু বলল: যে চোখে তুমি আমাকে দেখছ, সেই চোখ আমার। যে মন দিয়ে তুমি আমায় সোহাগ করছ, সেই মনও আমার। বল, এ সব আমায় দেবে তুমি।

স্খলিত ভেজা স্বরে কশ্যপ উত্তর করল: তুমি বাসনার দীপ। আমার কামনার ধন। তোমাকে অদেয় কিছু নেই। তোমার সম্পদ আমার সব পাওয়ার সঞ্চয়কে তুচ্ছ করে দেবে।

প্রেমের একনিষ্ঠ অঙ্গীকারের কাছে দনু সমর্পণ করল তার রোমাঞ্চ তপ্ত তনু। পরিতৃপ্ত কশ্যপ মুগ্ধ আঁখি মেলে চেয়ে রইল তার দিকে। কামনাতপ্ত দেহের আলিঙ্গন তখনও হয়নি শিথিল। ক্ষীণকটিদেশ জড়িয়ে ধরে বলল: প্রদীপের বুকে যেমন শিখা, তেমনি আমার বুকে তোমার প্রেমের পরশ রইল অক্ষয় হয়ে।

তাহলে আমাকে নাও তোমার সঙ্গে।

না, এভাবে নয়, প্রিয়তম। বীর্যের আবাহনে যে জীবন সার্থক,

সেই জীবন মহান। আমি সেই মহান জীবনের আনন্দ ও গর্ব চিত্ত ভরে পেতে চাই। বীর্যবলে আমি জয় করব তোমায়। তোমার প্রেম আমার পাথেয়।

প্রিয়তম, এদেশে যোদ্ধা নেই, যুদ্ধ নেই, বীর নেই, তুমি যুদ্ধ করবে কার সাথে ?

নারীর প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে পুরুষের লড়াই চিরকাল। আমি লড়ব তাদের সঙ্গে। লড়ব আমার অদৃষ্টের সাথে।

কয়েকদিন ধরে দক্ষকে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখে মহারাণী দক্ষিণাও মনে মনে অশান্তিবোধ করছিল। কশ্যপই যে তার দুর্ভাবনা, একথা দক্ষ না বললে দক্ষিণা বোঝে। কিন্তু তাকে নিয়ে এই চিন্তার কোন হেতু খুঁজে পায় না। তবে, দক্ষের মনের বাধাটাও তার অজ্ঞাত নয়। কিন্তু তাকে আদৌ বাধা বলে মনে করে না দক্ষিণা। রাজপুরোহিত তুর্বাণের পুত্র জিনদাসের বাগদত্তা দনু। তার পতি নির্বাচনের স্বাধীনতায় তুর্বান ক্রুদ্ধ হবে। দনুকে নিয়ে রাজা পুরোহিতের মর্যাদার লড়াই বাঁধা খুব আশ্চর্য নয়। কিন্তু তাই বলে রাজার স্বাতন্ত্র্য থাকবে না ? রাজার নিজস্ব একটা গরীমা আছে। তিনি অসাধারণ। ঈশ্বরের মতই সর্বশক্তিমান। অনন্ত তাঁর ক্ষমতা। শক্তিতে ঐশ্বর্যে তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়। রাজার উপর স্পর্ধা প্রকাশ করলে অগ্নি তাকে দগ্ধ করে। রাজা তাঁর কাজের জন্য কাউকে জবাবদিহি করেন না। তিনি কোন অন্যায় করেন না। ধর্মের রক্ষক তিনি। শত্রুর আতংক। অত্যাচারীর যম। রাজাকে ঘিরে এই আতংক যদি না থাকে তা-হলে প্রজারা তাঁকে মানবে কেন ? দক্ষ এত বোঝে এটুকু বোঝে না, কিসে তার স্বার্থ রক্ষা হয় ?

দেবপুত্র কশ্যপের বিরাগভাজন হওয়া কখনও উচিত কার্য হবে না দক্ষের। দেবতার ক্রোধ, অভিশাপে[illegible]ন কখনও সুখের হবে না। মা হয়ে কন্যার এই দুর্ভা[illegible] করতে পারবে না। ঈশ্বরের

অসীম অনুগ্রহে দেবপুত্রকে সে গৃহে পেয়েছে। শুধু তাই নয়, এ পর্যন্ত কোন দেবপুত্র কোন মানব কন্যাকে দাবি করেনি। কামনার সঙ্গিনী করলেও দেয়নি পত্নীর মর্যাদা। কশ্যপ তার দেহকে নয়, মন প্রাণ আত্মাকে চায়। তাই দাবির মর্যাদা রক্ষার জন্য তার কেশর ফোলানো সিংহনাদ। এ দাবিকে ভাগ্যের প্রসাদ বলে মনে করে দক্ষিণা। দেবতা সহায় যার, তার আবার ভয় কিসে? একজন নগণ্য পুরোহিতকে দক্ষ ভয় পাচ্ছে কেন? ভেবে পায় না দক্ষিণা। মনের এই অতলান্ত জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়ার জন্য সে দক্ষের কক্ষের দিকে পা বাড়াল।

দরজার দিকে অপলক চোখে তাকিয়েছিল দক্ষ। অসময়ে দক্ষিণার প্রবেশ তাকে বিস্মিত করল। অনুসন্ধিৎসু নিবিড় দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল। মধুর হাসিতে চোখ মুখ উদ্ভাসিত করে বলল: রাতের ঘুম ফেলে আমার ঘরে এলে? দক্ষিণা হাসি হাসি মুখ করে বলল: সবে'ত সন্ধ্যা হল। রাত হতে এখনও অনেক দেরী। ক'দিন হল রাতে ঘুমুতে পার না। কি হয়েছে তোমার? দক্ষিণা শয্যার উপর উঠে বসল।

দক্ষ বিষণ্ন কণ্ঠে বলল: কথাটা মিথ্যে নয়। সত্যিই আমি ঘুমুতে পারছি না। তাই'ত অন্যকেও ঘুমুতে দাও না।

একটু বুঝিয়ে বল রাণী।

মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছ কখনও। কশ্যপকে হারানোর আশংকায় কি রকম অসহায় হয়ে পড়েছে। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। বুক ফেটে যায় আমার। চোখে ঘুম আসে না।

আমার সব কথা জানলে, বুঝলে এ অভিযোগ তুমি করতে পারতে না। আমি নিজের হাতে নিজে বন্দী হয়ে আছি। আমার করার কিছু নেই।

বন্দী বলছ কেন? তুমি রাজা।

ম্লান হাসল দক্ষ। দক্ষিণার কণ্ঠস্বর তার কানে ব্যঙ্গের তীব্র বর্ষণ

করল। বুকের মধ্যে তার কষ্ট। ক্লান্ত স্বরে বলল: তুমিও ব্যঙ্গ করলে রাণী! আমি যে কত অসহায়, এই সত্যটা আর কেউ না জানলেও তুমি জান। রাজপরিবারের কোন মেয়েদের নিজের গোষ্ঠীর বাইরে অন্য কোথাও পাঠানো বিধান নেই। তাই আমি নিরুপায়।

প্রথা-বিধানের নামে এই অত্যাচার মেয়েদের উপর আবহমান কাল চলে আসছে, আর কতকাল চলবে?

গম্ভীর স্বরে বলল দক্ষ—

রাণী দক্ষিণা! নাস্তিকের মত কথা বলা তোমার মানায় না।

মহারাজ! তোমরা অন্ধকারের জীব, আলো দেখলে ভয় পাও:

মিছে কথা। রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য প্রথা। বর্তমানে ক্ষত্রিয় পুরোহিত এবং বণিকদের মধ্যে কন্যা আদান প্রদানের নীতি শিথিল হয়েছে। এর চেয়ে অধিক উদারতা দেখাতে গেলে—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দক্ষিণা বলল: বিশুদ্ধতা রক্ষা পায় না।

দক্ষ সরলভাবে উত্তর করল: যথার্থ।

তার মধ্যে চির লাঞ্ছিত নারীর ব্যক্তিত্ব কেশর ফোলা সিংহের মত গরগর করে উঠল। দক্ষিণার দুই চোখে ভৎর্সনা। কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা। ব্যঙ্গের তীরাগ্রে দক্ষকে বিদ্ধ করার জন্যে বলল: বিশুদ্ধতা? তোমরা বিত্ত-বৈভবের পরিচয় দাও নারী আর গাভীর সংখ্যাতত্বে। যে দেশে নারীর মর্যাদা গাভীর সমান, যে দেশের পুরুষ ব্যাভিচারের পঙ্কিল স্রোতে ভাসমান তাদের মুখে রক্তের বিশুদ্ধতা পরিহাসের মত শোনায়। সম্ভ্রান্ত বিত্তশালী বণিক অভিজাত পুরোহিতদের অট্টালিকায় বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করে আনা নারীদের যেভাবে ভোজ্যবস্তুর মতন ভোগ করা হয় তাতে রক্তের বিশুদ্ধতা কি রক্ষা পায়? এইসব নারীদের গর্ভে যে সব অবাঞ্ছিত সন্তান আসে তাদের রক্তে অমিমিশ্র বিশুদ্ধতা কোথায়? কি তাদের পরিচয়? তোমাদের নির্লজ্জ লালসা আর ব্যাভিচারে এক নতুন শংকর জাতির উদ্ভব হচ্ছে। তোমাদের কাছে কি পেয়েছে তারা? অধিকার বঞ্চিত, লাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত সন্তান জন্ম থেকে পেয়েছে উপেক্ষা আর ঘৃণা। শৈশব থেকে সুরু হয়েছে

তাদের দাসত্ব। এদেশকে তোমরা নরককুণ্ড করে তুলছ। আর নিজেদের নির্লজ্জ বর্বরতা, কামুকতার সাফাই গাইতে ধূয়ার মত বলছ নারী নরকের দ্বার। কাদের পাপে এ নরক তৈরী হচ্ছে? নারীরা কতটুকু দায়ী সেজন্য। অরণ্যের বর্বর মানুষও জীবনের সংযমের শ্রী রক্ষা করা চলে। কিন্তু তোমরা অরণ্যের পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। তোমরা নরাধম। মূর্ত্তিমান পাপ। মনে রেখ, তোমাদের এই পাপে একদিন এ নগরী রসাতলে যাবে। এখনও সময় আছে স্বামী। দেবতাকে রুষ্ট কর না। দনুকে বাঁচাও, দেশকে রক্ষা কর। দেবতা তোমার সহায় হোক।

দক্ষিণার মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শুনছিল দক্ষ। দক্ষিণা পরোক্ষভাবে যে তাকেও তিরস্কৃত ও অভিযুক্ত করল, একথা বোঝার মত বুদ্ধি ছিল দক্ষের। অপরাধ ধরা পড়ার ভয়ে না বোঝার ভান করল। অপরাধ বোধ ওর চোখে মুখে একটা গভীর আগ্রহের ভাব ফুটিয়ে তুলল। দক্ষিণা যা বলল, তার যে কিছুই জানে না সে তা নয়, তথাপি মনে হয় এসব যেন সে নতুন শুনল। নিচু স্বরে বলল: তুমি ঠিকই বলেছ—জুলুমবাজ, স্বার্থান্বেষী ধনীদের দাপটে শাসনযন্ত্র ভেঙে যেতে বসেছে। অথচ একদিন আমি চেয়েছিলুম মানুষ সুখী হোক, সমাজের কল্যাণ হোক, দেশের সমৃদ্ধি বাড়ুক। সেজন্য প্রশাসনকে নতুন করে সাজিয়েছিলুম। আশায় আনন্দে উত্তাল হয়ে কি পরিশ্রমই না করেছি। তবু পেরেছি কি তাদের ভাল করতে? আমার সব স্বপ্ন নির্মূল হয়ে গেল। কেউ আমার কথা শুনল না। যে যার স্বার্থ নিয়ে চলল। আমার ভুলেই তারা প্রচুর ক্ষমতা পেল তারা। তৈরী হল এক নতুন অত্যাচারীর দল। সহজ সরল ধর্মপ্রাণ মানুষকে ঈশ্বরের নামে ঠকাল। বলল: জমি ঈশ্বরের। বারিবর্ষণ করে ফসল ফলাচ্ছেন তিনি। ফসলের মালিক দেবতা। তারা ঈশ্বরের দাস। ভোগের অধিকার একমাত্র তাদের আছে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে কৃষক চাষ করল, ফসল তার হল না। ঈশ্বরের নামে মতলববাজ, জুলুমবাজ ক্ষমতাবান একশ্রেণীর মানুষে তা আত্মসাৎ করল। পুরোহিতদেরও

তাদের দলে নেওয়া হল। উৎকৃষ্ট জমির ভাগ তাদেরও সমান দেয়া হল। কৃষক বৃত্তভোগী বিভিন্ন মানুষ হল তাদের সুখ আর সম্পদ বাড়ানোর যন্ত্র। বিত্তবৈভবের পাহাড় হল তৈরী। ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে রাজপুরুষেরা গোষ্ঠীর স্বার্থ ভুলল। এখানেই শেষ হল না। দস্যু ও শত্রুর আক্রমণ হলে বাধা দানের কাজ যাতে সহজ হয় সেজন্য রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে দুর্গ নির্মাণ করে সৈন্য মজুত রাখা হত। দুর্গাধ্যক্ষদের উপর তার দেখা শোনার দায়িত্ব ছিল। একদিন তারাই খুদে রাজা হয়ে উঠল। আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার ভয় দেখাল। ধনী অভিজাত বণিক পুরোহিতের মদত পেল তারা। এমনি করে একদিন তাদের হাতের খেলার পুতুল হয়ে গেলাম।

দক্ষ গভীরভাবে কথাগুলো বলছিল। হঠাৎ বুকে বেঁধা একটা তীব্র যন্ত্রণায় কথা তার আটকে গেল। কেমন একটা বিমর্ষতায় ওর মুখ ঢাকা, দৃষ্টিতে কেমন একটা অসহায় ক্লান্তি।

দক্ষিণার দুই চোখে বিস্ময়। অবাক বিভ্রান্ত মুখ। দক্ষের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল। উদ্গত নিঃশ্বাস চাপতে গিয়ে জোরে শ্বাস পড়ে যায়। একটা সচকিত লজ্জায় চোখ কুঁচকে যায়। কাঁপা গলায় বলল—তার জন্যে তুমি দায়ী।

আচ্ছন্নের মত মাথা নাড়ছিল দক্ষ।

বলল—না, তুমি ভুল বলছ। মানুষকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম। সততা, সুখ আর মঙ্গলের মধ্য দিয়েই মানুষ প্রত্যেকে তার নিজের জীবনের চরিতার্থতা খুঁজে পাক, এটাই আমার চাওয়া। কিন্তু সেই চাওয়াটা মিথ্যে হয়ে গেল।

নিজেকেই তুমি ছলনা করছ। আমার মন গলাতে চাইছ। আমাকে বিভ্রান্ত করে তুমি দনুকে হতাশ করার ফন্দী করেছ। তুমি মনে কর কি? তুমিই একমাত্র চালাক?

মানুষের কাছে পদে পদে যে ঠকেছে সে করবে চালাকির বড়াই?

ঠকেছে! ভীরু, কাপুরুষের মত নির্লজ্জ মিথ্যা কথাটা বলতে তোমার আত্মসম্মানে লাগল না। নিজের দোষ স্বীকার করতে এত

লজ্জা! সোমরসে আর কামরসে ডুবে যুদ্ধ ভুলেছ, রাজকার্য দেখা শোনা ছেড়েছ। ললনাদের দিয়ে সর্বক্ষণ কাটিয়েছ একথা কবুল করতে লজ্জা হল? তোমার অবহেলায় আজ দেশের মানুষ ক্লীব। সত্যিকারের একজন পুরুষ নেই এদেশে। এ রাজ্যে নেই কোন যোদ্ধা। বীরের কথা নাই বা তুললাম। যুদ্ধ করতে ভুলে গেছে চানছদড়োর মানুষ। সৈনিকদের অস্ত্রে ধুলো জমেছে। শত্রু বলতে মুষ্টিমেয় পাহাড়ী দস্যু। তাদের ভয়ে বিব্রত তোমরা। তাদের দস্যুতা দমন করা দূরে থাকুক, বন্দী দস্যুকেও পার না শাস্তি দিতে। মার্জনা করে তাদের কৃপা ও অনুগ্রহ চাও এমনি বীরপুরুষ তোমরা। ধিক্ তোমাকে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন তোমার। তাই দেবতাকে গৃহে পেয়েছ।

দক্ষ কুপিত হল। ঠোঁটের কোণে ধারালো হাসির বক্রতায় গোঁফ বেঁকে যায়। কথা বলার সময় তার ভুরু কুঁচকে যায়। ব্যঙ্গের তীরাগ্রে বিদ্ধ করার জন্যে বলল—তোমার দেবতার অসীম কৃপা। তাই না? এত লোক থাকতে আমার উপর তাঁর করুণার উদ্রেক হল কেন বলতে পার?

দক্ষিণা তৎক্ষণাৎ সতর্ক হল। উষ্মা তীব্র হল। চোখের দৃষ্টি তার তীক্ষ্ণ হল। ক্রোধে মুখখানি ভয়ংকর দেখাল। যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করে কাঁপা গলায় বলল: দুর্গত, অসহায়, বিপন্ন মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে কাকতালীয়ভাবে তোমার ভাগ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। তোমার পূর্বজন্মের কর্মফল ভাল ছিল বলেই হয়ত দেবতার অনুকম্পা লাভ করেছ। নইলে, তুমি ক্ষমারও অযোগ্য।

রাণী। স্পর্ধারও একটা সীমা আছে। দক্ষের প্রতিবাদে শাসনের ভাষা ফুটে উঠল।

মাপ করবেন মহারাজ! স্পর্ধায় যে নারীর অধিকার নেই একথাটা একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। দক্ষিণার অচঞ্চল শান্ত স্বর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে শানিত।

আগুনের মত দপ্‌দপিয়ে উঠল দক্ষের চোখে। সমস্ত মুখটিও রাগে অপমানে তাকে দিশাহারা দেখাচ্ছিল। তবু দক্ষ বিস্মিত হয়েছিল

দক্ষিণার স্পষ্ট জবাব শুনে। সম্ভবত অবচেতন মনে একটা মুগ্ধতাও ছিল তার। ক্রোধের পরিবর্তে একটা অপরাধবোধ কেন্দ্রিত হয় তার অনুভূতিতে। দক্ষিণার বিশ্বাস এবং আনন্দকে তীব্র জিজ্ঞাসায় শিহরিত করে তোলার জন্যে বলল ঃ বন্ধুবর তুর্বাণ যুবককে গুপ্তচর বলে সন্দেহ করে। তার যুক্তি অকাট্য, সেগুলো মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

তুমি যে কেন এসব কথা বলছ, আমি বুঝতে পারছি না।

আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। যুবকের কপালে কোন অক্ষি চিহ্ন নেই। তার চলা ফেরার মধ্যে নেই কোন গতির ছন্দ। অসংস্কৃত বর্বরতা তার আচরণে।

দক্ষিণা হাসে। বলল ঃ প্রজ্ঞা দৃষ্টি থাকে প্রচ্ছন্ন। সময় কালে প্রকাশ পায়। দেবতার তৃতীয় নয়নে অগ্নি থাকেন প্রচ্ছন্ন। তাই ক্রোধে ললাটে তাঁর বহ্নি জ্বলে। গাত্রবর্ণ আমাদের মত নয়। দেবতার মত দেখতে ওকে। চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ মনোরম নয়ন জুড়ানো তার রূপ। দেবতার মতই শ্মশ্রুহীন মুখমণ্ডল। তুরঙ্গের মত ক্ষিপ্র বেগে চলা তার অভ্যাস।

দক্ষ মনোযোগ দিয়ে দক্ষিণার কথা শুনল। তারপর আস্তে আস্তে মাথা উঁচু করে অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে বিজ্ঞের মত বলল ঃ তাই বুঝি। দেবতাকে আমাদের পূর্বপুরুষ কেউ কখনও দেখেছে ?

দক্ষিণা জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে তৎক্ষণাৎ পাল্টা প্রশ্ন করল। বলল ঃ না দেখলে তার মূর্ত্তি কেমন করে আঁকল ? পূর্ব ধারণা ছাড়া কোন কিছুই কল্পনা করা যায় না রাজপুরোহিত তুর্বান'ত এই কথাই বলেন। এখন অন্য কথা শোনালে তাকে মিথ্যাবাদী বলতে হয়। সত্য মিথ্যার মীমাংসা করে তুমিই স্থির কর কোন্‌টা ঠিক ?

এরকম একটা আকস্মিক জিজ্ঞাসায় অবাক হল দক্ষ।

কি জবাব দেবে ভেবে পায় না ? সংশয়ের চোখে তাকাল তার দিকে। বিব্রতমুখে তার অসহায় ভাব ফুটল। বিভ্রান্ত স্বরে বলল ঃ তোমার কি হয়েছে বলত ? তুমি কি ঝগড়াই করবে শুধু ? অথচ,

তুমিও ভাল করে জান, দেবতাকে কল্পনা করা যায়, কিন্তু চোখে দেখা যায় না। তাকে স্পর্শ করাও যায় না, শুধু ধ্যান চক্ষুতে উদ্ভাসিত হন তিনি। শূন্যলোকের বাসিন্দা মাটির বুকে চরণ ফেলে চলে না। দিনের পর দিন মানুষের সঙ্গে বসবাস করার সময় হয় না দেবতার। প্রতিদিনের মেলামেশায় দেবতার মহিমা ক্ষুন্ন হয় বলেই তিনি মানুষের সংস্রব থেকে দূরে থাকেন। মানুষের ঘরে জামাতা হওয়ার স্বপ্ন দেখেন না তিনি।

সরোবরের মত শান্ত স্থির দুই চোখে দক্ষিণার দ্বিধা সংশয়ের ছায়া। সহসা কোন জবাব দিতে পারল না সে। দক্ষিণাকে চুপ করে থাকতে দেখে খুশি হল দক্ষ। দক্ষিণা বুদ্ধিমতী, চতুরা, বাক্যপটীয়সী। তর্কে হারানো তাকে শক্ত। সেই কঠিন কাজটি সম্পন্ন হওয়ার আনন্দ পলকের জন্য তাকে বিহ্বল করল। উজ্জ্বল চোখে তার কৌতুকের ঝিলিক। বলল ঃ প্রবাদ আছে, দেবতা আকাশ থেকে নেমে আসে তার পশুতে টানা শকটে আরোহণ করে। কোথায় সে শকট? আসলে এ একজন পথভ্রষ্ট কোন পাহাড়ী দস্যু, অথবা কোন বণিক।

দক্ষিণা চমকায়। জিজ্ঞাসা এবং ভাবনায় তার মন তোলপাড় করে। দক্ষের চোখের কৌতুকে রহস্য। জিজ্ঞাসার সুরে বলল ঃ তার বাবড়ী করা চুলে সমুদ্রের ঢেউ, চোখে আকাশের নীলিমা, মুখখানিতে প্রভাত সূর্যের লালিমা। সারা অঙ্গে তার আলোর জ্যোতি তবু সংশয় তোমার।

আমার জিজ্ঞাসার কিন্তু কোন জবাবই তুমি দিতে পারলে না রাণী?

জবাব হয় না বলেই কথা বাড়ায়নি।

তাহলে তুমিও স্বীকার করলে যুবক দেবতাদের কেউ নয়

চুপ করে থাকার অর্থ কখনই তা নয়, এটা মহারাজার জানা উচিত ছিল। অবাস্তব অবাস্তব কল্পনা দিয়ে তোমরা লোক ঠকাচ্ছ। মানুষকে বিভ্রান্ত করছ। আত্মশক্তিতে তাকে অবিশ্বাস করছ। মানুষকে দাবিয়ে রাখার এই রহস্যের জাল বিধাতা একদিন নিজের হাতে ছিঁড়ে লণ্ডভণ্ড করবেন। আমি শুধু সেই দিনের অপেক্ষায় আছি।

॥ ছয় ॥

সুমের-এ কশ্যপের হয় চালনার সুনাম ছিল। কালিবঙ্গান, চানহুদড়োয় কোন হয় সে দেখেনি। যাতু কিমিদিন পাহাড়ী দস্যুদের কাছে সে প্রথম হয় দেখল। হয় পৃষ্ঠে তারা লুটপাট করে চোখের নমেষে উধাও হয়ে যায়। একদিন অকস্মাৎ তাদের মুখোমুখি হল। এটা তার ভাগ্যের লিখন। মনে মনে সেই সময় হয়ের একটা ভীষণ প্রয়োজন বোধ করছিল। বিধাতা তার চাওয়াটা সব সময় বুঝেই যেন ব্যবস্থা করেছেন। ধূলো উড়িয়ে উল্কার বেগে দস্যুরা যখন চানহুদড়োর দিকে ছুটে আসছিল তখন তাদের সুন্দর হয় দেখে মনে মনে সেগুলি পাওয়ার লোভ হয়েছিল তার। কিন্তু সেই মুহূর্তে নারীদের গগনভেদী আর্ত চিৎকার দৌড়-দৌড়ি তাকে কেমন বিভ্রান্ত এবং বিচলিত করে তুলেছিল। লোভের কথা বেশি করে ভাববার মত অবস্থা ছিল না। দস্যুরা বন্দী হলে সে হয়গুলিকে লুকিয়ে ফেলেছিল। ইচ্ছে ছিল এই হয় পৃষ্ঠেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিদর্শন করবে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্য। তাই এদেশের মাটি মানুষের আকর্ষণে বাধা পড়ল।

অনেকটা দূর ছুটে এসে কশ্যপ একটা পাহাড়ের ধারে গিয়ে থামল। স্থানটি নির্জন এবং নিরিবিলি বিচার করে হয় পৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করল। নিকটের একটি জলা থেকে হয়কে জল পান করাল। তারপর রজ্জু বন্ধন করে তৃণক্ষেত্রে ছেড়ে দিল। আর, সে বিশ্রাম নেবার জন্যে একটি বৃক্ষের ছায়ায় শয়ন করল। খুব অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের ঘোরে শুনতে পেল দনুর কণ্ঠস্বর—প্রিয়তম শৃগালের ভয়ে তুমি হয় পৃষ্ঠে পলায়ন করছ ! যুদ্ধে জয় পরাজয় হয় শক্তির পরীক্ষায়। কিন্তু মহাবীর দেবপুত্র কশ্যপকে অবশেষে হয় পৃষ্ঠে পলায়ন করতে হল। ছিঃ। লোকে ধিক্কার দেবে। তোমার সে নিন্দা সইব কেমন করে ?

দনুর অন্যতম পরিচারিকা অরিষ্টা তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল কশ্যপের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। মৃদু-মৃদু হাসছিল। ছায় ছায়া মূর্তি তার। বায়ু স্বরে বলল: পলায়ন বলছ কেন রাজকুমারী' বাহনহীন দেবপুত্র এবার তার বাহন পেলেন। ভারী সুন্দর মানিয়েছে তাঁকে। হয় নিয়ে তিনি স্বর্গের পথে রওনা হয়েছেন। ধুলোর মেঘের মধ্যে হারিয়ে গেলেন তোমার স্বপ্নে দেখা রাজকুমার।

—দনু বলল: স্বপ্ন কখনও সত্য হয় না অরিষ্টা।

অরিষ্টা বলল: স্বপ্ন বলছ কেন রাজকুমারী? এবার দেবপুত্র মেঘের দেশ থেকে হয় পৃষ্ঠে নেমে আসবেন। তখন আর চিনতে অসুবিধা হবে না। তুমিও ভুল করবে না।

ওদের কথাবার্তার ভেতর দিতি যে কখন এসে দাঁড়িয়েছিল কেউ জানে না। সে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সকলে ফিরে তাকাল তার দিকে। দিতি বলল: পৃষ্ঠে তূর্ণপূর্ণ তীর ধনু আর দক্ষিণ করে ভল্ল নিয়ে দেবপুত্র যখন হয় ছুটিয়ে যায় তখন সারা শরীরটা চলার ছন্দে টগ্‌বগ্‌ করে। দেখে, চোখ জুড়িয়ে যায়। মন ভরে থাকে ঐ ছবিটা। কী সুন্দর হয় চালনা তার।

দনু তৎক্ষণাৎ ভ্রূকুটি করে দিতির দিকে তাকাল। নিজের মনের বিস্মিত জিজ্ঞাসায় অন্যমনস্ক হতে গিয়ে কণ্ঠস্বরে তার তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনার সুর বাজল।—আমি একজন বীরকেই স্বামীরূপে নির্বাচন করেছি। পশুর সাহায্য নিয়ে যুদ্ধে জয়লাভ করা বীরের উপযুক্ত কাজ নয়। আমাদের দেশে কোন বীর পশুকে তার শক্তি পরীক্ষার কাজে লাগায় না। তারা নিজেদের বাহুবল, বর্শা আর তীর ধনু নিয়ে যুদ্ধ করে।

দিতি প্রতিবাদ করল। বলল: ভগিনী, বনের পশুদের সঙ্গে কিন্তু খালি হাত পায়ে কেউ যুদ্ধ করে না।

আচমকা তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। একটা করুণ সুরের গান ভেসে এল তার কানে। তন্দ্রায় জড়ানো চোখে নিবিড় ঘুম নেমে এসে খোলা চোখের পাতা ধীরে ধীরে বুজিয়ে দিল। পরক্ষণে সচেতন মনে কি একটা অনুভূতির ধাক্কা লেগে তার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়-মড় করে

উঠে বসল। চতুর্দিকে একদল কৃষ্ণকায় কুৎসিৎ দর্শন মানুষ তাকে ঘিরে আছে। কশ্যপ উঠে বসতে একজন হৃষ্ঠ-পুষ্ট খর্বকায় লোক তার সামনে জোর হাত করে দাঁড়াল। কপালে সে মাটি দিয়ে ত্রিশূল এঁকেছিল। লোকটির পোশাক-পরিচ্ছদ অদ্ভুত। পুরুষটি দলপতি সুলভ গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল ঃ হে ভগবান, দাসের প্রণাম নাও। আমি দলপতি আতঙ্ক। এরা আমার অনুগত, বশীভূত। আর তুমি আমাদের রাজা। আমাদের ভগবান। ঈশ্বর তোমাকে আমাদের দুর্দ্দিনে পাঠিয়েছে।

কশ্যপ একটা লম্বা হাঁই তুলে জড়ানো গলায় প্রশ্ন করল—তোমরা কারা ?

দলপতি আতঙ্ক বলল—আমরা চানছদড়োর খেটে খাওয়া মানুষ, ভূমিহীন মানুষের দল। আমাদের থিত-ভিত, কিছু নেই।

কশ্যপ অবাক হয়ে দলপতির দিকে তাকাল। কিছু একটা বলার জন্যে ঠোঁট উন্মুক্ত করল। পরক্ষণেই তীক্ষ্ণ বিদ্ধ সন্দেহে সে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। চানছদড়োর যে দিকে তাকিয়েছে সেই দিকেই বিত্ত-বৈভব ঐশ্বর্যের চিহ্ন। চোখ জুড়োন দিগন্তব্যাপী সবুজ ফসলের ক্ষেত। লোকসংখ্যার তুলনায় কৃষির উৎপাদন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। গম, ভুট্টা, যব, মটর, কলাই প্রচুর ফলে। কার্পাসও হয় খুব। খাদ্য-শস্যের কোন অভাব কোথাও দেখেনি। গ্রামের মানুষ সবাই বিত্তশালী নয়। তবু প্রত্যেকের ঘরে প্রচুর গাভী আছে। উৎপাদিত পণ্যের বিক্রীর বাজার সর্বত্র। মানুষকে সুখে, শান্তিতে নিশ্চিন্তে পরিতৃপ্তিতে কাল কাটাতে দেখেছে। তা-হলে এরা কেন নিজেদের অভাবী মানুষ বলল ? কেনই বা তারা এল এখানে ? কি তাদের উদ্দেশ্য ?

অনুসন্ধিৎসু চোখে আতঙ্কের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ তোমরা এখানে এসেছ কেন ?

হাত কচলাতে কচলাতে আতঙ্ক জানাল ঃ ক্ষুধা আমাদের তাড়িয়ে এনেছে। জমিতে যা ফলাই, রাজপুরুষেরা সব কেড়ে নেয়। তারা বলে, ঈশ্বরের জমিতে ফসলের সব অধিকার রাজার পুরোহিতের

আর সামন্তের। এত ফসল তৈরী করেও আমাদের দুঃখ ঘুচ্ছে না. আরো গরীব হচ্ছি। দিনের পর দিন রাজপুরুষদের দাবি বাড়ছে বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু শস্য আমরা পাই সেটুকুও নেবার জন্য বাড়তি জুলুমের শেষ নেই। জীবন আমাদের দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। তাই নতুন ভূমির সন্ধানে আমরা কয়েক গ্রামের লোক এসেছি। এ মাটি এ জমি আমাদের পূর্বপুরুষ তৈরী করে রেখে যায়নি। রাজাও দেয়নি। ঈশ্বর দিয়েছে। এর ফসল আমাদের। এই জমি, এই ফসল কাউকে দেব না। জীবন পণ করে এ মাটির দখল রাখব আমরা। তুমি দেব্‌তা। তোমার কাছে চাই, অবিচার অত্যাচারের প্রতিকার।

কশ্যপ হাসি হাসি মুখ করে জিজ্ঞেস করল—আমাকে তোমরা চিনলে কেমন করে ?

আতঙ্ক বলল ঃ অরণ্যে প্রবাদ আছে, ধুলো উড়া পথ ধরে দেবতা আসেন পৃথিবীতে। ফল পেকে গেলে নিজের নিয়মে যেমন পড়ে, তেমনি পাপ জমে উঠলে দেবতাও নিজের নিয়মে আসে।

কশ্যপ স্তম্ভিত হল। মুগ্ধ চোখে অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা—তোমাদের শংকার কারণ কি ?

আতংকের দুই চোখ খদ্যোতের মত জ্বলতে লাগল। চাপা উত্তেজনায় তার গলার স্বর কাঁপছিল। বলল ঃ চানছদড়োর দুর্গাধ্যক্ষের নজর পড়েছে আমাদের সোনার ক্ষেতের উপর। আমাদের সুখের কাঁটা ওরা চিরকাল। রাজার কাছে খবর দিয়েছে শালা। এই জমি ও ফসলের উপর আমাদের অধিকার কেড়ে নেবে বলে শালারা তৈরী হচ্ছে। মুখে তাদের পুরোন বুলি, রাজার সীমানায় সব জমি ঈশ্বরের। অন্য কারো অধিকায় নেই তার উপর। শোনো দেবতা, ওদের কোন কথাই আমরা মানি না। মানব না। আমরা রক্ত জল করে এ জমি তৈরী করেছি, এর বুকে সোনা ফলিয়েছি। আমাদের মেহনতে একটা সুন্দর সুখী সমৃদ্ধ গ্রাম গজিয়ে উঠেছে। আমরা সকলে মিলে তৈরী করেছি স্বপ্নের গ্রাম। তুমি রাজা হয়ে আমাদের রক্ষা কর। যাতু, কিছুদিন দস্যুদল তোমার হাতে মার খেয়ে দস্যুবৃত্তি বন্ধ করেছে।

এবার যে সব ধনীরা গরীবদের মারছে, রাজা মারছে প্রজাকে, সেইসব সমাজবিরোধীদের মেরে তাদের সুখের ঘর, পাপের বাসা ভেঙেচুরে সমতল করে দিয়ে তোমার ন্যায় রাজত্ব বসাও ; হে দেবতা।

কশ্যপের বাক্যস্ফূর্তি হল না। দুই চোখে তার নিবিড় বিহ্বলতা। চানছদড়োতে আনন্দ বিভ্রমতা বিলাস আনন্দ উৎসবের হুল্লোর দেখে কে ভাববে দেশের অভ্যন্তরে একদল না খেতে পাওয়া চিরবঞ্চিত মানুষের বুকে আগুন জ্বলছে ? আনন্দে উত্তেজনায় তার বক্ষস্পন্দন দ্রুত হয়ে গেল। বলল ঃ সংঘর্ষ যদি অনিবার্য হয়।

তা-হলেও আমরা লড়ব তোমার পাশে। মৃত্যু যদি ললাট লিখন হয় তবে সৈনিকের মতই যুদ্ধ করতে করতে রণক্ষেত্রে প্রাণ দেব। সে মৃত্যুর মধ্যে গৌরব আছে, আত্মমর্যাদা আছে। অন্ততঃ জানব জীবন ধর্ম, মানবধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছি। বীরের মত মরেছি।

কশ্যপ অভিভূত। চক্ষু বন্ধ করে ধ্যানস্থ যোগীর মত স্থির হয়ে বসে রইল। তার নির্বাক পাষাণ মূর্তির মধ্যেও মুখের একটা কঠিন-ভাব ফুটে উঠল। দনু, দনু, দনু এই নামটা শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে বুকের মধ্যে উঠা নামা করছিল। দনুর চিন্তায় তার মন আচ্ছন্ন হল। দনু অপরূপা। মেঘবরণ তার চুল, সন্ধ্যার মত স্নিগ্ধ তার বর্ণ, তারার মত শান্ত উজ্জ্বল দুই চোখ, লতার মত বাহু, সুউচ্চ দুই গিরির মত তার স্তন, শস্যক্ষেতের মত লাবণ্য। তার সে লাবণ্য যে দেখবে সেই মজবে। তার মোহ ত্যাগ করা কঠিন। জিনদাস তাই বাগদান প্রত্যাহারে রাজি নয়। সিন্ধুদেশের নারীর দ্বিচারিণী হওয়ার কোন দোষ নেই। বনের মৃগের মত তারা স্বাধীন। স্বচ্ছন্দ তাদের প্রেম। বিবাহ কেবল সম্বন্ধ স্থাপন করে। জিনদাস দনুর সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধই চায়। পুত্রের দাবি প্রতির সমর্থন ছিল দুর্বাণের। রাজ-পুরোহিতের আকাংখা অমান্য করা কিংবা তার বিরুদ্ধাচরণ করা দক্ষ কল্পনাও করে না। কেবল দনুর প্রসবকাল পর্যন্ত কালহরণের সময় দুর্বাণ তাকে দিল। সেই সময় পূর্ণ হতে আর মাত্র দুটি ঋতু বাকী।

তারপর, দনুর সাধ্য নেই তুর্বাণকে অমান্য করে। দক্ষ নাম মাত্র রাজা। কার্যত রাজপুরোহিত তুর্বাণই সব। তার রক্ত চক্ষুতে দেশে অগ্নিবৃষ্টি হয়, মানুষ রক্তপাতে মারা যায়। তাই, তুর্বাণের ক্রোধ সকলে এড়িয়ে চলে। তুর্বাণই দেশটাকে শাসন করছে। রাজা, দুর্গাধ্যক্ষ, সামন্তাধিপতি সকলেই তার খুঁটি। সিংহাসনের আড়ালে বসে সুতো টানাটানি করে দক্ষকে উঠানো, বসানো, নাচানোর অনেক গুরুতর কাজ করছে। নেপথ্যের এই রহস্য কশ্যপ ভাল করেই বুঝে ফেলেছে। তুর্বাণের কবল থেকে দনুকে উদ্ধার করতে হলে চাই সর্বাত্মক সংগ্রাম। এই সব আত্মনিবেদিত বঞ্চিত লাঞ্ছিত ভাগ্যহীন মানুষই হতে পারে তার একনিষ্ঠ সৈনিক। এদের পাশে পেলে দনু উদ্ধারের কাজে আর কোন বাধা হবে না। আসন্ন দনু মুক্তির স্বপ্ন আনন্দ তাকে রোমাঞ্চিত করল। বুকের মধ্যে তার আশার নাকাড়া বাজতে লাগল।

কশ্যপের অন্যমনস্ক নিবিষ্টতা দেখে আতংক ভয়ে ভয়ে উচ্চারণ করল ঃ দেবতা! প্রসন্ন হও। কৃপা কর। আমরা যুদ্ধ জানি না, মরতে জানি।

কশ্যপের আচ্ছন্নভাব কাটল। চোখের তারায় অনির্বচনীয় খুসির দীপ্তি। উত্তেজিত আনন্দে আতঙ্ককে বুকে জড়িয়ে ধরল। বলল ঃ বন্ধু, অনিয়মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো জীবনের পরমধর্ম। তোমাদের ধর্ম পালনে বাঁধা দেব সাধ্য কি? বিধাতার ন্যায়রাজ্যে অন্যায়কে ধ্বংস করার শপথ নাও তা-হলে। বল, শত্রুর কাছ থেকে আমরা আমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেব। প্রাণ দেব, তবু অধিকার ছাড়ব না।

কশ্যপের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তারাও শপথ পাঠ করল। সেই স্বর গিরিগাত্রে প্রতিহত হয়ে প্রতিধ্বনিত হল। বহুদূর পর্যন্ত শোনা গেল। কশ্যপের নতুন দলের নাম হল কাশ্যপেয়।

তারপর থেকে কশ্যপ বদলে গেল। সর্বক্ষণ তাদের সমর শিক্ষণের কার্যে সে ব্যাপৃত। কাশ্যপেয়দেরও সোমরস পানের নেশা ছুটে গেল। তারা এখন আর ঝিমোয় না, কর্মের গতিবেগে চঞ্চল। যৌবন তাদের দুরন্ত, জীবন অস্থির, বাসনা অসীম। জীবনের প্রতি মুহূর্ত তারা সার্থক

ও সুন্দর করে পাওয়ার জন্যে বীরধর্মের সাধনা করছে। ভয়াল ভয়ংকর আবর্তের মধ্যে বীর অকুণ্ঠ উৎসাহে নির্ভয়ে ঝাঁপ দেয়, যুদ্ধের তাণ্ডবের সামনে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও সে পিছোয় না। ক্ষণস্থায়ী জীবনে সে দেবোপম হতে চায় আত্মদানের মহিমায়। বীর চরিত্রের এই আকাংখা বৈশিষ্ট্য কশ্যপ তাদের চরিত্রে, সত্তার জীবনের আকৃতিতে মুদ্রিত করে দিল। যুদ্ধে রক্তপাত আছে, যন্ত্রণা আছে, কষ্ট আছে, তবু বীর হাসিমুখে তাকে বরণ করে নেয় অমরত্বের প্রয়াসী হবে বলে। মানুষ মরণশীল, কিন্তু বীরের বীরত্ব মৃত্যুকে উত্তরণ করে। অমরত্ব পায়। স্মৃতির সিংহাসনে তার অক্ষয় প্রতিষ্ঠা।

খুব অল্পদিনেই প্রতিটি কাশ্যপেয় হয়ে উঠল দুর্ভেদ্য সৈনিক। ছুটন্ত হয়ের পৃষ্ঠে দৌড়ে কেমন করে আরোহণ করে ঝড়ের বেগে ছুটতে হয়, শত্রুর বর্শা প্রতিহত করে, নিজের বর্শায় কি করে তাকে আঘাত হানতে হয়, তার কৌশল শেখাল। অসি হাতে শত্রু বেষ্টনী ভেঙ্গে নিজেকে অক্ষত রেখে এগোনো এবং তীরের ছত্র তৈরী করে স্বপক্ষীয় সৈন্যদের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখা হয়—এসবই তারা দ্রুত আয়ত্ত করল। শিঙার বিভিন্ন আওয়াজে পৃথক পৃথক অর্থ ও তাৎপর্যের সংকেতও তারা জানল। তাদের কর্মতৎপরতায় কশ্যপ বিস্মিত হল। তাদের সাফল্য তার বুকে আশার প্রদীপ জ্বালল।

কামারশালায় তৈরী হতে লাগল অস্ত্র। উল্কাপিণ্ড এবং আগ্নেয়গিরির লাভা উত্তাপে গলিয়ে একরকম শক্ত ধাতু তৈরীর কৌশল জানত আতংক। সে ধাতু শক্ত এবং মজবুত ছিল। পাথর বিদীর্ণ করবার শক্তি ছিল তার। আক্রমণের পক্ষে খুব কার্যকরী এবং নির্ভরযোগ্য অস্ত্র হল। দুর্গম অরণ্যে তৃণাঞ্চল থেকে অনেকগুলি হয় ধরে কশ্যপ তাদের পোষ মানাল। তাদের হয়ের সংখ্যা হল বিশটি।

কশ্যপ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত! বড় রকম আক্রমণ রচনার আগে সে দুর্বাণের মনোবল এবং আত্মশক্তি ক্ষয় করার জন্য চানছদড়োর প্রজাদের অসহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করল। তারপর, সংগ্রামের সময় কেমন করে আক্রমণ রচনা করবে, সৈন্যবাহিনীর কে কোথায় অবস্থান

করবে তার একটা ছক ও পরিকল্পনা তৈরীর জন্যে ছদ্মবেশে সে একা বেরোল।

রাজ্যের সীমান্তে কশ্যপের গোপন কার্যকলাপ ও প্রস্তুতি তুর্বাণের অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু তাকে বাধা দেবার মত সৈন্যবল দানবদের নেই। দীর্ঘকাল তারা প্রাচুর্য এবং সমৃদ্ধির মধ্যে নিশ্চিন্তে সুখে শান্তিতে পরিতৃপ্তিতে বসবাস করে যুদ্ধ বিদ্যা ভুলে গেছে। কশ্যপ এই সুযোগটাই নিয়েছে। তাই সীমান্ত এলাকা থেকে সে হামলা সুরু করেছে। চানছদড়োর কৃষকরা রাজার প্রাপ্য, জমিদারের ভাগ, পুরোহিতের অংশ অতিরিক্ত রাজস্বদানে অস্বীকার করছে। এসব যে কাশ্যপেয়দের প্ররোচনা একথা বুঝতে কষ্ট হল না তুর্বাণের। রাজ্য চালাতে হলে জননীর ধৈর্য, সহিষ্ণুতা দরকার এ বোধ তার আছে। যুদ্ধ এবং সংঘর্ষ এড়িয়ে চলাই তার নীতি। কশ্যপ তার বরফ কঠিন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ভাঙার জন্যে রাজকোষ শূন্য করে তাকে দুর্বিপাকে ফেলার কৌশল এঁটেছে। রাজনৈতিক সংঘর্ষকে অনিবার্য করে তুলেছে। তবু অবাধ্য প্রজাদের শাস্তি দেয়া যাবে না। কশ্যপ তাদের পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ খুঁজছে। ধৈর্যচ্যুত হয়ে তুর্বাণ তাকে সে সুযোগ দেবে না। স্বেচ্ছায় নিজের পতন না ডেকে আনার কৌশল নিল সে। কশ্যপের চলাফেরার উপর বাঁধা নিষেধ আরোপ করে তার গতিরোধের চেষ্টা করল। গুপ্তচর লাগাল। রাজকোষ সৃষ্টি করার জন্য তার মস্তকের মূল্য ঘোষণা করল। কিন্তু এইভাবে অরণ্যের শার্দ্দুল্যকে কতদিন আটকাবে আর? জয়-পরাজয়ের একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার জন্যে সে, কাশ্যপেয় দলের স্তম্ভ কশ্যপকে কৌশলে বন্দী করার ফন্দী আঁটল।

কিন্তু কৃতকার্য হওয়া নিয়ে অজস্র সংশয় এবং দ্বিধায় সে বিভ্রান্ত। কশ্যপ কে? দেবপুত্র, না মানুষ। দেবপুত্র বলে স্বীকার করতেও কুণ্ঠা আবার মানুষ বলে মানতেও তার সংশয়। মানুষের কাজের একটা

সীমা আছে। কিন্তু কশ্যপের কার্যের কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। কশ্যপ এক চিরবিস্ময় তার কাছে। তবু তুর্বাণ তার সংগে সংঘর্ষ অব্যাহত রেখেছে। এটা তার মর্যাদার লড়াই। তাই দনুকে তার পিতার বাগদান থেকে সে মুক্তি দেবে না। দনু দেবপুত্রের একমাত্র বন্ধন। দেবপুত্র কশ্যপ কেন মানবকন্যার মোহ আকর্ষণের নাগপাশে বন্দী, বুঝতে পারে না। স্বর্গবাসী দেবতার এই লীলার ভেতর যে রহস্য লুকিয়ে আছে তা উদঘাটন করে মর্যাদার লড়াইতে জিততে হবে তুর্বানকে। শুধু এই আশাতেই সে বুক বেঁধেছে।

কশ্যপ তার পৌরহিত্যের মহিমা খর্ব করছে। পুরোহিতের শাশ্বত মহিমা এবং নানারকম মিথ্যা অলৌকিক ক্ষমতা বিপন্ন হওয়ার আশংকায় সে কশ্যপকে বৈরী ভাবল। বহুপুরুষের অর্জিত পুরোহিতের মর্যাদা হারিয়ে কি নিয়ে থাকবে সে? তাই কশ্যপের বিরোধিতা করার স্পর্ধা প্রকাশ করে তার স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করতে চায়। কশ্যপের দেবত্বের প্রতি সন্দেহ পোষণের এই অধিকার চমক সৃষ্টি করে তুর্বাণ মানুষের মনে তার আসনকে অক্ষয় করে রাখার স্বপ্ন দেখল। দনুকে তার ও কশ্যপের সংঘর্ষের মধ্যবর্ত্তিনী করে জনগণের আকর্ষণ ও কৌতূহলকে জীইয়ে রাখার এক অদ্ভুত খেলায় মাতল তুর্বাণ। কিন্তু যাদের জন্য এই খেলাটা তারা কোন আকর্ষণ বোধ করল না। তাদের বিভ্রান্তি দূর করবে তুর্বাণ কি দিয়ে? কি করে বোঝাবে কশ্যপের চাতুরী, আর তার আশ্চর্য-যাদু কে? কি দিয়ে? বিশ্বাস জাগানোর মত কোন ঘটনা সে খুঁজে পেল না। পাবে কোথা থেকে? চোখের উপর তার ভেসে উঠল এক অদ্ভুত আশ্চর্য ঘটনার ছবি। যার বিস্ময় সে নিজেও ভুলবে না কখনও!

গভীর রাত্রে প্রাসাদ অভ্যুত্থান করে দক্ষের সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাকে বন্দী করল। তার দুই সূর্যোদয়ের পর কশ্যপকেও প্রহরীরা বন্দী করল। কশ্যপের দেবত্ব নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে কোন সংশয় কিংবা দ্বিধা ছিল না। তাদের বিশ্বাসই তুর্বাণকে ঈর্ষান্বিত করল। প্রভাব হারাণোর আশংকায় সে বিচলিত। জনগণের বদ্ধমূল

ধারণাকে কুঠারাঘাত করার জন্য লিঙ্গ পূজার উৎসব প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি বাঁশের খাঁচায় তাকে শৃংখলিত করে সকলের দর্শনের জন্য খাঁচাটি একদিন আগে ঝুলিয়ে দেযা হল। কিন্তু কশ্যপ তাতে একটুও বিচলিত কিংবা অস্থির হল না। সে নির্বিকার, নির্লিপ্ত, উদাসীন। সারারাত্রি ধরে আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের দিকে একভাবে একমনে তাকিযে থেকে কি যেন তন্ন তন্ন করে খুঁজছিল। আর, বিড় বিড় করে তাদের সঙ্গে সমানে কথা বলছিল। তারপর, যামিনী অবসানে সে কখন ঘুমিযে পড়েছিল জানে না।

উৎসবের প্রাঙ্গণে কৌতূহলিত জনতার কোলাহলে তার নিদ্রাভঙ্গ হল। এক প্রবীণা মহিলা কশ্যপের দুর্গতি দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। গাযে হাত বুলিযে দিল। বলল: বাছা, সত্যি তুমি যদি দেবতা হও তা হলে তোমার ক্রোধে পৃথিবী অন্ধকার হোক। চরাচর অন্ধকারে ঢেকে যাক। তোমার এই দুর্দ্দশা আমি আর দেখতে পাচ্ছি না। দেবতার কষ্টে আমার দম আটকে আসছে। বলতে বলতে প্রবীণা সেখানেই মূর্ছা গেল।

কশ্যপ চমকে উঠল। উত্তেজনায় তার নীল চক্ষুতে রক্ত সঞ্চার হল। কম্পিত কণ্ঠে চীৎকার করে বলল: শোন উৎসবের মানুষ. প্রবীণার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হবে। অল্পকাল মধ্যেই দিবাকরের আলো ম্লান হয়ে আসবে। গাঢ় তমিস্রার মধ্যে ডুবে যাবে বিশ্ব। পাখীরা কুলায় ফিরবে, ধেনুরা হাম্বা হাম্বা করতে করতে পুচ্ছ তুলে গোঠে ফিরবে।

কশ্যপের দর্পিত ঘোষণা শুনে তুর্বাণ খুব হেসেছিল। তার হাসিতে জনগণের বুকের রক্ত হিম হযে গেল। ঘোর অমঙ্গল আশংকায় কশ্যপের সামনে তারা করজোড় করে দাঁড়িযে তার করুণা প্রার্থনা করল। সেই দৃশ্য দেখে তুর্বাণের সর্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলে গেল। ঈর্ষায় উন্মাদ হয়ে সে প্রহরীদের বেত মারতে আদেশ দিল। জনতা ছত্রভঙ্গ হল।

কিছু পরেই সূর্যের উজ্জ্বল আলো নিস্প্রভ হয়ে গেল। অন্ধকার

ক্রমে নিবিড় ও গভীর হল। আকাশে দু'একটি করে তারা ফুটল। পাখীরা কুলায় প্রত্যাবর্ত্তন করল। বিস্ময়ে তুর্বাণ হতবাক।

উত্তেজিত জনতার ক্রুদ্ধ আস্ফালন উন্মত্ত সাগর কল্লোলবৎ প্রতিভাত হল। অন্ধকারের ভেতর রব উঠল ঃ মার, মার পুরোহিত তুর্বাণকে। পাষণ্ড, মূর্ত্তিমান পাপকে হত্যা কর। ও আমাদের দেবতাকে ক্রুদ্ধ করেছে। আগুনে ওকে নিক্ষেপ করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।

তখন তুর্বাণ অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেছিল। কশ্যপের কাছে পরাজয়ের এই গ্লানি তার বুকে ধিকি ধিকি জ্বলতে লাগল। এই অপমান সে কোনাদন বিস্মৃত হবে না। কশ্যপ তার শত্রু। চিরশত্রু। প্রকৃতপক্ষে সেদিন রাহু এসে ঢেকেছিল সূর্যকে। তাই এই ক্ষণিক অন্ধকার। কশ্যপ গণনা করে রাহু সূর্যের নিভু'ল অবস্থান বার করেছিল। মানুষের অজ্ঞতাকে ধারাল অস্ত্র করে সে তুর্বাণকে বিদ্ধ করল। কিন্তু এতবড় পরাজয়কে তুবাণ নীরবে মেনে নেবে কেমন করে? রাজদণ্ড, রাজকোষ, তার হাতে। আছে তার অসংখ্য প্রহরী। দুর্বিনীত উদ্ধত জনতাকে শিক্ষা দেবার জন্যে মাঝে মাঝে শাসনকে কঠোর হতে হয়। অত্যাচারে অত্যাচারে জর্জরিত করে তাদের বোঝাবে কশ্যপ ভগবান নয়, তাদের পরিত্রাতাও নয়। সে একজন চতুর অন্যগোষ্ঠীর মানুষ। জনগণের ঘৃণা-বিদ্বেষ দিয়েই কশ্যপকে সে জব্দ করবে। তার সব গৌরব মর্যাদা ধূলোয় মিশিয়ে দেবে।

কশ্যপ দূরদৃষ্টি দিয়ে তুর্বাণের অভিপ্রায় এবং অভিসন্ধিকে পূর্বাহ্নে অনুমান করেই যেন আত্মগোপন করল। জনগণের উপর অত্যাচার করার কোন সুযোগ তুর্বাণকে সে দিল না। পাছে তাদের বিপদ হয় এই আশংকাতেই অন্তর্ধান করল। জনগণের মনে তার সম্পর্কে যে সব অলৌকিক বিশ্বাস ছিল তা অটুট রইল। হাতের তীর হাতেই রইল তুর্বাণের, আর ছোঁড়া হল না। এও তার আর এক পরাজয়। এই পরাজয়ের কষ্ট, দুঃখ, গ্লানি বয়ে বেড়ানো তার পীড়া-

দায়ক হল। কশ্যপ তার সঙ্গে এবার শেষ বোঝাপড়ায় আসবে বলে বিশাল সৈন্যবাহিনী গড়েছে। ধ্বংস, পতন তার আসন্ন। তবু, প্রদীপ নিভবার আগে দপ্ করে জ্বলে তারপর নেভে। তুর্বাণও তেমনি শেষ বোঝা পড়ার সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার আগে তাকে বন্দী করার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। দেখবে কে জেতে আর হারে ?

বিচিত্র ঘটনার মধ্যে দিয়ে কশ্যপের জীবনটা চলল। এ সবের অর্থ কি সে জানে না। তবু প্রতিদিনই নতুন কিছু একটা ঘটে। আকস্মিক ঘটনাসমূহ কখন কোনদিকে কিভাবে মোড় নেয়, কোথায় নিয়ে যেতে চায়, কি পরিণতি হবে এসব ভাববার মত অবসরও পায় না। ঘটনার আকস্মিকতা এবং পরিণতি উর্ণজালের মত একের পর এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অনুভূতির জাল বুনছিল তাকে নিয়ে। সমস্তটাই পূর্বপুরুষদের নিয়ে কিংবদন্তীর গল্পের মত। তথাপি জীবনের ক্রম-বিকাশের পথে এগুলির প্রত্যেকটিই যেন অপরিহার্য এবং প্রয়োজন। বিধাতা নিজের নিয়মেই তাকে গড়ে তুলেছেন। নইলে এমন অদ্ভুত আশ্চর্য ঘটনা একের পর এক মানুষের জীবনে ঘটে কি করে ?

এই দেশে একা সে। কোন বন্ধু আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না। থাকার আশ্রয়, আহারের সামগ্রী পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু সবই পেল সে। কোন কিছুর অভাব বোধ করল না। বাধাও হল না কিছু। যাত্রাপথে থেমেও পড়েনি কখনও। চলার পথে পেয়েছে নারীর প্রেম, স্নেহ-ভালবাসা ; মানুষের অসীম ভক্তিশ্রদ্ধা। আর পেয়েছে অভাবী মানুষের বন্ধুত্ব। সেও একটা গল্পের মত।

এমনি সব ভাবনার ভেতর দিয়ে চলছিল কশ্যপ। সহসা অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনে চমকে উঠেছিল সে। তার দলের কোন লোকজনের এখানে আসার কথা নয় তাহলে বায়ুবেগে অশ্ব পৃষ্ঠে কারা আসছে ? হয়ের ব্যবহার এ দেশের মানুষের ভাল জানা নেই। যাহু, কিমিদিন দস্যুদল ঝটিতি লুণ্ঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ করার জন্যে হয় ব্যবহার করে। তবে

কি সেই লুঠেরা আসছে ? কশ্যপ খোলা মাঠের পথ ধরে যাচ্ছিল। কাছাকাছি আত্মগোপনের কোন জায়গা পেল না। চার দিকে খোলা প্রান্তর। অল্প দূরে গাঁয়ের কুটীর। একবার ভাবল, সেইদিকে যায়। কিন্তু হয়ের পদধ্বনি নিকটতর হওয়ায় সে সুযোগ তার হল না। চোখের পলক পড়তে এক অশ্বারোহী যুবক এসে দাঁড়াল তার সম্মুখে। হাসি হাসি মুখ করে প্রসন্ন চোখে কশ্যপের দিকে তাকাল। যুবকটি দ্রুত তার পথরোধ করল কি করে ভেবে পেল না কশ্যপ? আশ পাশের ভূট্টার ক্ষেতে লুকিয়ে তবে কি অনুসরণ করেছে তাকে ? আরো একজন অশ্বারোহী বিপরীত দিক থেকে তার সামনে এসে দাঁড়াল। মুখে তার স্মিত হাসি। চোখে কৌতুক।

কশ্যপের কোন ভাবান্তর নেই। তার প্রশান্ত ডাগর দুই চোখে অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা। অশ্বারোহী যুবকদ্বয় কশ্যপের দিকে স্থির অপলক চোখে তাকিয়ে গদ গদ হয়ে বলল: দীর্ঘকাল আপনাকে অন্বেষণ করছি। অকস্মাৎ পথিমধ্যে আপনার সাক্ষাৎ লাভ করে কৃতার্থ হলাম।

যুবকদ্বয়ের দুই চোখে কৌতুক উছলে পড়ল। কশ্যপের সাড়া না পেয়ে প্রথম যুবকটি তার হয় নিয়ে কশ্যপের ঘা ঘেঁষে দাঁড়াল। চোখ টান টান করে বলল: আপনার নিরুত্তরে আমরা মর্মাহত হলাম।

তারপর হয় পৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করল।

কশ্যপের দৃষ্টি স্থির অপলক। যুবকদ্বয়ের আচরণ ও প্রশ্নে বিস্ময় লাগল তার। ভুরু কুঁচকে গেল। বলল: এরকম অভিযোগের অর্থ ?

অশ্বারূঢ় যুবকটি বলল: আপনার সাধারণ সৌজন্যবোধটুকু পর্যন্ত নেই।

কশ্যপ আগন্তুকদের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বলল: আপনাদের আগমন এবং আচরণের রহস্য ভেদে অসমর্থ আমি। পথিমধ্যে হয় দ্বারা পথ অবরোধ করে আমাকে অকারণ বিব্রত করার কারণ হেতু খুঁজে পাচ্ছি না। আপনারা রাজপুরুষ। যা ইচ্ছে তাই করার অধিকার আপনাদের আছে। কিন্তু আমার মত একজন সামান্য পরিব্রাজককে নিয়ে এই কৌতুক কেন ? কি লাভ হবে এতে ?

লোকদুটি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত হাসল। হাসিতে তাদের অবিশ্বাস, চোখের কোণে কর্ত্তব্যের সংকেত।

মুহূর্ত্তে কশ্যপের চেহারা বদলে গেল। অরণ্যের হিংস্র পশু মুখোমুখি হলে যেমন দুই চোখ খদ্যোতের মত জ্বলে, তেমনি তার দৃষ্টিপ্রখর হল, ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ, সাবধান হল। বাঁচার প্রত্যা দেহের সমস্ত বলকে সংহত করে যেমন অরণ্যে শার্দুলের আক্রম প্রতিহত করতে প্রস্তুত হত তেমনি একটা শক্তির দৃঢ়তায় তার চোয়া শক্ত হল, পেশী ফুলে উঠল। দেহের শিরায় শিরায় তরল রক্তস্রোত উ জল ধারার মত গড়িয়ে পড়ল! জীবন সংকটের প্রচণ্ড চাপে দেহে রক্ত সব মুখে জমা হল।

স্নায়ুর অসহ্য উত্তেজনাতেও সে সংযম হারাল না। কণ্ঠস্বরে তা অবিচলিত দৃঢ়তা এবং কাঠিন্য প্রকাশ পেল। প্রশ্ন করল তোমরা কারা?

লোকদুটির চোখের দৃষ্টিতে ধার। একটা কিছু করার পূর্বাভাস কশ্যপও সতর্ক। ঘাড়ের ভাঁজে বলিষ্ঠ দৃঢ়তা। দেহে অমি বল ও বিক্রমের ব্যঞ্জনা।

কশ্যপের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি সঙ্গীটির দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল: আমি যাতু ও কিমিদিন। তোমার বন্ধুত্ব চাই মহারাণী দক্ষিণার নিযুক্ত গুপ্তচর।

কশ্যপের চোখে সংশয়। বুকে অশান্ত তুফান। কিন্তু বাই তার কোন প্রতিক্রিয়া কিংবা আভাস প্রকাশ পেল না। কণ্ঠস্ব তার মেঘমন্দ্র ধ্বনি। নিরুত্তাপ গলায় বলল: আমি সামা পরিব্রাজক। তাঁর কাছে আমার কোন পরিচয়ও নেই। অযাচি ভাবে আমাকে তাঁর স্মরণ করার কোন কারণ আছে বলে'ত মনে হ না। তবু বল দূত; রাণীর আদেশ কি?

লোকটিকে রীতিমত অপ্রস্তুত দেখায়। সেই ভাবটিকে কাটিয়ে উ বলল: মহারাণীর নামাঙ্কিত এই শীলমোহরটি আপনার সন্দেহ দূ করবে। এটি তিনি আপনাকে সযত্নে রক্ষা করতে বলেছেন।

আশ্চর্য উজ্জ্বল অথচ দ্বিধাভরা চোখে লোকটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর কৌতূহলী হয়ে শীলমোহরটি গ্রহণ করবার জন্য হাত বাড়াল। অমনি পিছনের অশ্বারোহী অশ্বপৃষ্ঠ থেকে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আচমকা আক্রমণে কশ্যপ মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। অমনি দ্বিতীয় ব্যক্তিটি সজোরে তার মস্তকে আঘাত করল। আরম্ভ হল ধস্তাধস্তি। মুহূর্তে, কশ্যপ হয়ে উঠল অরণ্যের শার্দূল। তবু তারা দু'জনে কশ্যপের দুই হাত ধরে আটকে ফেলল। তখন মহাবীর কশ্যপ ধৃত হাত দুটি সবেগে প্রবল জোরে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এনে তাদের একজনকে নিজের মস্তক দিয়ে আঘাত করল। ত্বরিত ঝটিতি আক্রমণের আঘাতে লোকটি হাতের মুঠি শিথিল হয়ে গেল, সেই ফাঁকে ক্ষিপ্রগতিতে নিজেকে মুক্ত করে দ্বিতীয়জনকে প্রচণ্ড জোরে মুষ্ট্যাঘাত করে ধরাশায়ী করল। তারপর, তাদের অশ্বের পৃষ্ঠের উপর লাফিয়ে বসল। উল্কার বেগে ছুটল অশ্ব। ধূলোর ঝড় তুলে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তুর্বানের গুপ্তচরদের সজাগ দৃষ্টি এড়িয়ে সে খুব বেশি দূর যেতে পারল না। একটি পরিখার সামনে অশ্বটি থমকে দাঁড়াল। অন্তরাল থেকে পাঁচজন সশস্ত্র সৈনিক বেরিয়ে এল। শৃংখলাবদ্ধভাবে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। কোনরকম ভূমিকা না করে তাদের একজন বলল : তোমাকে আমাদের সঙ্গে আসতে হবে।

কশ্যপের মুখ একটু বিবর্ণ হল। কোনরকমে আত্মসংবরণ করে বলল : কোথায় ?

রাজপুরোহিত তুর্বানের প্রাসাদে।

তোমাদের নিশ্চয়ই বুঝতে ভুল হয়েছে সৈনিক। আমি সামান্য পরিব্রাজক। মহামতি তুর্বাণ আমায় নিয়ে যাবার হুকুম দেবেন কেন ? তিনি'ত আমাকে চেনেনই না।

কশ্যপের কোন কথা শুনল না তারা। অগত্যা তাদের সঙ্গে যেতে হল।

স্তব্ধতা বিরাজ করছিল কক্ষে। দক্ষ ও জিনদাস মুখোমুখি মাথা

নিচু করে বসেছিল। আরো যারা উপস্থিত ছিল তারাও সকলে নীরব। সমাধানহীন এক ভাবনায় সকলেই অস্থির এবং বিমূঢ়। উন্মুক্ত বাতায়ন পাশে দূরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল তুর্বাণ। কশ্যপকে নিশ্চিহ্ন করার সুখ স্বপ্নে সে মশগুল।

প্রহরীরা কশ্যপকে তুর্বাণের সামনে হাজির করল। ক্রুর হিংস্রতায় কুঁচকে গেল তুর্বাণের দুই ভুরু। চোখের দৃষ্টিতে তার প্রতিহিংসার আগুন। কশ্যপ দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইলো। আড়চোখে পর্যবেক্ষণ করে নিল চারদিক। তুর্বাণের পিছনে উন্মুক্ত গবাক্ষ। আর তার নীচ দিয়ে তর্‌তর্ করে বয়ে যাচ্ছে সিন্ধু। এটুকু পথ পেরোতে পারলে একটা উপায় করা যায়। কিন্তু পেছনে ষণ্ডা মার্কা সৈনিকরা পাহারায় আছে। হাতে তাদের সুঁচলো বর্শা।

তুর্বাণ কশ্যপের খুব কাছে এসে দাঁড়াল। ব্যঙ্গ করার জন্যে কৌতুক স্বরে বলল: এবার কোন ভেল্কী দেখাবে দেব্-তা? পালানোর সব রাস্তা বন্ধ। কোন্ অলৌকিক শক্তি বলে মুক্ত করবে নিজেকে? দেখাও তোমার দেবতার ক্ষমতা?

বিপদে কশ্যপ বুদ্ধিভ্রংশ হয় না। বরং পঞ্চেন্দ্রিয় আরো সজাগ এবং প্রখর হয়। একাগ্রতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাকে বিপদ উত্তরণের মনোবল ও শক্তি যোগায়। শুধু তাই নয়, বিচলিত বিভ্রান্ত অবস্থাকে সংবরণ করার এক আশ্চর্য সংযম ক্ষমতা তার আছে। নির্ভয়ে বলল: তুচ্ছ ক্ষুদ্র সামান্য ব্যাপারে অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করলে ধার ক্ষয়ে যায়।

কেউ কিছু বুঝবার আগে কশ্যপ চোখের পলকে তুর্বানকে প্রহরীদের দিকে ঠেলে দিয়ে এক লাফে খোলা বাতায়নের উপর উঠে বসল। দু'জন প্রহরী ছুটে গেল তার দিকে। কিন্তু ধরবার আগেই সে লাফিয়ে পড়ল নিচের প্রাঙ্গণে। হঠাৎ, একটা বর্শা এসে বিঁধল তার গোড়ালিতে। একটুখানি কেটে গিয়ে রক্ত বেরোল। কিন্তু কশ্যপ ভ্রূক্ষেপ করল না। উপরের বাতায়ণে শোরগোল শোনা গেল। সামনে কিছু দূরে একটা প্রাচীর, সেদিকে ছুটে গেল। পিছনে অনেক-

গুলো পায়ের একসঙ্গে শব্দ হচ্ছে শুনতে পেল। ফিরে তাকিয়ে দেখল একজন তাকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করতে উদ্যত। বর্শার গতির দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে নিজেকে রক্ষা করল। দ্রুত হাতে বর্শা তুলে নিয়ে পাশের প্রহরীকে আঘাত করে অন্য একজনের উপর ঝাপিয়ে পড়ে কেড়ে নিল তার অসি। অন্যজন এগিয়ে আসতেই তার আঘাত প্রতিহত করে যমালয়ে পাঠাল। অন্য একজনের বর্শার আঘাতে তার ডান হাতটা অল্প জখম হল। বাম হাত দিয়ে ক্ষতটা চেপে ধরে সে আর একজনের দিকে ধেয়ে গেল। তাকে জখম করে প্রাচীরের ফটকের দিকে দৌড়ল। অনেক প্রহরী তাকে ধরার জন্যে দৌড়ে এল। তাদের অস্ত্র রোদের আলোয় ঝলসে উঠল। তাদের এসে পৌঁছনোর আগে কশ্যপ প্রাচীরের ধারে একটি পাইন গাছ বেয়ে প্রাচীরের উপরে উঠল। সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ল প্রাচীরের অন্যদিকে। তারপর কিছুটা দৌড়ে গিয়ে সিন্ধুতে ঝাপিয়ে পড়ল।

সমস্ত ঘটনাটা পলকের মধ্যে দ্রুত এবং আকস্মিক ঘটে গেল। চোখের নিমেষে কশ্যপ যে কাণ্ডটা করল তা চোখে না দেখলে প্রত্যয় হয় না। লড়াই-এর চুম্বক আকর্ষণ তুর্বাণকে প্রস্তরবৎ আচ্ছন্ন করল। স্তব্ধ বিস্ময়ে জায়গাটা থমথম করছিল। তুর্বাণের বাক্‌শক্তি লোপ পেল।

দক্ষের অধর প্রান্তে অনির্বচনীয় হাসির স্নিগ্ধ দীপ্তি প্রতিপদের চাঁদের ক্ষীণরেখার মত শোভা পাচ্ছিল।

তুর্বাণের সত্যই অবাক হওয়ার পালা। মানুষ যে এত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বাছা বাছা যোদ্ধাদের সম্মিলিত আক্রমণকে ব্যর্থ করে সুউচ্চ প্রাচীর ডিঙিয়ে মুহূর্তে অন্তর্ধান হতে পারে, এর কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না তুর্বাণের। কশ্যপ তার সব ধ্যান-ধারণাকে ভেঙে দিল। এই বিস্ময়ই কশ্যপের ব্যক্তিত্বের রহস্য। সাধারণ জ্ঞান দিয়ে তাকে পরিমাপ করা কঠিন। এক অদ্ভুত আশ্চর্য মানুষ সে। কশ্যপ কে? সত্যিই কি দেব পুত্র সে? এই জিজ্ঞাসা তার মস্তিষ্কের বদ্ধ কুঠুরীর মধ্যে মাথা কুটতে লাগল। চিন্তার দিগন্ত তার ঝাপ্সা হয়ে গেল। চোখের উপর তার বিশাল অন্ধকারের ছায়া নামল।

অতঃকিম !!

নৈরাশ্যের তরঙ্গে তাড়িত হওয়া সত্ত্বেও চৈতন্য লুপ্ত হয় নি জিনদাসের। পিতার নিরুপায় অসহায় বিহ্বল নীরব দুই চোখের দিকে তাকিয়ে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। আকুল কণ্ঠে বলল ঃ পিতা! দেবপুত্রের সঙ্গে বিবাদ বাঁধিয়ে তুমি এ কি করলে? এখনও সময় আছে। দনুকে মুক্ত করে দাও। রুষ্ট দেবতার অভিশাপ থেকে একমাত্র সে পারে রক্ষা করতে।

তুর্বাণের কাণে কিছুই প্রবেশ করল না। অনুভূতি উপলব্ধি চেতনা তার লুপ্ত হল। স্থির মণিহারা দুই চোখে তার কোন সাড়া জাগল না।

কশ্যপ অনেকখানি সাঁতার দিয়ে ক্লান্ত বোধ করল। গোড়ালি, বাহুমূল এবং কাঁধের কাছে একটা ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করল। প্রতিকূল স্রোতে যেতে তার কষ্ট হচ্ছিল। জল থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে তীরের একটি তরুমূলে বসল। যন্ত্রণাটা এবার দুঃসহ এবং কষ্টদায়ক বোধ হল। এতক্ষণ এই যন্ত্রণা নিয়ে সে কি করে এতখানি সাঁতার কাটল ভেবে পেল না। কিন্তু এখানে এভাবে বসলেও চলবে না তার। তুর্বাণের শেষ অস্ত্র দনু। দনুকে দৈহিক নির্যাতন করে কশ্যপের উপর প্রতিশোধ নেয়া তার মত পাষণ্ডের কিছু অসম্ভব কার্য নয়। দনুর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করে কশ্যপের আত্মসমর্পণকে অনিবার্য করার কৌশল হয়ত তুর্বাণ করবে। এসব ভেবে কশ্যপ বিচলিত বোধ করল। তুর্বাণ সে সুযোগ পাওয়ার আগেই তার উপর আঘাত হানতে হবে তাকে। দলকে তৈরী করে এখনি দনু উদ্ধারের যাত্রা করতে হবে। তিলমাত্র সময় অপচয় হলে দনুর জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা।

শরীরটা কশ্যপের অবসাদে নুয়ে এল। যন্ত্রণায়, ব্যথায় পায়ের উপর ভর দিতে তার কষ্ট হল। কিন্তু তবু যেতে হবে তাকে। মন শক্ত করে সে গা ঝাড়া দিয়ে সোজা উঠে দাঁড়াল।

বনের মধ্যে হঠাৎ মুহুর্মুহু শিঙাধ্বনি শুনে চমকে উঠল কশ্যপ।

চমৎকৃত হল। কাশ্যপেয়দের সমর যাত্রার সংকেত। উৎফুল্ল কশ্যপ তার অবস্থান জানান দেবার জন্য গালের মধ্যে দুটি আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে জোরে ফুঁ দিয়ে বাঁশীর মত শব্দ করল ঃ এক, দুই, তিন! সঙ্গে সঙ্গে শিঙার সংকেত ধ্বনিতে সাড়া এল। অল্প সময়ের মধ্যে আতংক পরিচালিত কাশ্যপেয় বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হল।

কশ্যপের আদেশ শুনবার জন্য তারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। প্রথম সারিতে থাকবে সর্বঅস্ত্রে-সুসজ্জিত হয় বাহিনী আর পশ্চাতে থাকবে তীরন্দাজদের ছোট একটি দল, মধ্যে অবস্থান করবে পদাতিক বাহিনী। আর প্রত্যেক বাহিনীর সঙ্গে থাকবে অস্ত্র বাহকেরা। তাদের কাছে অস্ত্র ছাড়াও থাকবে ছোট বড় জাল, কাঁটা-গুল্ম, মশাল খাদ্য সোমরস, পানীয় ইত্যাদি। হয়-বাহিনীর নেতৃত্ব নিল স্বয়ং কশ্যপ। আর পদাতিক বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করল সেনাধ্যক্ষ আতংক।

যাত্রার পূর্বে কশ্যপ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করল। তাতে কিঞ্চিৎ হবি ও সোমরস আহুতি দিল। প্রজ্জ্বলিত অগ্নির সম্মুখে আমৃত্যু সংগ্রামের শপথ নিল। তারপর কটি থেকে একটি তীক্ষ্ণ ছুরি বার করে কশ্যপ আঙ্গুলের অগ্রভাগ চিরে প্রত্যেকের ললাটে রক্তের তিলক এঁকে দিল। আতঙ্কের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে সমস্ত সেনানীদের উদ্দেশ্যে বলল ঃ পুত্র, এ হল আমাদের প্রতিশোধের দিন। চিরকাল যারা তোমাদের শোষণ করেছে, অত্যাচার করেছে, ধন-সম্পদ-স্ত্রী-লুণ্ঠন করেছে, যারা তোমাদের সুখে বাস করতে দেয়নি, তাদের সব সুখ, আরাম, বিলাস, স্বপ্ন, ঘর ভেঙে তছনছ করে দাও। অত্যাচার করে অত্যাচারের প্রতিশোধ নাও। এই সব সুখী, ধনী, বিলাসী, ভোগী মানুষদের শিশু-পুত্র-নারী, বৃদ্ধ সকলকে নির্বিচারে হত্যা করে তোমাদের নিহত স্বজনদের লাঞ্ছিত আত্মার কষ্ট দুঃখ আর প্রত্যাশা পূরণ কর। ঘরে ঘরে অগ্নি সংযোগ কর, ধন-ঐশ্বর্য সম্পদ লুণ্ঠন কর। নগরে গ্রামে জাগিয়ে তোল মহা আতংক। দেবতার রুদ্র রোষে পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হয়ে যাক। আসুক মহাধ্বংস। শিরে নামুক তাদের বজ্রাঘাত। বলতে বলতে তার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হল। ঝঞ্ঝাগত মেঘের মত থমথম করতে লাগল তার মুখ।

কশ্যপ উর্ধ্বে দুই হাত তুলে ইংগিত জানাতেই আতঙ্ক বাজিয়ে দিল শিঙা। আর কশ্যপ তার উত্তরীয় নিয়ে শূন্যে উড়িয়ে দিল। অমনি সৈন্য-বাহিনী দু'ভাগ হয়ে অগ্রসর হতে লাগল।

হয় পৃষ্ঠে কশ্যপ সকলকে পিছনে ফেলে রাজপ্রাসাদের দিকে উল্কার বেগে ছুটে গেল। কাশ্যপেয়রা সমতা রক্ষা করে তার সঙ্গে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। যাওয়ার পথে যেসব বাসগৃহ পড়ল জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়ে সেগুলিকে কাশ্যপেয়রা জ্বালিয়ে দিল। কৌতূহলী নাগরিকদের বুকে তীর হেনে তাদের জীবনদীপ নিভিয়ে দিল। ধ্বংস আর মৃত্যুর আতংক সৃষ্টি করে মত্ত মাতঙ্গের মত দুর্বার গতিতে তারা এগিয়ে চলল। কোথাও কোন প্রতিরোধ ছিল না। কাশ্যপেয়দের গতি ছিল অবাধ এবং অপ্রতিহত।

প্রাচীর উল্লম্ফন করে রাজপ্রাসাদে ঢুকল কশ্যপ। সেই সময় একজন প্রহরীর তীর এসে লাগল তার বুকে। চামড়ার বর্মের তলায় ব্রঞ্জের শক্ত পাত থাকার জন্যে কশ্যপের দেহে তা বিদ্ধ করল না। তামার নির্মিত তীরের ফলকের অগ্রভাগ ব্রঞ্জে ধাক্কা খেয়ে বক্র হল। কশ্যপ ভ্রূক্ষেপ না করে ভল্ল হস্তে দৃপ্ত-ভঙ্গীতে এগিয়ে চলল। কয়েকজন কাশ্যপেয় কণ্টকাবৃত মুদ্গর হাতে তার পিছু পিছু এগিয়ে চলল।

কশ্যপ চতুর্দিকে তুর্বাণকে খুঁজছিল। কোথাও তাকে না পেয়ে বেশ হতাশ হল। শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করাই শাস্ত্রীয় বিধি। কাশ্যপেয়রা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল তুর্বাণকে। অবশেষে প্রাসাদ শিখরে সন্ধান মিলল তুর্বান এবং জিনদাসের। ম্লানমুখী শীর্ণ কঙ্কালসার দনুকে তাদের মধ্যেই পেল কশ্যপ। অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণায় দনুর দুই চক্ষু অশ্রুময়। স্বপ্নের দনুর এ কি করুণ দশা করেছে তুর্বাণ! উজ্জ্বল অথচ আশ্চর্য দ্বিধাভরা দুই চোখে দনু তাকিয়েছিল কশ্যপের দিকে। আর কশ্যপ দেখছিল তুর্বাণকে। তার দুই চোখে ক্রোধ-প্রতিহিংসা আগুনের মত দপ্ দপ্ করে জ্বলছিল। যন্ত্র চালিতের মত কশ্যপ দনুর দিকে এগিয়ে গেল। দুই হাতে তার প্রশস্ত চওড়া বুকের উপর

টেনে নিল তাকে। চোখের কোণে জমা ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়া জল, মুছিয়ে দিতে দিতে বলল: কেঁদো না। চোখ তুলে তাকাও আমার মুখের দিকে। দ্যাখ একটুও বদলায়নি। তোমার প্রেম দিয়েছে আমায় শক্তি। আমি পথ হারায়নি। থেমেও যায়নি। অবরুদ্ধ কান্নার আবেগে দনু ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল কশ্যপের বুকের উপর।

কশ্যপের দৃষ্টি প্রখর হল। দুই চোখের কোল কুঁচকে ছোট হয়ে গেল। মুহূর্তে মুখের ভাব বদলে গেল। ভয়ংকর নিষ্ঠুরতায় জ্বল জ্বল করছিল তার মুখ। হিংস্র দৃষ্টিতে তুর্বাণের দিকে তাকাল। দাঁতে দাঁত দিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে বলল: তোমার মৃত্যু আমার হাতেই নির্দিষ্ট ছিল।

মৃত্যুভয়ে আচ্ছন্ন তুর্বাণ। সজল কণ্ঠে মিনতি জানিয়ে বলল: আমাকে প্রাণে মেরো না। আমি সন্ধি চাই। ভুল করেছি। আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।

হা-হা করে হেসে উঠল কশ্যপ সদম্ভে। ব্যঙ্গ বিদ্রূপে তার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ শোনাল। বলল: রাজপুরোহিত তুর্বাণ-এর নাম শুনলে সিন্ধুবাসীদের বুক কাঁপে। অসীম, অলৌকিক তার ক্ষমতা। তুর্বাণের ক্রোধে মানুষ ভেড়া হয়। ঝড় বিদ্যুৎ-ভূমিকম্প হয়। এত তার শক্তি! আজ! আজ, এ কি কথা শুনি তুর্বাণের মুখে! তুমি এখন মনিহারা ফণী। জনগণের কাছে তুমি পরিত্যক্ত। একজন বাতিল লোকের সঙ্গে সন্ধি করে লাভ? তোমার বাঁচার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। দনু লাঞ্ছনাকারীর কোন ক্ষমা নেই।

কশ্যপ তুর্বাণের বুকে বর্শা বিঁধিয়ে দিয়ে দনুকে তার রক্ত দর্শন করালো। বলল: তোমার সব দুঃখ কষ্ট অপমানের জ্বালা জুড়িয়ে যাক। আমার ক্রোধ নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত ওর শরীরকে আমি ছিন্ন-ভিন্ন করব।

কশ্যপ একের পর এক অস্ত্রাঘাত করে তার দেহকে টুকরো টুকরো করল। তারপর সেই ছিন্নভিন্ন শোণিত-সিক্ত নিস্পন্দ শরীরের উপর পা রেখে জয়-নিনাদ করতে লাগল।

কশ্যপের সেই ভয়ংকর উন্মত্ত রূপ দেখে দনু মূর্ছা গেল। আতংকের সর্বশরীর শিউরে উঠল।

কাশ্যপেয়দের অনেকে প্রমত্ত বর্ব্বরতা সহ্য করতে না পেরে হাত দিয়ে মুখ ঢাকল।

সফল অভিযান শেষ করে ফিরে আসার পর কশ্যপের যশ চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হল। এখন সে শুধু কাশ্যপেয়দের নেতা নয়। চানহুদড়োর পরিত্রাতা, এবং শাসনকর্তা। তাকে দেখলে সিন্ধুবাসীদের মনে যুগপৎ বিস্ময় শ্রদ্ধা ও ভয় জাগ্রত হয়। চারণেরা এখন তার নামের প্রশস্তি রচনা করে তার কীর্তি, শৌর্য-বীর্য দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দিল।

লুণ্ঠিত সম্পদ কাশ্যপেয়দের মধ্যে ভাগ করে দিল। এমন কি সামন্ত প্রধান বরুণের শ্বেতবর্ণের উৎকৃষ্ট বলীবদ্দ এবং দুগ্ধবতী গাভীগুলো যা সে নিজের একার চেষ্টায় উদ্ধার করেছিল, সেগুলো নিজের পুরের গোশালার শোভাবর্দ্ধনের জন্য রাখল না। গাভীপ্রিয় কাশ্যপেয়দের মধ্যে তাদের বিতরণ করে দেয়া হল। এইসব গাভী, এবং রত্ন, ধন, সম্পদ পেয়ে কাশ্যপেয়রা ভীষণ খুশি হল। এত সম্পদ একসঙ্গে তারা কখনও চোখে দেখেনি। কশ্যপের দয়া-দাক্ষিণ্য এবং কৃপার জন্যে তারা চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকল তার কাছে। ঘরে ঘরে কশ্যপের মূর্তি গড়ে তারা পূজা করতে লাগল।

কশ্যপের বিরোধিতা করার জন্যে দক্ষের মনে একটা প্রবল অপরাধ বোধ জমা হয়েছিল। নিজেকে সে কিছুতে ক্ষমা করতে পারছিল না। আত্মগ্লানির দহনে তার হৃদয়-মন পুড়ে যাচ্ছিল। সান্ত্বনা পাওয়ার জন্যে একদিন দ্বিধা-সংকোচ ত্যাগ করে কশ্যপের কক্ষে প্রবেশ করল। আলিঙ্গন করে দক্ষ বলল : আমি যখন জীবনের এক অভাবিত পরিস্থিতির ভেতর নিজের-মন্দ ভাগ্যের কথা চিন্তা করছি, তখন তুমি এলে। আমার সমস্ত দুর্ভাবনার মেঘকে ছিঁড়ে খুঁড়ে উড়িয়ে নিয়ে

যাওয়ার ঝড় সঙ্গে করে আনলে তুমি। আমি পড়লাম দোটানায়। ঝড় নিজের নিয়মে ভেঙে চুরে তছনছ করল সব। ঝড়ের ঘূর্ণিতে ঘুরতে ঘুরতে আমার কি পরিণতি হল তা তুমি জান। তোমার পক্ষে যাব বলে যখন মন স্থির করেছি তখন দেখলাম, আমি বন্দী। ভাগ্যহীন মানুষ সবার চোখেই ছোট হয়ে যায়। সিংহাসন হারিয়ে, কিন্তু আমি দুঃখ পেলাম না। জানি, তুর্বাণের মিথ্যের পাহাড়টা এবার হুড়-মুড় করে ভেঙে পড়বে। সেই চিন্তাই হল আমার দুঃখের সান্ত্বনা। তাই আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে এলাম তোমায়।

কশ্যপের মুখে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলল ঃ আপনি আমার দুঃখের দিনে সবচেয়ে বড় প্রেরণা। আমি যদি আপনার মন্দ-ভাগ্যের দুঃখ দূর করতে সামান্য কিছু সাহায্য করে থাকি তাহলে সেটা হবে এই দানব ভূমির প্রতি আমার প্রেম ও মমতার যৎ-কিঞ্চিত কৃতজ্ঞতা।

দক্ষ আবেগে বিহ্বল হয়ে তার দু'হাত চেপে ধরে বলল ঃ সত্যই তুমি মহৎ, আমার পরাজয়ের গ্লানি তোমার উত্তপ্ত ভালবাসা দিয়ে ভরিয়ে তুলেছ। সারা জীবন ধরে তোমার কীর্তির এই ঋণ আমার জীবনে স্মৃতি হয়ে থাকবে। আমি সাধারণ মানুষ। দেবার মত কিছু নেই। প্রেমের প্রার্থী হয়ে তুমি এলে এই দানব ভূমিতে। আমার পঞ্চ কন্যা তোমার প্রেমের রাজ্যের অধিশ্বরী হোক-এই মিনতি করব। বল রাখবে? বল?

কশ্যপের মুখে সহসা কথা যোগাল না। সে ভাবতে লাগল ভাগ্যের কি আশ্চর্য খেলা। বেশ কিছুক্ষণ চিন্তার পর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। দক্ষের ব্যাকুল জিজ্ঞাসা তার অনুভূতিকে আলোড়িত করল। সলজ্জ মুখের ভাবটুকু বেলা শেষের স্নিগ্ধ কোমল আলোর মতই অপার্থিব মনে হচ্ছিল। ধীরে ধীরে সে মাথা নাড়ল। বলল ঃ আপনার স্নেহের দান আমার হৃদয়ে গাঁথা হয়ে রইল।

চমৎকার। আমার মর্যাদা রক্ষা করে ধন্য করলে। আমার আরো একটা অনুরোধ আছে বৎস। গচ্ছিত রত্নের মত আমি আগলে বসে

আছি। এই দানবভূমি এখন তোমার। এর শাসনভার গ্রহণ করে তুমি আমায় মুক্তি দাও।

সহসা বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত চমকে উঠল কশ্যপ। কিন্তু কথাটা শুনে ভীষণ খুশি হল।

অভিষেকের বার্ত্তা ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে, গঞ্জে, নগরে, সহরে। রাজ্যব্যাপী শুরু হয়েছে মহোৎসব। মহাদেবী শ্রী ফিরে এসেছেন রাজ্যে। শক্তির দেবী শ্রীর পূজার অধিকার শক্তিমান সামন্ত, সেনাপতি বণিক, পুরোহিতদের ঘরেই হত। দেশের আপামর জনগণের এই পূজার কোন অধিকার ছিল না। কাশ্যপেয়রা সে অধিকার ছিনিয়ে নিল। পূজায় সকলে অধিকার পেল। কশ্যপের উপর দেবীর কৃপা ও আশীর্বাদ লাভের জন্য সারা দেশের মানুষ স্ব-স্ব এলাকায় ঐশ্বর্যশালিনী কল্যাণীদেবী শ্রীর পূজা করছিল। সর্বত্রই আনন্দ স্ফূর্তির বন্যা।

মূল উৎসব হচ্ছে রাজধানী চানছদড়োয়। সেখানে দেবী শ্রীর পূজার সঙ্গে সূর্য-পূজাও হচ্ছিল। রাজধানী পত্রপুষ্পে শোভিত করা হল। রক্তবর্ণের বস্ত্র নির্মিত পতাকা নগরের প্রতি ঘরে ঘরে রাজপ্রাসাদের প্রতিটি হর্মশীর্ষে, সুউচ্চ চূড়ায়, পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষ-গাত্রে শোভা পাচ্ছিল।

অভিষেক হবে পূর্ণিমাতিথিতে।

কয়েকদিন বাকি আর। দিন যত নিকট হচ্ছে কশ্যপের মনও তত ভারাক্রান্ত হচ্ছে। সব সময় কি যেন এক গভীর চিন্তায় সে অন্যমনস্ক। কোন কিছুতে তার মন নেই। ভীষণ অস্থির এবং চঞ্চল। দিতি অদিতির চিন্তা চকিত যন্ত্রণার মত বুকে বিদ্ধ হয়। একটা বেদনাহত পুরুষের অভিমান তার সমস্ত চিন্তাকে জড়িয়ে থাকে। চিন্তার আচ্ছন্নতা থেকে অদিতির কথা মনে হয়। বুকের ভেভরটা ভার হয়ে উঠে। মহাপ্লাবনের দৃশ্য ভাসে চোখের উপর। দীর্ঘশ্বাস পড়ে। সেই অতলান্ত জিজ্ঞাসার কোন জবাব মেলে না তার। কেন মেলে না?—এই প্রশ্নের জিজ্ঞাসা মস্তিষ্কের ভেতর ফিস্ ফিস্ করে বলে—সব ভাগ্য, নিয়তি। এর বিরুদ্ধে কারো কিছু

করার নেই। অদৃশ্য ভয়ংকর শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে কি দিয়ে? কোন কৌশল আছে কি তার? এ কি মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ যে তার একটা জয় পরাজয় থাকবে? আক্রমণের সংকেত পাওয়া যাবে? কিন্তু ভাগ্যের সঙ্গে কোন যুদ্ধ চলে না। ভাগ্যকে মেনে নিতে হয়। ভাগ্য দুর্বার, দুরতিক্রম্য। যা ভাগ্যে আছে তাই হবে।

মিথ্যে কথা। চিন্তার মধ্যে সে তার আত্ম সান্ত্বনার প্রতিবাদ করল। দিতির ভাগ্য বিড়ম্বনার পেছনে নেই কোন অমোঘ শক্তির হাতছানি। কালিবঙ্গানের একদল মানুষের স্বার্থপরতা, চক্রান্ত নীচতা দিতির নির্বাসনের জন্য দায়ী। মানুষের ক্রোধ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, স্বার্থ, চক্রান্ত নিয়তির মত অমোঘ নয়। সাম্প্রতিক পরিস্থিতির একটা সাময়িক অবস্থা মাত্র। পুরুষের বুদ্ধিবল বাহুবল উদ্যম ফেরাতে পারে সেই ভাগ্যচক্রকে। কিন্তু এই পুরুষ কে বা কি? নিজেকে প্রশ্ন করল কশ্যপ। এই পুরুষ তার পুরুষকার দ্বারা সমস্ত অসত্যকে অতিক্রম করে সত্যকে নির্ধারণ করতে পারে। মৃত্যুকে পরাস্ত করে অমৃতকে আহরণ করতে পারে। পুরুষ হল আত্মশক্তির উৎস। সমস্ত সদ্‌গুণ এবং বল বীর্যের প্রতীক। পুরুষই প্রাণকে উপাসনা করে। প্রাণই বিরাট, প্রাণই পথ প্রদর্শক।

লোকের মুখে মুখে দিতির নির্বাসনের সংবাদ একদিন কশ্যপের কানে পৌঁছল। তখন সে নিরাশ্রয়, একা, সম্বলহীন। ভাগ্য পরিবর্তনের মুখে থমকে দাঁড়িয়েছে। চানছদড়োতে তাকে নিয়ে তখন ঝড় উঠেছে। সেই সময়ে দিতির নির্বাসনের সংবাদ শুনল। তৎক্ষণাৎ হয় পৃষ্ঠে উল্কার বেগে ছুটে গেল কালিবঙ্গানে। ঢালু মালভূমি বেয়ে নেমে চলল তার হয়। দিতি সম্পর্কে হাজার প্রশ্ন আর কৌতূহল ভীড় করল তার মনে। দিতি মা হয়েছে। যমজ দুটি সন্তানের পায়ের রঙ নাকি আগুনের মত। সিন্ধুর ঢেউ-এর মত সোনার রঙের চুল, চোখে সুনীল সাগরের দ্যুতি। ভারী সুন্দর মিষ্টি তাদের চেহারা। হিরণ বর্ণের চুল, এবং অক্ষির রঙ বলে দিতি তাদের নাম দিয়েছে হিরণ্যাক্ষ আর হিরণ্যকশিপু। এখন তারা কত বড় হয়েছে?

কেমন দেখতে হয়েছে? ভাবতে ভাবতে কশ্যপ দীর্ঘপথটা যে কখন অতিক্রম করল তা জানতেই পারল না। একসময় চোখ তুলে দেখল, দূর থেকে সেই নিষিদ্ধ পাহাড় চূড়াটা দেখা যাচ্ছে। তাদের প্রেমের সাক্ষী হয়ে সে দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। আগের মতই। একটুও পরিবর্তন হয় নি।

নিষিদ্ধ পাহাড়ে চড়ার সময় উত্তেজনায় কাঁপছিল তার দেহ। চাঁদের আলোয় পাহাড়টা উজ্জ্বল হয়ে ছিল। এক দুর্যোগের দিনে এই পাহাড় তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। ভাগ্যের নানাপথ ঘুরে পরিচিত পাহাড়ে সেই জায়গাটিতে যখন সে এসে দাঁড়াল তখন এক দারুণ মুহূর্ত্ত তৈরী হল সেখানে। উন্মাদের মত কশ্যপ দিতিকে খোঁজে আর চীৎকার করে ডাকে। কণ্ঠ দিয়ে প্রবল আর্ত্তনাদের মত বার বার উচ্চারিত হতে লাগল ঃ দিতি, দিতি। হিরণ্যকশিপু, হিরণাক্ষ্য।

কোন নামে সাড়া ফিরে এল না। পাহাড় বনভূমির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সে কণ্ঠস্বর বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

দিতি এবং তার পুত্রদের না দেখতে পেয়ে ভেঙে পড়ল কশ্যপ। নিজেকে তার অপরাধী মনে হল। পাহাড় গুহার দেয়ালে মুখ রেখে অসহায়ের মত হাপুস নয়নে সে কাঁদল। আর মনে মনে শপথ করল, দিতিকে যারা সুখে থাকতে দেয়নি, যাদের ষড়যন্ত্রে স্নেহবৎসল পিতা প্রাচেতস প্রিয় কন্যাকে নির্বাসন দিতে বাধ্য হল তাদের কশ্যপ ক্ষমা করবে না। দিতির এক ফোঁটা চোখের জল তাদের অজস্র চোখের জলের কারণ হবে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই কথা সে মনে রাখবে।

অতীতের সেই স্মৃতি কশ্যপের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দিল। যন্ত্রণাবিদ্ধ দুই চোখের উপর ভেসে উঠল কালিবঙ্গানের নগর প্রধান সম্বর, ওঝা গুর্বাক আর পুরোহিত গর্গের মুখচ্ছবি। বুকের ভেতর ধিকি ধিকি যে আগুন জ্বলছিল ইন্ধন পেয়ে হঠাৎ তা জ্বলে উঠল। তাপ প্রখর হল। উত্তেজনায় তার সর্বশরীর কাঁপতে লাগল। প্রিয়তমা বিষণ্ণা দুর্ভাগিনী দিতির জন্য বিলাপ ক্রন্দন নয়, আত্মানুশোচনা নয়

আর্ত্তনাদও নয়—প্রতিশোধ। পাথরচাপা হৃদয়, গহ্বর থেকে এক দুর্জয় প্রতিশোধ স্পৃহা উৎসারিত হল। বুকের ধ্বনির ভিতর যুদ্ধের নাকারা বাজতে লাগল। একটা নিষ্ঠুর হাসি খেলে গেল তার অধরে।

পরের দিন প্রত্যুষে কশ্যপ তার বাহিনী নিয়ে অতর্কিতে হানা দিল কালিবঙ্গানে। নাকাড়ার তালে ঘোড়াসওয়ার তিরন্দাজ, পদাতিক বাহিনী এগোতে লাগল। ধূলো উড়ল চারাদকে। কারো মুখে কথা নেই। নিঃশব্দে এগিয়ে চলল কাশ্যপেয় বাহিনী।

সূর্যাস্তের মুহূর্ত্তে কালিবঙ্গানের আকাশ ধূলি ঝড়ে হঠাৎ আচ্ছন্ন হয়ে গেল। অবাক হল নগরের অধিবাসীরা। প্রতিরক্ষার ভার যাদের হাতে তারা কিন্তু বিচলিত হল না। নিরুদ্বিগ্ন পরিবেশে নিশ্চিন্ত ভোগ-বিলাসের সুখ ও উল্লাসের মত্ততা ছেড়ে বাইরে ধূলি ঝড় দেখার কৌতুক তাদের আকৃষ্ট করল না। . দায়িত্ব সচেতনহীন বিলাসব্যসনের আবহাওয়া সবার মনে এনে দিল কঠিন বাস্তবকে অবহেলা করার এক মেরুদণ্ডহীন প্রবণতা। শত্রুর আক্রমণ সম্পর্কে তারা, ছিল উদাসীন। যুদ্ধের কোন প্রস্তুতিও ছিল না তাদের। তাই বিনা বাধায় কাশ্যপেয় বাহিনী কালিবঙ্গানের নগর প্রধানের দুর্গদ্বারে গিয়ে আঘাত করল। পাহারাদার কাউকে টহল দিতে দেখা গেল না। দু'একজন যা দেখা গেল তারা নিজের জায়গায় চুপ করে নিঝুম হয়ে বসেছিল। সোমের নেশায়, আচ্ছন্ন এবং জ্ঞানশূন্য।

সে রাতের মত কাশ্যপেয়রা বিশ্রাম নিল।

পরের দিন উষার আলো ফুটে উঠার সঙ্গেই আরম্ভ হল কাশ্যপেয় বাহিনীর তাণ্ডব। সম্বরের প্রহরীরা রাতে অত্যধিক সোমরস পান করেছিল। সেজন্য নিদ্রাভঙ্গ হতে তাদের দেরী হল। দুর্গদ্বারে গণ্ডগোল শুনে তারা ঘুমজড়িত চোখে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল। কিছু বুঝে উঠার আগেই ছিন্নশির হয়ে ভূলুণ্ঠিত হল। কোলাহল, চিৎকার, আর্ত্তনাদ, ক্রন্দন কালিবঙ্গানের মানুষের নিদ্রাভঙ্গ করল। আগুনের লেহিহান বহ্নিশিখা জ্বলতে লাগল শস্যের গাদায়, মানুষের বাসস্থানে। দিতির অপমানের প্রতিশোধ কশ্যপকে ভয়ংকর নিষ্ঠুর

করে তুলল। দুইচোখ তার হিংস্র হায়নার মত জ্বলতে লাগল কশ্যপের আদেশে গুর্বাক, গর্গ, সম্বরের বাসগৃহ অগ্নিদগ্ধ করা হল। নির্বিচারে হত্যা করা হল রাজপুরুষ, ওঝা, এবং পুরোহিতদের পরিবারের শিশু, বৃদ্ধ, নারী সকলকে। তাদের রক্তে ভিজে রাঙা হল কালিবঙ্গানের কৃষ্ণমৃত্তিকা।

তবু সম্বর গর্গকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। এক দারুণ ব্যর্থতা এবং হতাশায় তার বুকে জ্বালা করতে লাগল। শত্রু সম্পূর্ণ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত বিজয় সম্পূর্ণ হয় না। সম্বর, গর্গ আত্মগোপন করে তাকে সেই বিজয় সুখ থেকে বঞ্চিত করল। জয়ের অতৃপ্তি তার মনে গ্লানি জমিয়ে তুলল। কিন্তু কোথায় তারা? বিদ্যুত চমকের মত একটি জিজ্ঞাসা তার মনে তরঙ্গ খেলে গেল। সাধারণ নিরীহ মানুষকে তাদের আশ্রয়দাতা মনে হল। তাদের গৃহেই হয়ত দুই শয়তান আত্মগোপন করে আছে। অমনি নিষ্ঠুর ক্রোধে আক্রোশে তার সর্বশরীর জ্বালা করতে লাগল। মুহূর্তে কালিবঙ্গানের মানুষের উপর তার সব সহানুভূতি কর্পূরের মত উবে গেল। বিবেকের অনুশাসন ভুলে গিয়ে সে হয়ে উঠল এক অত্যাচারী রক্তপিপাসু দানব। নির্বিচারে চলল গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ। স্বামী-সন্তানহারা অসহায় নারীদের হাহাকার, আর্তনাদ, করুণ বিলাপ, কাতর আকুতি মিনতি কশ্যপকে বিচলিত করল না। তার পাষাণ হৃদয়ে এক বিন্দু করুণা সঞ্চার হল না। কিংবা মমতা জাগল না প্রাণে।

সারাদিন চলল নরমেধযজ্ঞ।

দিবাশেষের ম্লান আলো নেমে এল সিন্ধুতীরে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ সন্ধ্যার কিছু পরে উঠবে। একটু আধটু করে আঁধার ঘন হয়ে এল। নির্জন সিন্ধু নদীর দিকটা ছিল অরক্ষিত। কশ্যপ একাকী গাছের মূলে চুপ করে বসেছিল। পাতার খস্ খস্ শব্দে সে সতর্ক হল। অট্টালিকার পেছন দিকের একটি গুপ্তদ্বার পথে সবার অলক্ষে চুপি চুপি দুটি মানুষ বেরিয়ে এল। অন্ধকারের ভেতর ছায়ামূর্ত্তির মত পাশাপাশি তারা হাঁটছিল। কশ্যপের বুঝতে ভুল হল না। তৎক্ষণাৎ আড়াআড়ি পথে

সে তাদের পথ আটকে দাঁড়াল। অমনি সামনের একটা উঁচু দেয়ালের মধ্যে তারা চোখের নিমেষে ঢুকে গেল। কশ্যপও তাদের পেছন দৌড়োল। গোলক ধাঁধার মত সরু সরু বাঁধানো পথ এদিক ওদিক চলে গেছে ঘুরে ঘুরে। ঐ পথ ধরে লোক দুটির পেছনে কশ্যপ ছুটতে লাগল। সামনের দেওয়ালে আটকে গেল সে। একটু বেঁকে দেখল একটা সুড়ঙ্গ। সেই পথ দিয়ে নামতে নামতে অনেকগুলো পদশব্দ শুনতে পেল। মশালের আলো পড়ল জায়গাটিতে। সিঁড়ির বাঁকের মুখে কুলুঙ্গির মত একটি জায়গাতে লোক দুটি দেয়ালের দিকে মুখ করে সমস্ত শরীরটাকে দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিল। আলো না পড়লে কশ্যপ তাদের অস্তিত্ব টের পেত না। পায়ের শব্দে কশ্যপও একটু শঙ্কিত হয়েছিল। মশালের আলো নিকটতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সংশয় দূর হল। মশালধারী দু'জনেই তার দলের লোক। কশ্যপের ইংগিতে একজন কাশ্যপেয় পলাতক লোক দুটিকে বর্শার খোঁচা দিল। উঃ করে, একটা আর্ত্তচিৎকার করে ঘুরে দাঁড়াল তারা। মশালের আলো পড়ল তাদের মুখের উপর। স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল কশ্যপের। ভুরু কুঁচকে গেল। বঙ্কিম হল গ্রীবাদেশ। মুখে জয়েরপ্রফুল্লতা। অধরে ক্রূর হাসি। প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ এদের হত্যা কর না। আমার রথের অশ্ব দুটি খুলে নাও। অশ্বের স্থানে গুর্বাক, সম্বর আর গর্গকে জুড়ে দাও। ওরা তিনজনে রথ টানবে।

কশ্যপের রক্তের ভেতর দিয়ে এক অনাস্বাদিত আনন্দের প্রবাহ বয়ে গেল। তার দেহ রোমাঞ্চিত হল নতুন এক অনুভূতিতে। বহুকাল আগে সুমেরের একটা ঘটনা তার মনে পড়ল। চোখের উপর ভেসে উঠল সে দৃশ্য। ভাসা ভাসা অস্পষ্ট তার ছবি।

মিত্তানি গোষ্ঠী এবং তাদের গোষ্ঠীর সংঘর্ষে মিত্তানিরা পরাজিত হয়ে বন্দী হল। শত্রুদের বন্দী করে রাখার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। তাদের ধ্বংস করাই ছিল নিয়ম। গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়ে পুরুষেরা গোল হয়ে দাঁড়াত উল্লাস করার জন্যে। নারীরা তীর দিয়ে বন্দীদের দেহ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রক্ত বার করে যন্ত্রণা দিয়ে তাকে অনেকক্ষণ ধরে

হত্যা করত। কিন্তু বন্দী মিত্তানিদের শাস্তি হল সম্পূর্ণ ভিন্ন। দলপতির হাত পা রজ্জুবদ্ধ করে দুইটি হয় দিয়ে দুইদিকে টানা হল। চকিতে দেহটা দুইভাগ হয়ে মাটি রক্তে ভিজিয়ে দিল। শত্রু নিধন হওয়ায় মত্ত উল্লাসে জনতা করতালি দিল। বর্শা নিয়ে উন্মত্তের মত নৃত্য করতে করতে তারা অপর বন্দীদের হত্যা করছিল। তাদের রক্ত মেখে হোলি খেলল তারা।

বিজয়ীর স্ফীত গর্ব ও আনন্দ নিয়ে কশ্যপ রথে উঠল। বন্দী সম্বর গর্গ এবং গুর্বাককে ইতিমধ্যে অশ্বের স্থানে জুড়ে দেয়া হয়েছিল। কশ্যপ দু'হাত উচ্চে তুলে দলের লোকদের অভিনন্দন জানাল। তারপর শূন্যে চাবুক ঘুরিয়ে বন্দীদের পৃষ্ঠে কশাঘাত করল। বন্দীদের সর্বশরীর বেদনায় টন্‌টন্‌ করে উঠল। মনুষ্যবাহিত রথ গড়িয়ে চলল। ক্রোধে কশ্যপ জ্ঞান হারিয়েছিল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল: দিতিকে নির্বাসিত করেছ তোমরা। তোমাদের তিন শয়তানের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করল কালিবঙ্গানের মানুষ। পশুর চেয়ে অধম তোমরা। পশুর জায়গাতেও তোমাদেয় মানায় না। তবু পশুর চোখে দেখছি তোমাদের। বল কোথায় দিতি? কোথায় আমার পুত্ররা! কোথায়? কোথায়?

কশ্যপের ঘন ঘন কশাঘাতে তাদের দেহ ক্ষত বিক্ষত হল। বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরতে লাগল ক্ষত দিয়ে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল শরীর। আস্তে আস্তে অবশ হয়ে এল। ক্লান্ত দেহে মাটির বুকে মুখ থুবড়ে পড়ল। তবু, কশ্যপের কশাঘাত বন্ধ হল না।

অভিষেক অনুষ্ঠানকে কশ্যপ যজ্ঞের রূপ দিল। সমাজকে পালন করার নীতি নিয়েই কশ্যপ সরস্বতী তীরে সত্র যজ্ঞের আয়োজন করল। নির্মিত হল যজ্ঞবেদী। যজ্ঞের উপকরণ রাখার জন্য ভাণ্ডার নির্মিত হল। সেখানে দুধ, দই, ঘি, চাল শস্য জমা হল। বলীবর্দ্দ বৎস, সোমরস, ঘৃত, চর্বি, সমিধ প্রচুর পরিমাণে রাখা হল। যজ্ঞভূমির

চতুর্দিকে ছোট ছোট চৌতারা তৈরী হল। মাঝখানে একসঙ্গে অনেক লোক বসার জন্যে তৈরী হল মহাবেদী। হোতা সকাল থেকে সবাইকে যজ্ঞবেদীতে বসানোর ব্যবস্থা করছিল। যজ্ঞের সহকারীদের সহজে চিনবার জন্যে তাদের মাথায় রঙীন বস্ত্র খণ্ড এবং ঘাসের উষ্ণীস ছিল। মেয়ে-পুরুষ মিলে যজ্ঞের বিভিন্ন কাজ করছিল। সাধারণতঃ গোদুগ্ধ দোহনের কাজ করছিল নারী, আর পুরুষরা সমিধ বহন করে আনছিল। নারী সেগুলি সুচারুরূপে যজ্ঞাগ্নির কাছে সাজিয়ে রাখছিল। মাংস রন্ধন করছিল পুরুষরা, নারীরা করছিল সোমরস প্রস্তুত। উদ্গাতারা গলা মিলিয়ে গান ধরল। স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ হৈ-চৈ স্ফূর্তির মধ্যে মহাসমারোহে যজ্ঞকার্য আরম্ভ হল।

রথ থেকে অবতরণ করল কশ্যপ এবং দক্ষ। কশ্যপের পরণে রক্তাভ পট্টবস্ত্র। হাতে একখানি কুঠার। আর দক্ষের পরিধেয় বস্ত্র ছিল শ্বেতবর্ণ। মহাবেদীতে সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে কশ্যপ যজ্ঞের অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গদের জানাল ঃ এই যজ্ঞের নাম সত্র যজ্ঞ। সত্রতে যারাই সম্মিলিত হবে তারাই হবে এক গোত্রের লোক। সে গোত্র কাশ্যপেয়। যজ্ঞে সকলের সমান অধিকার। যজ্ঞ ফলও সকলে সমানভাবে পাবে। শ্রমে বা ফল লাভে ভেদাভেদ নেই। সকলেই কাশ্যপেয় এই তার একমাত্র পরিচয়। এই যজ্ঞে যারা উপস্থিত আছে যজ্ঞান্তে তারা এক গণসংঘের লোক হবে।

জনতা হর্ষ প্রকাশ করে চতুর্দ্দিক থেকে সাধু সাধু করে উঠল।

সমিধে অগ্নিসংযোগ করে কশ্যপ যজ্ঞের সূচনা করল। ঘৃতের ইন্ধন পেয়ে অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলল। অগ্নির সম্মুখে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হয়ে ধ্যাননিমিলিত নেত্রে গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করল অ-উ-ম। নাভিমণ্ডল থেকে সে স্বরধ্বনি উৎসারিত হল।

এ ধরণের যজ্ঞ হয়নি আর কখনও চানছদড়োয়। তাই কারোর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। যজ্ঞকার্য জানা লোকও ছিল না। যজ্ঞের নির্দিষ্ট কোন পুরোহিত ছিল না। কশ্যপ যেভাবে বলছিল যজ্ঞকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরা সেইভাবেই করছিল সব। মাঝে

মাঝে তাদের ভুল হচ্ছিল। কশ্যপ নিজেই তা সংশোধন করে দিচ্ছিল।

যজ্ঞবেদির প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে গোল হয়ে বসল সকলে। আগুনের দ্যুতিতে তাদের শরীর রাঙা হয়ে গেল। উত্তাপে স্বেদবিন্দু নির্গত হল শরীর থেকে। মুখ গণ্‌-গণ্‌ করতে লাগল। যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত, ফল, মাংস, সোমরস কশ্যপ সমর্পণ করল। তার দেখাদেখি অন্যেরাও আহুতি দিল। প্রচুর ধূম উদ্গীরণ হতে লাগল। কশ্যপের দুই চোখ ধোঁয়ায় জ্বালা করছিল। দু'চোখের কোণ থেকে গড়ানো জল মুছে নিয়ে হাত জোর করে প্রার্থনা জানাল: হে অগ্নি, তুমি তেজ, তুমি দীপ্তি। তোমার দাহিকা শক্তি বস্তুর মধ্যে থাকে প্রচ্ছন্ন। তুমি সদা জ্যোতির্ময়, আঁধার থেকে আলোতে নিয়ে যাও তুমি, মৃত্যু থেকে অমৃতে। ভেদজ্ঞান রহিত হয়ে সব কিছুকে নির্বিচারে গ্রহণ কর। আত্মার জ্যোতি তুমি। বল বীর্যের দীপ্ত প্রকাশ। হে পুষণ, বীর্য দাও, শৌর্য দাও মনে।

যজ্ঞ শেষ হলে হবি চিহ্ন ললাটে এঁকে দিল দক্ষ। হাতে তুলে দিল শাসন দণ্ড। তারপর দক্ষের সঙ্গে অভিষেকের মন্ত্র উচ্চারণ করল কশ্যপ। বলল—আমি প্রজার মঙ্গল করব। আমি নিজের প্রিয়, অপ্রিয় এবং কাম ক্রোধ, লোভ, মান ত্যাগ করে, সকলের প্রতি সমদর্শী হব। ধর্মভ্রষ্ট মানুষকে দণ্ড দেব।

চতুর্দ্দিকে সাধু সাধু রব উঠল। দক্ষ যৌতুক স্বরূপ পাঁচ কন্যা কশ্যপকে সমর্পণ করল।

যাতু, কিমিদিন, পিশাচ, কিরাত এরাও এসেছিল যজ্ঞে। যজ্ঞফলের সম-অধিকার লাভ করে তারা অভিভূত হল। তাই, যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে নতজানু হয়ে কশ্যপের আনুগত্য স্বীকার করল। তাকে পিতা বলে সম্বোধন করল।

কশ্যপ প্রীত হয়ে প্রত্যেককে আলিঙ্গন দিল। যজ্ঞের ভাগ সকলের সঙ্গে তাদেরও সমানভাবে দিল। তারপর উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করল: শোন পুত্রগণ, সত্র যজ্ঞের মূল কথা সাম্য। সাম্য স্থাপন এর ধর্ম।

যাতু, কিমিদিন, পিশাচ, কিরাত, এখন থেকে কাশ্যপেয়। সব কিছুতে তাদের সমান অধিকার। দস্যুতা ত্যাগ করে তারা চাষী হবে। সমতলভূমিতে বাসস্থান নির্মাণ করে গৃহী মানুষের সুখ, শান্তি, উপভোগ করবে। বল বীর্যে, তারা সমান হোক।

এই ঘোষণা করে কশ্যপ যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিল। অমনি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। তারপরে, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে দুগ্ধ আহুতি দিল। দুধ দিয়ে অগ্নি নির্বাপিত করে উচ্চারণ করল : ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।

ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্ব্বং শান্তিঃ
শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি।

সেদিনের প্রার্থনায় শান্তি এল যজ্ঞভূমিতে, শান্তি এল মানুষের মনে। যজ্ঞের মহাবেদীতে বসে সবাই মিলে এক সঙ্গে হবি, দুগ্ধ, সোমরস পান করল ; ভক্ষণ করল গো বৎস। সকলে সমান ভাগ পেল। কারো মনে কোন গ্লানি রইল না। উদ্গাতারা উচ্চৈঃস্বরে গাইতে লাগল :

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং মনঃ সহ চিত্তম্ এষাম্।

চানছদড়োর নাগরিকেরা নিরুদ্বিগ্ন মনে সংসার যাত্রা সুরু করেছে। নগরের সর্বত্র একটা শান্ত শ্রীভাব। কোথাও কোন বিরোধ সংঘর্ষ নেই। সর্বত্রই একটা সাম্যের ভাব। মানুষের কণ্ঠ হতে কণ্ঠে সেই খুশির সুর ছড়িয়ে পড়ল।

"বায়ু মধু হয়ে বয়ে যাক্, নদী ঢেলে দিক মধুধারা
শ্যামল ওষধি হোক মধুময়—না হয় সে মধুহারা।
রাত্রি ও উষা মধু হোক, হোক পৃথিবীর ধূলি মধুময়
মধুময় হোক বনস্পতিরা, মধুর দীপ্ত সূর্য্য—
দিশি দিশি হোক সব মধুময়—মধুর শৌর্য্য বীর্য্য।"

আকাশের গায়ে তখন অরুণ আলোর লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে। কশ্যপ একাকী হয় পৃষ্ঠে করে নগর পরিভ্রমণে বেরিয়েছে। ঘুরে ঘুরে দেখছে নতুন দেশের জীবনযাত্রা। ভোরে উঠেই মানুষ কাজ আরম্ভ

করেছে। বর্ষার জলে প্লাবিত হয়েছে মাঠ। চাষীরা জমিতে জমিতে চাষের কাজ করছে। পশুর সাহায্যে হল কর্ষণ করছে। মুখে তাদের সংঘের মন্ত্র। সাম্যের গান।

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং মনঃ সহ চিত্তম্ এষাম্।

কৃষকপল্লীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে কশ্যপ শুনতে পেল পরিচিত সুরের একটি গান। সে অমনি থমকে দাঁড়াল। দিতির মুখে সে এ গান শুনেছিল নিষিদ্ধ পাহাড় চূড়ায়। গানের বাণীতে এবং সুরেতে দিতির গানের সঙ্গে তার নিবিড় মিল রয়েছে। বাঁশীর সুরের অনুসরণ করে কশ্যপ চলতে লাগল। যেতে যেতে তার চোখের তারায় কিসের স্বপ্ন ছায়া পড়ল। অন্যমনস্ক হয়ে গেল। দিতির স্বর ধ্বনিত হল রক্তের কলস্রোতে। ফিস্ ফিস্ করে যেন বলল: আমার সুর যাবে তোমার সঙ্গে। যেখানেই থাকি না কেন, একদিন এই সুরে আমরা উভয়কে কাছে পাব।—অমনি এক সুন্দর সুখের অনুভূতিতে সারা শরীর রোমাঞ্চিত হল। বিদ্যুৎ চমকের মত মনে উদ্ভাসিত হল: দিতি তা হলে জীবিত। বাঁশীর সুরে আহ্বানের সংকেত। পথ হারা পথিকের মত দিতি যেন আকুল স্বরে ডাকছে তাকে।

বংশীবাদককে দেখে অবাক হল কশ্যপ! দুটি কিশোর বালক চোখে চোখ রেখে, হাসি হাসি মুখ করে সুরের এক ইন্দ্রজাল রচনা করে চলেছে। সুরের ঐক্যতান মুগ্ধ করল কশ্যপকে। আচ্ছন্নভাব কাটতে তার অনেকক্ষণ সময় লাগল। বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টিতে বালকদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে অবাক হল সে। বালকদ্বয়ের মুখ অবিকল দিতির আদলে গড়া। মাথায় হিরন্ময় কেশ। উজ্জ্বল পালিশ করা সোনার মত গায়ের রঙ, কটা চোখে সোনালী আভা, সুঠাম দেহ, উন্নত গ্রীবা, দীঘল নাক অনেক তার অনুরূপ, মনের মধ্যে তার প্রশ্ন জাগল: কে এই বালক?

কশ্যপের দুই চোখে উদগ্র কৌতূহল নিষেধ মানল না। ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল: বৎস, এ গান তোমরা কার কাছে শিখলে?

সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল কিশোরদ্বয়। কিন্তু দুই চোখে তাদের বিস্ময়। কশ্যপের চেহারার সঙ্গে তাদের কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য খুঁজে পেল তারা। যাকে খুঁজছে তারা, ইনি কি সেই ব্যক্তি? কশ্যপকে একটা সুন্দর ছবির মত মনে হল তাদের। জিজ্ঞাসু চোখ মেলে কশ্যপের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল: মহাত্মন্ আপনার কৌতূহলের কারণ কি, জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।

অপ্রত্যাশিত বিজ্ঞোচিত জিজ্ঞাসায় চমকে উঠল কশ্যপ। বলল: বৎস, আমি এক রমণীকে জানতাম যার কণ্ঠে এবং বংশীতে এই গানের সুর আমি শুনেছি। তোমার বাঁশীর সুর আমাকে ব্যাকুল করছে। তাকে দেখার জন্যে মন আমার উতলা হয়েছে। মনে হচ্ছে, তোমরা তার সন্ধান জান। বল তোমরা কে? কোথায় শিখেছ এই প্রেমগান? কে তোমাদের জননী? তোমরা কি কাশ্যপেয়? তোমাদের নাম কি হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু?

উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছিল কশ্যপ। ব্যাকুল দুই চোখ মেলে সে তাকিয়ে রইল বালকদ্বয়ের দিকে। বুকে তার অশান্ত ঝড়।

বালকদ্বয়ের অবাক হওয়ার পালা। পথিকের মুখে তাদের নাম, পিতার নাম, বংশের নাম তাদের আশ্চর্যান্বিত করল। পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করল তারা। কিন্তু কে এই অদ্ভুত আশ্চর্য সুন্দর মানুষ? ইনি কে? কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা ও প্রশ্ন দমন করে তারা সমস্বরে বলল: মহাত্মন্, আপনার সত্য অনুমানে আমরা বিস্মিত।

আনন্দে কশ্যপের বুক ঢেউর মত উত্তাল হল। অপলক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে তাদের চোখের তারায় কাকে যেন খুঁজল অনেকক্ষণ। তারপর, অতি সন্তর্পনে তাদের গালের উপর হাত বোলাল। চোখের দিকে তাকিয়ে হাসতে গেল, কিন্তু পারল না, মনে হল সে যেন অতি নির্জনে কোথায় নির্বাসিত। বুকেতে তাই কষ্ট বিদ্ধ যন্ত্রণা। রুদ্ধশ্বাসে ডুবন্ত স্বরে বলল: পুত্র, পুত্র আমার।

বালকদ্বয়কে আরো গভীর করে বুকে টেনে নিয়ে কশ্যপ বলল:

তোমরা কোথায় থাক? জননী দিতি কেমন আছে? কোথায় গেলে পাব তাকে?

হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু অবাক চোখে ভুরু কোঁচকাল। বিস্ময়ে তাদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে গেল। চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু তাদের চোখের কোনে কোনে অপ্রত্যাশিত আনন্দে চিক্ চিক্ করছিল। হিরণ্যাক্ষ দম চাপা নিচু স্বরে বলল: পিতা।

হিরণ্যকশিপুও অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল: পিতা।

প্রাণের আকর্ষণে পুত্রদ্বয়কে বুকের গভীরে চেপে ধরল কশ্যপ। তৃপ্তিতে সারা অন্তর ভরে গেল তার। এত আনন্দ সে জীবনে অনুভব করেনি কখনও। এক বিচিত্র অনুভূতির রোমাঞ্চিত শিহরণে তার সারাশরীর পুলকিত হল। এক অব্যক্ত আনন্দের মধ্যে ডুবে যেতে শুনতে পেল হিরণ্যাক্ষের কণ্ঠস্বর।

মহেঞ্জোদোড়োর মোহনার মুখে এক নির্জন ব-দ্বীপ আছে। পাতালপুরী তার নাম। চতুর্দ্দিকে তার ঘন অরণ্য। বাইরে থেকে লোক বসতির কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাবে না। মাতামহ প্রাচেতস, গর্গ এবং সম্বরের দৃষ্টি আড়াল করার জন্যে গোপনে জননীকে লুকিয়ে রেখে ছিলেন ঐ দ্বীপে। ওখানেই ঘর আমাদের। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?

এক ঝাঁক পাখি কলরব করতে করতে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। সিন্ধু থেকে বয়ে এল শীতল হাওয়া। কশ্যপের দেহ জুড়িয়ে গেল। মোহগ্রস্তের মত বালকদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বিষণ্ণ কণ্ঠে উচ্চারণ করল: পুত্র, আমার হাত ধর। আমার পা টলছে, মাথা ঘুরছে।

অবোধ চোখ তুলে প্রশ্ন করল হিরণ্যকশিপু—কেন পিতা?

হিরণ্যাক্ষ প্রশ্ন করল: কি হয়েছে তোমার?

একটা অক্ষম আক্ষেপে মাথা নাড়ছিল কশ্যপ। বলল: তোমার মায়ের অন্তর্ধানের সংবাদ পেয়ে আমি কালিবঙ্গান ধ্বংস করেছি। রক্তে মাখা সে সব ছবি—ওঃ। ভুলতে পারছি না।

যন্ত্রণায় বুক চেপে ধরল। লজ্জা গোপনের জন্য অন্য হাতে চোখ ঢাকল। হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু তার বাহুতে হাত রাখল। একটা গভীর সান্ত্বনার ভাষা ছিল সে হাতের ছোঁয়ায়। কশ্যপের নীল চোখের তারায় উপছে পড়া অশ্রু গাড়িয়ে পড়ল ওদের হাতে। বালকদ্বয় কয়েক মুহূর্তের জন্য বিব্রত এবং অস্বস্তি বোধ করল। তারপর তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য হিরণ্যকশিপু বলল: পিতা দুঃখ কর না, এ যন্ত্রণা একদিন শেষ হবে তোমার। জননীকে দেখলে মন থেকে রক্তাক্ত স্মৃতির বেদনা মুছে যাবে। তখন মনে হবে, জীবনটা আমাদের এক অজ্ঞাত শৃংখলে বন্দী। সেই বন্দী দশার মধ্যেই আমরা আছি সবাই। ক্রোধ প্রতিহিংসার ভেতর মাঝে মাঝে মুক্তির কিছু কিছু স্বাদ ভোগ করা যায়।

হিরণ্যকশিপুর কথাগুলো তাকে চমৎকৃত করল। অন্তরে এক অননুভূতপূর্ব শিহরণ অনুভব করল। তড়িৎ প্রবাহের মত তার জীবনকে স্পর্শ করে একটা অসাধারণ আলোড়ন এনে দিল তার জীবনচিন্তায়। মনে আনল এক নতুন সুরের ছন্দ। হিরণ্যকশিপুর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে তার দৃষ্টি দূর ভবিষ্যতের অনেক গভীরে চলে যায়। চোখের উপর তার এক সাধকোচিত মূর্তি ভাসে। একদিন পুত্র তার রাজর্ষির সম্মান পাবে এই প্রত্যয়ে দৃঢ় হল মন। এক অনির্বচনীয় আনন্দের পুলকানুভূতিতে সে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। মুগ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। মনে মনে উচ্চারণ করল কাশ্যপেয়দের রাজা হবে এই পুত্র।

হু-হু করে ঝর্ণার জল নেমে আসে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। খল খল আওয়াজ তুলে তীব্র বেগে ছুটে চলেছে। বিশাল অজগরের মত এঁকে বেঁকে চলেছে সিন্ধুর মোহনায়। সেইদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে শুনতে পায় দিতির কণ্ঠস্বর: আমার সুর যাবে তোমার সঙ্গে। একদিন আমার সন্তান ফিরিয়ে আনবে তার পিতাকে। ···তোমাকে ভালবাসি বলেই এমন করে অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দিতে পারছি। আমার প্রেম তোমায় পথ দেখাবে।

পিতা, পাতালপুরীতে যাবে না তুমি ?

মাথা নাড়ল কশ্যপ ! সম্মোহিতের মত বললঃ যাব পুত্র ।

তারপর একটা উত্তেজনার ভেতর কশ্যপ পথ চলতে লাগল। মনে হল, পথ ফুরোচ্ছে না। সময় দীর্ঘতর হচ্ছে।

দিতিকে দেখে কশ্যপ অবাক হল। মুখে তার কথা সরল না। প্রস্তরবৎ আচ্ছন্নতায় নিশ্চল হয়ে রইল।

নির্জন এক উপবন প্রান্তে রচনা করেছে সে প্রেমের কুঞ্জ। সেখানে সে স্থাপন করেছে কশ্যপের শিলামূর্ত্তি। অশ্রু অর্ঘ দিয়ে পুজা করছিল দিতি। পূজা নয়, কল্পনায় কথা বলছিল, আর দু'চোখের কোণ দিয়ে অশ্রু গণ্ড বেয়ে নামছিল। প্রাণে যত আবেগ যত ভালবাসা সব সে নিঃশেষ করে দিচ্ছিল পাষাণকে। দিতির অবস্থা দেখে কশ্যপের চোখে জল এল। অন্তরের যত প্রেম-শিশির সব দিয়ে সে সিক্ত করল ঐ শিলামূর্ত্তি। পাষাণ তার প্রেমের পরশ পেয়ে সজল ও সজীব হল।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার মধ্যে কাটল। আচ্ছন্নতার মধ্যে সে শুনতে পেল হিরণ্যকশিপুরের কণ্ঠস্বর। ফিস্ ফিস্ করে সে যেন তার কানে কানে বলছেঃ পিতা জননীকে দেখলে মন থেকে কালিবঙ্গানের রক্তাক্ত স্মৃতির বেদনা মুছে যাবে। হিংসার রক্তাক্ত রূপ স্মরণ করে শান্ত হবে, নির্মল হবে তোমার অন্তর। প্রকৃতপক্ষে যাদের রক্তে তোমার হাত রাঙা করেছ জননীর জীবন তাদের জন্যেই হয়েছে বেদনা বিড়ম্বিত এবং অশ্রুময়। বাতাসে বাতাসে প্রতিহিংসার সেই সংবাদ পাতালপুরীতে পৌঁছল একদিন। আমাদের পিতা সম্পর্কে সেদিন প্রথম গর্ব জাগল। পিতা আমাদের দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন কর্ত্তা। ভাবতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম আমরা। দুঃখ অভিমান ত্যাগ করে, জননীর শত নিষেধ উপেক্ষা করে আমরা চানহুদড়োয় গেলাম।

রক্তে শিহরণ জাগল কশ্যপের। আচ্ছন্নতা দূর হল। ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠে বাতাসের স্বরে উচ্চারণ করল—দি-তি-ই।

আকস্মিক অপ্রস্তুত আহ্বানে চমকে উঠল দিতি। কেঁপে গেল তার শরীর। ঝটিতি ফিরে তাকাল পশ্চাতে। কোটরাগত দুই

চোখের কোটরে পড়েছে সমাপ্ত জীবনের ছায়া। তার দেহ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যৌবনের রূপ। কঙ্কালসার দেহে লেগেছে সন্ন্যাসিণীর বৈভব। অশ্রুসিক্ত ভগ্নবচনে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল : কে ? কে ?

সবিস্ময়ে দেখল কশ্যপ তার দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়িয়ে। দু'পা এগিয়ে সে স্থানু হয়ে দাঁড়াল। নিশ্চল হয়ে গেল তার আঁখি তারা। কয়েক মুহূর্ত এইভাবে কাটল। তারপর কেমন একটা সন্দিগ্ধ সন্ধানী দৃষ্টিতে তার মুখে দেখতে লাগল পুত্রদ্বয়ের ছায়া। দিতির দিকে তাকিয়ে কশ্যপ শঙ্কিত হল। স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা তাকে যত কষ্ট দিল তার চেয়ে বেশি কষ্ট পেল তার নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার প্রতিবিম্ব দেখে। অন্তর তার সহানুভূতিতে কেঁদে উঠল।

সজল নয়নে কশ্যপের দিকে তাকাল দিতি। অব্যক্ত আকর্ষণের অনবদ্য সেই দৃষ্টি যা কশ্যপকে বেঁধে রেখেছিল। দুর্বলতার মোহ বন্ধন যা কখনও ছিন্ন হতে দেয়নি। সেই দৃষ্টি রাখল তার চোখের উপর। আবেগ গাঢ় স্বরে ডাকল আর্য-পুত্র ! কেমন আছ ? তোমাকে দেখতে কত সুন্দর হয়েছে।

বিহ্বল কশ্যপ সম্মোহিত স্বরে উচ্চারণ করল : দিতি আমি এসেছি, তোমাকে নিয়ে যাব আমার রাজ্যে '

আচ্ছন্ন গলায় প্রশ্ন করল—

কেন প্রিয়তম ?

তোমার বেদনা মর্মে মর্মে অনুভব করছি। তুমি অবলম্বনহীনা হয়ে এইভাবে জীবন কাটাবে একথা ভাবতে বেদনা বোধ করছি। প্রিয়া আমার, তোমার জীবনের সমস্ত আরাম, সুখ যারা কেড়ে নিয়েছে, যে প্রতারক, যে দস্যু তোমাকে দুঃখিনী ভিখারিণী করেছে তাদের সমস্ত স্পর্ধাকে আমি চিরতরে স্তব্ধ করে দিয়েছি। তাদের রক্তে বহুকালের জমা পাপ ধুয়ে মুছে গেছে। যে ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, সামন্ত এবং ওঝাদের তোমার ভয় ছিল আমার রাজ্য থেকে তারা চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এ বসুন্ধরাকে এক সুখের স্বর্গরাজ্য করে যাব আমি।

যন্ত্রণায় মাথা নাড়ছিল দিতি। দু'চোখের কোণ বেয়ে জলের ধারা

নামল। ভাঙা গলায় বলল ঃ তা হয় না প্রিয়তম। আমাকে নির্জনে নীরবে প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।

প্রায়শ্চিত্ত! বিস্ময়ে আর্ত্তনাদ করল কশ্যপ।

দুই হস্তে মুখ আবৃত করে সে শিশুর মত ককিয়ে কেঁদে উঠল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল ঃ আমার দেশের মানুষের জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে দাও এই নির্জনে। প্রিয়তম, তোমার প্রেম মরীচিকার মত। শুধু তৃষ্ণা বাড়ায়। দুঃখ দেয়। দূরে সরিয়ে দেয়। আমার হৃদয় দেবতাকে এই নির্জনে প্রেমপুষ্প দিয়ে অশ্রুর অর্ঘ্য দিয়ে, কল্পনার গল্প রচনা করে প্রতিদিন পুজো করব।

দিতির কথার মধ্যে উত্তেজনা নেই; শান্ত, কিন্তু কণ্ঠস্বরে ছিল একটা সুগভীর প্রত্যয়। তার দৃঢ়তায় মত কশ্যপ চমকে উঠল। অসহায় গলায় বলল ঃ এই নির্জন বনপ্রান্তরে একাকিনী বাস করার অভিলাষ ত্যাগ কর তুমি। বহু প্রত্যাশা নিয়ে আমি এসেছি।

প্রিয়তম ক্ষমা কর। আমি পারি না ফিরে যেতে। কি নিয়ে থাকব সেখানে? যে প্রেম নিয়ে তোমার গর্ব, সে প্রেম হিংসায়, বিদ্বেষে নিষ্ঠুর। কলুষিত সেই প্রেম আমার জীবন অভিশাপের মত। রক্তের হোলিখেলা এদেশে হয়নি কখনও। তাই বেদনাময় মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্ত করে সন্তানদের নিষ্ঠুর এবং নির্লোভ হওয়ার এক শিক্ষা দিয়ে যাব। এই নির্জন বনপ্রান্তে বসে আমি তোমার পাপমুক্তির তপস্যা করব। তুমি ফিরে যাও প্রিয়তম।

কশ্যপ মনে মনে গভীর বেদনাবোধ করল। ক্লান্ত স্বরে বলল ঃ ফিরে যাব বলে আসিনি প্রিয়তম। তোমার বেদনা যে কত গভীর আমি উপলব্ধি করেছি। প্রেম ও কল্যাণের যে স্বর্গরাজ্য আমি গড়েছি সেখানে নিয়ে যাব তোমায়। অপার শান্তি ও আনন্দ পাবে। আমিও ক্লান্ত প্রিয়তম। জীবনের হিসাব নিকাশ শেষ করে পুত্র হিরণ্যকশিপুকে সব সমর্পণ করে আমিও বিদায় নেব।

একথা বলছ কেন? তোমায় কষ্ট দিয়ে কোন বড় সুখ আমি চাই না। আমি যাব তোমার সঙ্গে।

ব্যথার আবেগে থর থর করছিল দিতির বুক। কণ্ঠ চেপে বলল : আমার পাওয়া এখনও তৃপ্ত হয়নি। সাধ পূরণ হয়নি। বাসনা অতৃপ্ত। তোমায় ছেড়ে আমি কি নিয়ে থাকব ?

দিগন্তের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কশ্যপ বলল : ছাখ আকাশের কত উঁচু দিয়ে বলাকারা চলেছে। নতুন অন্বেষণে তারা শুধু চলছে। ওরা কখনও থেমে থাকে না। প্রেম ওদের সম্বল। কিন্তু মন তাতে বাধা পড়ে না। ওরা শুধু চলতে চায়, দেখতে চায়, জানতে চায়।

কশ্যপের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল : তোমার সব কথা বুঝতে পারি না। হেঁয়ালির মত লাগে। পাখির কথা হঠাৎ মনে হল কেন তোমার ? পাখীর সঙ্গে মানুষের তুলনা হয় কখনও ? ওরা শুধু প্রাণধর্ম পালন করে। মন বলে কিছু নেই। মায়া-মমতায় জড়ায় না নিজেকে।

সৃষ্টির ধর্ম হল শুধু এগিয়ে চলা। থামলে তার তালভঙ্গ হয়। গতির ছেদ পড়ে। আমি চাই দিকে দিকে মানুষের জয় যাত্রার বিজয় কেতন উড়িয়ে দিতে। তার জন্যে নব নব দুঃখ কষ্ট বরণ করতে হবে।

এত দুঃখ কষ্ট পেয়েও তোমার তৃষ্ণা মিটল না প্রিয়তম।

ঈশ্বর এক একজন মানুষকে শুধু কষ্ট দেবার জন্যে পাঠান। তারা কষ্ট পায়, কষ্ট দেয়। কষ্টের বেদনায় তাদের জীবন গড়া।

তোমার কথা শুনলে আমার শিহরণ জাগে। সব কথা বন্ধ হয়ে যায়। ভয় হয় শুধু রক্তপাতের।

হাসল কশ্যপ। দিতির কোটরগত চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল : আর রক্ত নয়। রক্তে মনের শ্রী কল্যাণ পবিত্রতা হারিয়ে যায়। তবু রক্তেই তার বিশুদ্ধতা। রক্ত ছাড়া দেবী সন্তুষ্ট হয় না। রক্ত এবং রাঙাজবাও চাই তাঁর পূজায়। লাল রঙের মহিমা এমন। আজ যে অমৃতলোকের সন্ধান তুমি আমাকে দিলে তার সাধনা করব আমি। সমস্ত জীবন ধরে তার তপস্যা করে প্রায়শ্চিত্ত করব পাপের।

তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে উদাত্তস্বরে উচ্চারণ করল।

ওঁ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষ্যং শান্তিঃ

পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ
বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে দেবাঃ শান্তিঃ
ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্ব্বং শান্তিঃ
শান্তিরেব শান্তি সা মা শান্তিরেধি।

দিতির কণ্ঠে কশ্যপের ঐ শান্তিমন্ত্র স্বভাষায় উচ্চারিত হল :

"দ্যুলোকেতে শান্তি হোক, ভূলোকের শান্তি হোক্।
অন্তরীক্ষ হোক্ শান্তি ভরা।
ওষধি ও বনস্পতি শান্তিময় হয়ে থাক
সলিলে বহুক শান্তি ধারা।
দেববৃন্দে শান্তি হোক্, ব্রহ্মে শান্তি হোক স্থির
নিখিল হউক শান্তিময়,
শান্তি হোক, শান্তি হোক সর্বদিক
আমাদের শান্তি যেন হয়।"

॥ সাত ॥

অদিতি এবং কশ্যপের পুত্র ইন্দ্র, আদিত্য, বিবস্বান, বিষ্ণু বিপর্যস্ত ভেলায় ডুবে যায় নি। কাষ্ঠখণ্ডের শিকল বন্ধন তাদের দিকটা অটুট ছিল। কেবল কশ্যপ একা ভেসে গিয়েছিল। কিছুই করার ছিল না তাদের। অন্য একটি স্রোতের আবর্তে তাদের ভেলা ভিন্ন দিকে ঘুরে গেল। দুরন্ত স্রোতে ভাসতে ভাসতে এক গিরিচূড়ায় পৌঁছল তারা। সেখানে ঠাঁই নিল। অদিতিকে হাত ধরে তারা ভেলা থেকে টেনে তুলল গিরিশীর্ষে।

কশ্যপের শোকে মন ভারাক্রান্ত। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আশ্রয়ের ভাবনায় বিচলিত এবং বিভ্রান্ত।

কিন্তু থামলেও চলবে না। সামনে সুউচ্চ হিমালয়। সমস্ত

পাহাড়টা তারা ডিঙিয়ে চলল। অতিক্রম করল বহু-ভূভাগ, গভীর জঙ্গল, উত্তাল নদী, কোথাও বা বাঁশের সাঁকোয়, কোথাও রজ্জুপথে। সে পথ যাত্রার অভিজ্ঞতা, ব্যথা, দুঃখ, কষ্ট তারা ভুলতে পারে না, ভুলতে পারে না পথে পথে অসভ্য বর্ব্বর মানুষদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের কাহিনী। এদের জীবনযাত্রা আচার প্রথা'র সঙ্গে অদিতি পুত্ররা মানিয়ে নিতে পারল না। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে তারা এক আলাদা পৃথিবীর অধিবাসী হয়ে রইল। প্রবল প্রবৃত্তিবেগে উপজাতীয় রমণীদের সঙ্গে মিলিত হল। উপজাতীয় পুরুষদের সাহায্যে তারা দুর্গম যাত্রাপথের বাধা দূর করল। বিবাদ বিভেদের অন্তঃস্রোতের আবর্ত্ত রচনা করে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে কোন্দল বাঁধিয়ে, অবিশ্বাস, সন্দেহ, ঘৃণার বিষ পরিবেশ তৈরী করে এবং বিবদমান দলের সংঘর্ষকে অনিবার্য করে, নিরপেক্ষের ছল করে, হিতৈষী সেজে আদিম উপজাতিদের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করে তাদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করল। উপনিবেশ গড়ল। তারপর আবার নতুন ভূমির সন্ধানে যাত্রা করল। এমনি করে তাদের যাত্রা রইল অব্যাহত। নিজেদের তারা বিধাতার দূত বলে অভিহিত করল।

এগোতে গিয়ে কত বাধা এল পথে, সংকটের মুখোমুখি হল তবু, থেমে গেল না। কশ্যপের স ান করতে করতে তারা এসে দাঁড়াল ঝিলাম নদীর তীরে। স্মৃতির ব্যথা ভরা দেহের ক্লান্তি দূর করতে তারা শীতল ধারায় স্নান করল। অবগাহনের পর শান্তি এল মনে। মনে হল, বহুকাল পর তারা বাসস্থানের যোগ্যভূমি পেল।

গোল হয়ে বসল অদিতির পুত্ররা। জ্যোতির্ময় সপিতৃদেবকে স্মরণ করতে গিয়ে মন ভরে গেল স্তবে। প্রাণ ভরে উঠল তার মহিমা গানে। সর্বত্রই আছে সবিতৃদেব। সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র চরণ তাঁর। সমস্ত পৃথিবীকে ব্যপ্ত করে আছেন। দেশ থেকে বেরিয়েই বুঝতে পারল সূর্য আছেন সর্বত্র। সব দেশের মানুষ পূজা করে তাঁকে। হাজার হাজার লোকের নয়ন মণি হয়ে আছেন তিনি। পরম নির্ভরতায় প্রাণে খুশির সুর ভরে উঠল। উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করল ঃ

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।...
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

অকস্মাৎ ইন্দ্রের মুখে এরকম একটা ঋক্ উচ্চারিত হওয়ায় বিস্মিত হল অদিতি। স্তব্ধ দৃষ্টি মেলে ইন্দ্রের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। ধ্যানভঙ্গ হওয়ার পর ইন্দ্র সবিস্ময়ে মাতার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল: জননী কিছু বলবে?

পুত্র তোমার ঋকে কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্ শব্দ দুইটির মনোহর সংযোজনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তোমার পিতার নামের সঙ্গে সবিতৃদেবের বন্দনা সংযুক্ত করলে কেন? কাশ্যপেয় নামের আকর্ষণ আমি ভুলতে পারছি না।

জননী আকাশের এক নাম কশ্যপ। সবিতৃদেবের উজ্জ্বল কিরণ মালায় বিশাল আকাশ দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে। তেমনি তোমার পুলকিত শিহরণে এ দেশের মাটিও কেঁপেছে। এ দেশের যে নামই থাকুক আমরা এর নাম দিলাম কশ্যপ মেরু (বর্ত্তমান কাশ্মীর রাজ্য)। কশ্যপের সন্তানদের নিজস্ব একটা ভূমিও চাই। কশ্যপমেরু তাদের সেই নিজের অঞ্চল। কিছুকাল বিশ্রামের পর আবার তারা অগ্রসর হল। কশ্যপকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত থামবে না তারা। কোথায় কশ্যপ? এই প্রশ্নে প্রশ্নে এগিয়ে চলল তারা। যাওয়ার পথে হিমালয়ের শিখরে শিখরে যে সব ঝর্ণার জল অবরুদ্ধ ছিল, তাদের প্রবাহকে মুক্ত করে দিল তারা। মুক্তধারা অনুসরণ করে তারা সমতলভূমির দিকে নেমে এল। প্লাবিতস্থল অতিক্রম করে তারা এসে দাঁড়াল সপ্তসিন্ধু দেশে। নদী বাহিত বালু ও পাথরে তৈরীদ্বীপের মতন দেশকে এ দেশের মানুষরা বলে দেব-নির্মিত দেশ। সে দেশের লোক নিজেদের কাশ্যপেয় বলে পরিচয় দেয়। কাশ্যপেয়র প্রশংসায় পঞ্চমুখ তারা। কাশ্যপেয় শুনে বিস্মিত হল ইন্দ্র। বুকে তাদের তুফান। থমকে দাঁড়াল তাদের যাত্রা। প্রশ্ন জাগল: কোন্ কশ্যপ? এই কি তাদের পিতা? কোথায় বাস তার? কোথা হতে সে এল? কেমন করে সৃষ্টি করল বিরাট বিশাল এই বংশ? মনের এই অতলান্ত

জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে অদিতির পুত্ররা বেড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন দিকে।

অবশেষে দেখা হল কশ্যপের সঙ্গে। সেও এক আকস্মিক ঘটনা। কশ্যপের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব বন্দী করেছিল ইন্দ্র। অশ্বকে মুক্ত করতে এল কশ্যপ। হঠাৎ অদিতি এবং তার পুত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল কশ্যপের। পিতার সঙ্গে পুত্রের, পতির সঙ্গে পত্নীর মিলনের সে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত।

অশ্বের লাগাম ধরে অদিতিকে দাঁড়িয়ে থাকতে বিস্মৃত হল কশ্যপ। তৎক্ষণাৎ তার মুখে কোন কথা জোগাল না। অবাক বিস্ময়ে তার চোখে চোখ রেখে সে তার হারানো অতীতকে খুঁজছিল। আর মাথা নাড়ছিল। অদিতির হৃৎপিণ্ডে যেন স্পন্দন নেই, বজ্রাহত চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে। মৃদু ঠোঁট কাঁপছিল, কথা বলতে পারছিল না।

অবাক জিজ্ঞাসু চোখে ইন্দ্র কশ্যপের দিকে তাকাতে গিয়ে চকিতে একবার ঘাড় বেঁকিয়ে আড় চোখে জননীকে দেখে নিল। কশ্যপের বুক ধক্ ধক্ করে উঠল উদ্বেগে। বিভ্রান্ত বিস্ময়ের মধ্যে কিভাবে কথা সূচনা করবে ভেবে পেল না কশ্যপ। অনুরূপ বিব্রত বিহ্বলভাব অদিতিরও।

একটা দ্বিধাগ্রস্ত অস্বস্তি নিয়ে তারা এ-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামায় ও আবার তাকায়। এমনি করে কেটে গেল অনেকক্ষণ। তবু কেউ সহজ, স্বাভাবিক হতে পারল না। ওদের জীবনের মাঝখানে বিশটি বসন্তের ফাঁক। আয়ু থেকে জীবনের বিশটি বসন্ত ঋতু ঝরে পড়েছে। মধ্যের সেই ব্যবধান ভরা হয়ে আছে কশ্যপের অন্য এক জীবন। কিন্তু অনুভূতিতে কুড়িটি বসন্তের আগের অনুরাগ, মমতা, স্নেহ প্রেম অটুট রয়েছে। বুকের সেই ভালবাসার স্রোত, ব্যাকুলিত তৃষ্ণার সেই কষ্ট, উদ্বেগের আকৃতি আবিষ্কৃত রয়েছে। কেবল তার তাজা ভাবটি গেছে। নিশ্চল চোখের তারায় তার প্রতিবিম্ব যেন পড়ল। চোখের চাহনিতে তার সঙ্গে মিলতে না পারার আকৃতি তীব্র যন্ত্রণায় ক্রিয়াশীল।

কশ্যপই বেশি অস্বস্তিবোধ করছিল। কেমন অস্বাভাবিক লাগছিল তার। নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হল। অন্ততঃ তাদের নীরবতা তাকে দোষী করে তুলল। এই অস্বস্তির কারণ যে মনোবিকার তা কশ্যপের নিজের অজ্ঞাত। তবু মনে হল, দনু দিতির চিন্তাই তাকে সংকুচিত করে রেখেছে। নিজের দুর্বলতার কাছে সে কেমন অসহায় বোধ করে। তাই একটা ভীষণ মনকষ্টে সে কষ্ট পাচ্ছিল। জীবনের বাস্তবতা কি অভূতপূর্ব, তাই দেখে বিস্ময়বোধ করল। আস্তে আস্তে নিজেকে চাঙ্গা করে তুলল।

অদিতির মুখের দিকে কষ্ট বিদ্ধ যন্ত্রণায় তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল: প্লাবনে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম, কিন্তু মরিনি কেউ। বুকের মধ্যে অন্তহীন আকূতি নিয়ে পরস্পরের প্রতীক্ষা করেছি। অবশেষে বহুকষ্টে বাঁচানো জীবন নিয়ে আমরা সকলে মিলতে পেরেছি। এই মিলনের আনন্দও আছে যন্ত্রণাও আছে। অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানকে মেলানো যায় না, তবু, স্বস্তির জন্যে, শান্তির জন্যে, বাঁচার জন্যে তা করতে হয়।

কশ্যপের কণ্ঠে কৈফিয়তের সুর। অদিতি গভীর অনুসন্ধিৎসু স্থির অপলক চোখে কশ্যপের চোখে কয়েক পলক ন্যস্ত থাকে। রাগ বা ঘৃণা বা ধিক্কারের কোন তীব্রতা নেই তার মুখে। চোখের কোন বসা শীর্ণ মুখে নেই কোন অভিযোগ কিংবা ভৎর্সনার অভিব্যক্তি। আচ্ছন্ন স্বরে বলল: ও কথা, বলছ কেন? জীবন পাত্রের শেষ তলানিটুকু নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত জীবনের সঙ্গে সন্ধি করে যাব। পুত্রেরাও অমান্য করবে না পিতার আদেশ।

কশ্যপ আবেগহীন চোখে অদিতির চোখের দিকে তাকাল। ইন্দ্র, আদিত্য, বিষ্ণু, বিবস্বান, অর্যমার মুখ গম্ভীর। চোখের দৃষ্টি শাণিত।

প্রথম সাক্ষাতের আচরণ আন্তরিকতায় বিধৃত হল না বলে একটা নিরুদ্ধ যন্ত্রণায় কশ্যপের অন্তর ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল।

অদিতি দিতি দনু এবং তাদের পুত্র নিয়ে কশ্যপের সংসার। কিন্তু

কশ্যপের বংশ আরো বড়। প্রজা মানেই সন্তান। সেই সন্তানের সংখ্যা অগণ্য। অশ্বমেধ যজ্ঞের পর রাজ্যের আয়তন বড় হল, লোক সংখ্যা আরো বাড়ল। ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষিদেশ জুড়ে তার স্বপ্নের সাম্রাজ্য। অঞ্চলগুলির দেখাশোনা এবং শাসনের ভার দেয়া হল যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে। পদমর্যাদা অনুসারে তাদের কারো উপাধি দেয়া-হল অসুর, দানব, রাবণ, কাকুস্থ, সুর, দক্ষ। কশ্যপের বিরাট আর বিশাল বংশের ঠাঁই মেলা ভার হল ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষিদেশে। পূর্বদিকে রাজ্য সম্প্রসারিত হল। বিশাল ভূভাগের নতুন নামকরণ হল আর্যাবর্ত।

একজীবনের এত বড় সাফল্য কশ্যপকে তৃপ্ত করল না। বরং, একটা দুরন্ত দুর্ভাবনা তার চিত্তের শান্তি হরণ করল। নিয়তির অমোঘ সংকেতরূপে অদিতির পুত্রদের সঙ্গে তার দেখা হল। না হলেই হয়ত ভাল ছিল। নানাবিধ ঘটনায় তার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হল। আর একটা আতঙ্ক এবং দুর্ভাবনায় তার মন আচ্ছন্ন হল। কিছুতে মনকে ভারমুক্ত করতে পারছিল না। বহু কষ্টে বহু ত্যাগ এবং সাধনায় যে সাম্যের স্বর্গপুরী নির্মাণ করল তা কি শুধু অদিতি পুত্রদের জন্যে ভেঙে যাবে? মনের এই আকুল করা জিজ্ঞাসায় তার চিত্ত ক্ষত বিক্ষত হল। ইন্দ্রের উদ্ধত অসংযত, সৌজন্যহীন আচরণ কশ্যপকে শঙ্কিত করল। ইন্দ্রের কথা চিন্তা করলে তার বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। যন্ত্রণার গভীরে ডুবে নিঃশব্দে মাথা কোটে। সে ব্যথা কষ্ট দুঃখের কোন সান্ত্বনা নেই, তার কোন সাথীও নেই। একাই সে তার ভারবাহী।

ধার্মিকশ্রেষ্ঠ সদাচারী দিতি নন্দন হিরণ্যকশিপুকে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঋত্বিক করার দিন থেকে ইন্দ্রের অস্বাভাবিক অসঙ্গত আচরণগুলো একের পর এক তার চোখের উপর ভাসতে লাগল।

অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বকে স্নান করিয়ে এনে বলিদান দিয়ে যখন অগ্নিতে আহুতি দেয়া হল তখন অদিতির পুত্রদের কেউ ছিল না সেখানে। ইন্দ্র আপন মনে দূরে বসে সোম পান করছিল।

নেশায় তার চোখের পাতা জড়িয়ে আসছিল। একটা ঘুম ঘুম ভাবে সে আচ্ছন্ন। তবু সোম পানে বিরতি ছিল না। যজ্ঞের ব্যাপারে তার কোন উৎসাহ বা কৌতূহল ছিল না। একটি বৃক্ষমূলে বসে সে নেশায় ঝিমোচ্ছিল।

যজ্ঞবেদী থেকে কশ্যপ হঠাৎ দেখল কর্মকার ঘরের মেয়ে ইন্দ্রানীকে ইন্দ্র ডাকছে ইশারায়। ইন্দ্রানী তার দিকে তাকিয়ে ফিক্ করে হেসে নিজের কাজে চলে গেল। ইন্দ্র এবার তার নাম ধরে ডাকল। কিন্তু ইন্দ্রানী কোন সাড়া দিল না। দেখলও না পিছন ফিরে। তার উপেক্ষা ইন্দ্রের মর্মে বিঁধল। নেশা ছুটে গেল। কামার্ত্ত পশুর মত ছুটে গিয়ে তার হাত ধরল। উত্তেজনায় ঠক্ঠক্ করে কাঁপছিল। ধক্ ধক্ করে জ্বলছিল দুই চোখের তারা। ইন্দ্রের প্রমত্ত রাঙা দুই চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেল ইন্দ্রানী। মুখে আতঙ্ক ফুটে উঠল। অসহায় চোখ দুটি দিয়ে তার মিনতি জানাচ্ছিল। ইন্দ্রের মুঠো থেকে দু'একবার হাত ছাড়াতে চেষ্টাও করল। কিন্তু ব্যর্থ হল তার কৌশল।

ইন্দ্র হাঁফাচ্ছিল। কামনার আগুন জ্বলছিল তার দুই চোখে। মুখের অভিব্যক্তিও সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। পেশী গ্রীবা তার শক্ত হল। ফুলে উঠল হাতের শিরা। ভয়চকিত ইন্দ্রানীর দিকে তাকিয়ে কোন করুণা জাগল না ইন্দ্রের। চোখের নিমেষে পাথুরে রঙের মজবুত শরীরটা কাঁধে নিয়ে সে দৌড়তে লাগল ঝোপের দিকে। ইন্দ্রানী অসহায়ভাবে উরুদ্বয়ে নিম্নাংশ জোরে জোরে ছুঁড়তে লাগল। দেহটা সোজা করে কয়েকবার লাফিয়ে নামার চেষ্টাও করল। কিন্তু ইন্দ্রের শক্ত হাতের বন্ধন আলগা করতে সমর্থ হল না।

তখন মন্ত্র উচ্চারণ এবং চিৎকার আরো জোরদার হল। নৃত্য-গীতের আনন্দ কলরবে তখন মাতোয়ারা সব। ইন্দ্রানীর সাহায্যের আকুল প্রার্থনা ডুবে গিয়েছিল হৈ হুল্লোড়ের ভেতর।

কশ্যপ মর্মাহত। ইন্দ্রের কাজের জন্যে তার লজ্জা করছিল। এ দৃশ্যের দর্শক হয়ত তার মত আরো কেউ কেউ থাকবে। থাকাটা

স্বাভাবিক। তারা কি মনে করল? কি ভাবল? ভেবে কশ্যপের অন্তর ছিঃ ছিঃ করে উঠল। ইন্দ্র তার সুনাম নষ্ট করল। এই দুঃখে কষ্টে সে ভীষণ অন্যমনস্ক হল! কশ্যপ জানে, এই মুহূর্ত্তে ইন্দ্রের ব্যাভিচারের কথা কেউ তুলবে না। কিন্তু ভুলেও যাবে না। গোপনে একদিন নিন্দা, কুৎসাই ভয়ংকর হয়ে কাশ্যপভূমিকে ধ্বংস করবে। এই ভাবনায় তার মন পুড়তে লাগল। আহুতি দেবার সময় তার মন মন্ত্রের প্রতি ছিল না। ইন্দ্র তার সব মনসংযোগ কেড়ে নিল।

এক সময় যজ্ঞের মন্ত্রপাঠ স্তব্ধ হল। কশ্যপ সচকিত হল। হিরণ্যকশিপু পিতার পদযুগল স্পর্শ করে প্রণাম করল। তার আশীর্ব্বাদের প্রতীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু কশ্যপ এক অন্যমনস্কতার জগতে নির্বাসিত। তার উদাস গম্ভীর দুই চোখের দিকে স্থির অপলক চোখে তাকিয়ে হিরণ্যকশিপু বলল: পিতা, আপনাকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে। আপনার এরূপ চিত্ত চাঞ্চল্য আগে দেখিনি কখনও। কি হয়েছে আপনার? যজ্ঞান্তে আপনি আশীর্ব্বাদ করবেন না আমায়?

আত্মসম্বিত পেল কশ্যপ। বিব্রত লজ্জায় তার মুখ রাঙা হল। অন্যমনস্কতার জগত থেকে সহসা প্রত্যাবর্ত্তন করার জন্যে কণ্ঠে তার বিচলিত ভাব এবং দ্বিধা প্রকাশ পেল।—এ্যাঁ। এ্যাঁ। ঠিক বলেছ। ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিল পুত্র। আমার অন্যমনস্কতার জন্য অনুতপ্ত।

বিচলিত বিস্ময়ে হিরণ্যকশিপুর কণ্ঠ দিয়ে একটা আর্ত্ত স্খলিত অস্পষ্ট শব্দ উচ্চারিত হল: পিতা!!

বৎস, আমার পুত্রদের মধ্যে অগ্রগণ্য তুমি। তোমার শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষয় হোক, অমর হোক তোমার কীর্ত্তি। অপুত্রক দক্ষর সিংহাসন তোমায় দিলাম। রাজর্ষি হও। প্রত্যেকের সঙ্গে সদ্ভাব রাখবে, সাম্যে বিশ্বাসী হবে, মনুষ্যত্ববোধে অচল থাকবে, শির অবনত করবে না।

আত্মশক্তিতে শক্তিমান হও। মনে রেখ, রাজ্যের লোভে, অর্থ এবং নারীর লোভে যত অনিষ্ট হয়। মানুষের ইন্দ্রত্ব নষ্ট করে ক্রোধ, বিদ্বেষ ঘৃণা, কাম, মোহ। এগুলি থেকে দূরে থাক। কর্মেই মানুষের পরিচয়। কর্মের মধ্যে আত্মার জাগরণ ঘটে। পরের জন্য প্রাণ কাঁদবে, আত্মসুখের থেকে পরের সুখ হবে শ্রেষ্ঠ এই বোধই মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব এবং অমরত্ব দেয়। এই কর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও অধম আছে।

জানি পিতা। তাই দেবত্বকে আমি ঘৃণা করি। দেবতা হলেন পরম ভোগী। নিতান্ত ভোগ বিলাসীর পদ ওটা। আকণ্ঠ ভোগের মধ্যে ডুবে আছেন তিনি। সুরা, নারী, ঐশ্বর্য, সম্পদের মধ্যে নিশ্চিন্তে এবং সুখে কাল হরণ করছেন। কর্তব্যচ্যুতির অপরাধ ঢাকতে বলেন, মহামায়ায় আচ্ছন্ন তাঁরা। সৃষ্টি কর্তার সৃষ্টিকে ভুলে থাকার জন্যে তাঁদের অন্তরে নেই কোন বেদনাবোধ। দেবতার নেই কোন ত্যাগ। তিনি সুখী ও আত্মকামী। দেবতার এই স্বার্থপরতা থেকে দূরে থাকার শক্তি যেন আমার থাকে পিতা। দেবতার এই দেবত্বের বিরুদ্ধে অসুরেরা লড়বে চিরকাল। কোনদিন তাদের সঙ্গে সন্ধি চাইবে না।

আনন্দে কশ্যপের দুই চোখ চক্ চক্ করে উঠল। দুই হাতে তাকে অলিঙ্গনাবদ্ধ করে বলল ঃ সাধু, সাধু। তুমি আমায় অবাক করলে। এক অভিনব দিব্য জ্ঞান পেলাম তোমার কাছে। মানুষ যে দেবতার চেয়ে বড়। পূর্ণতর এই অনুভূতি নিয়ে কাজ করেছি, তবু তোমার মত এমন সুন্দর করে প্রকাশ করার শক্তি ছিল না আমার। ত্যাগের শক্তিতে, মহত্বে মানুষ দেবতার চেয়েও বড়।

অকস্মাৎ অট্টহাস্য শুনে চমকে উঠল পিতা পুত্র। ইন্দ্র তাদের কথাবার্তার ভেতর কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল তারা টের পায়নি। পাগলের মত হাসছিল সে। অতিরিক্ত সোমপানের জন্য দেহ তার টলছিল। চোখ দুটি তার জবার মত লাল। ভুরু টান টান করে কশ্যপের দিকে তাকাল। ইন্দ্রের ঘৃণা মিশ্রিত জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টির ভাষা কশ্যপ স্পষ্ট পাঠ করতে পেরেছিল। কশ্যপের প্রতি তার

ধিকৃত জিজ্ঞাসা ও প্রতিবাদ জানাতে ইন্দ্র সোমের পাত্রটা মুখে উপুড় করে দিল। তারপর, খালি পাত্রটা ছুঁড়ে ফেলে দিল কশ্যপের দিকে। টলতে টলতে কশ্যপের দিকে এগোল। সামনা সামনি দাঁড়াল। রাগে অপমানে তাকে দিশাহারা দেখাচ্ছিল। গর্জন করে বলল: চুপ করে থাকব ভেবেছিলাম। কিন্তু বাড়াবাড়িটা আর সহ্য হল না। ইন্দ্র কাউকে প্রশ্ন করে না, কৈফিয়ৎ চায়। বল, ঐ অসুরটা থেকে আমি ছোট কিসে? আমি থাকতে ও কেন ঋত্বিক হল? অসুরকে যজ্ঞে অধিকার কেন দেবে? কেন? সিংহাসনও তুমি ওকে দিয়েছ? কি জন্যে কৈফিয়ৎ চাই।

হিরণ্যকশিপু বিব্রত লজ্জায় অপমানে ক্ষুব্ধ হলেও পিতার বর্ত্তমানে সে কোন কথা বলল না। কেবল তার আদেশ ও নির্দ্দেশ শোনার প্রতীক্ষায় রইল।

কশ্যপ বিস্মিত। গম্ভীর এবং তুষ্ণীভাব অবলম্বন করেছিল! কিন্তু ইন্দ্রের উপর্য্যুপরি প্রশ্নে চিন্তামগ্ন মৌন মুখের পেশী ও রেখায় কাঠিন্যের ঢেউ লাগে। ভ্রূকুটি চোখের দৃষ্টিতে একটা রূঢ়তা ফুটে উঠল। ক্রোধে স্বর রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। নম্র নিচু স্বরে বলল: পুত্র তুমি এখন প্রকৃতস্থ নও।

ইন্দ্র বাঁকানো ফণার মত ঝটিতি মাথা তোলে। ঠোঁটের কোণে বক্র হাসির ঝিলিক দিল। চোখ আগুনের মত দপ্‌দপিয়ে উঠল। ভুরু কুঁচকে গেল। বিস্মিত স্বরে বলল: অপ্রকৃতস্থ! ইন্দ্র সোমে কখনও অপ্রকৃতস্থ হয় না। সোমরসে অষ্টপ্রহর ডুবে থাকলেও ইন্দ্র নির্বোধের মত কথা বলবে না।

অপমানে কশ্যপের কান রি রি করে জ্বলতে লাগল। জলন্ত চোখে বাস্পের সিক্ততা ফুটে উঠেছিল। রুদ্ধস্বরে বলল: হিরণ্যকশিপু এবং তোমাতে প্রভেদ অনেক।

ইন্দ্র দপ্‌ করে জ্বলে উঠল। তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বলল: ফুঃ, একটা নিকৃষ্ট জাতের সঙ্গে শৌর্যশালী বীর্যশালী শ্রেষ্ঠ মানুষের তুলনা

করে গোটা আর্য জাতিকে অপমান করলে, পিতা সত্যই তোমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। বর্ব্বর অসভ্য দস্যুদের সঙ্গে বাস করে তুমি স্বাজাত্য বোধ ভুলেছ।

ইন্দ্রের ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্য দেখে হিরণ্যকশিপু কৌতুক বোধ করল। সে তাকে আরো উত্তেজিত করার জন্যে বলল: নিজের সম্পর্কে তোমার অত্যন্ত আস্থা থাকা সত্বেও পিতা কিন্তু তোমাকে ভরসা করতে পারলেন না। কেন জান?

হিরণ্যকশিপুর মুখে এরকম একটা অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে চমকে তাকাল ইন্দ্র। ঢুলু ঢুলু দুই চোখে টান টান করে প্রশ্ন করল: কেন?

কশ্যপ তার স্বভাবসিদ্ধ সংযম রক্ষা করে বলল, কাজ দিয়ে মানুষের বিচার হয় বটে, কিন্তু তার মনের গতি দিয়েই সে বিচার নিষ্পন্ন হয়।

কশ্যপকে কথা শেষ করতে দিল না। তার আগেই ইন্দ্র অধৈর্য্য হয়ে বলল: ঐ দস্যুটা আমার মত যুদ্ধে নিপুণ নয়। দ্বন্দ্বযুদ্ধে এখনি ও কে পর্যুদস্ত করতে পারি। রাজার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হওয়ার যোগ্যতা না থাকলে তাকে রাজা বলে মানবে কেন?

কশ্যপ ভর্ৎসনা করে বলল: তুমি ভীষণ অস্থির, কোন কথাই শেষ করতে দাও না।

ইন্দ্রের দৃষ্টি ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত। চোয়াল শক্ত। বলল: ঈর্ষায় আমার বুক জ্বলছে। এই অবস্থায় চুপ করে থাকা যায়? ঐ দানবটাকে আমি একটুও সহ্য করতে পারছি না। ইচ্ছে করছে এক্ষুনি বর্শাটাকে ওর বুকে বিঁধিয়ে দিই।

কশ্যপ পলকের জন্য চমকাল। অনুভূতির মধ্যে একটা তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল। কতকগুলো ছিন্নভাবনা মস্তিষ্কের সীমা স্পর্শ করে মিলিয়ে গেল। ইন্দ্র সংঘর্ষ চায়। হিরণ্যকশিপুকে সে শত্রুর চোখে দেখে। ইন্দ্র চায় নিজের গৌরব এবং শ্রেষ্ঠত্ব। তার এই মনোভাবের মূল কোথায়? একে ভাইয়ে ভাইয়ে সংঘর্ষ বলবে, না গোষ্ঠীতে

গোষ্ঠীতে বিবাদ বিদ্বেষ বলবে ? না দুটো মিলে একটা কিছু। এরকম যে একটা কিছু ঘটবে বা ঘটতে পারে কশ্যপ বেশ কিছুকাল ধরে মনে মনে আশঙ্কা করছিল। জীবনের অনিবার্যতাকে বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না। যা অনিবার্য ছিল তাই উলংগ ভাবে প্রকাশ পেল। লজ্জা গোপনের অন্তরালটুকুও পর্যন্ত রইল না। তীক্ষ্ণ বিদ্ধ যন্ত্রণাকে দমন করবার প্রয়াসে দাঁতে দাঁত চেপে শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা করছিল কশ্যপ। গলার কাছে উঠে আসা ধিক্কার তীক্ষ্ণ বিদ্ধ ব্যথায় স্পন্দিত হল—ছিঃ ইন্দ্র! অনেক নিচে নেমে গেছ তুমি। তুমি করুণারও অযোগ্য। ছিঃ!

হিরণ্যকশিপু স্বভাবতঃ একটু কুণ্ঠিত হয়েছিল। ইন্দ্রের বিদ্বেষ ঘৃণা তাকে শংকিত করল। তীব্র আতঙ্কে তার শরীর শক্ত হল। বুকের মধ্যে একটা দম আটকানো কষ্ট ক্লিষ্ট করছিল তাকে। তবু প্রসারিত গোঁফের কোণে প্রসন্ন হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত হল তার। বলল : তোমার বল, সুলভ ক্রোধ, উষ্মা, অহমিকা আমার ভীষণ ভাল লাগছে। কিন্তু বিদ্বেষের আগুনের তাপ সইতে পারছি না। তুমি কি চাও ? সিংহাসন ? নেবে তুমি এর অধিকার ?

তোমার দয়া, ভিক্ষে কে চায় ? অধিকার আমি যুদ্ধে জিতে নেব।

হিরণ্যকশিপু চমকিত বিস্ময়ে যথাসম্ভব স্বাভাবিক স্বরে বলল : ইন্দ্র তুমি বীর এবং ভীষণ দুর্মুখ। তবু, নির্ভীক তুমি। তোমার দুঃসাহস স্পষ্টবাদিতা এবং উচ্চাকাংখার মধ্যে এমন একটা চুম্বক আকর্ষণ আছে যে ভাল লাগে। এই ভাল লাগাটা রক্তের ধর্ম। তুমি ও আমি একই পিতার সন্তান। আমাদের মধ্যে বৈষম্য থাকবে কেন ? এই রাজ্যের সেনাধ্যক্ষ তুমি। রাজার পরে তোমার স্থান। দেশের পর দেশ জয় করে, তোমার উচ্চাকাংখার আত্মাগরীমাকে প্রতিষ্ঠা কর। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব সেইখানে। তোমার গৌরব খ্যাতি আমাকেও গৌরবান্বিত করবে। ভাই হয়ে ভাইকে ঘৃণা করে কোন্ অমরত্ব লাভ করবে ?

কশ্যপের মস্তিষ্কের অন্ধকার সীমানায় এক বিস্মৃত জিজ্ঞাসার ঝিলিক

দিল। স্খলিত নিচু স্বরে বলল ঃ কর্মের বিচারে কে শ্রেষ্ঠ নিজেই বিচার করে দেখ, ইন্দ্র।

ঘটনাটা এত অল্পে শেষ হল না। অদিতির পুত্রেরা এবার জোট বাধল। ইন্দ্রকে জ্যেষ্ঠের আসনে বসিয়ে সিংহাসন কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। ব্রহ্মাবর্ত্ত থেকে কশ্যপমেরুতে গিয়ে তারা যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে লাগল। তাদের অভিসন্ধি বুঝতে কষ্ট হল না কশ্যপের। পুত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলল ঃ বৎস, হিরণ্যকশিপু তোমাদের কোন ক্ষতি করেনি, তবু তোমরা তার শত্রু। কেন? তার সঙ্গে তোমাদের স্বার্থের বিরোধ কোথায়? তোমরা চাও একক ভোগ, সুখ, ঐশ্বর্য। কর্তৃত্ব! আমার আদর্শে গড়া মূর্ত্তি হিরণ্যকশিপু। দেশ ও দেশের মানুষের সুখ-ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধি-শান্তি-সংহতি তার কামনা। মহাপ্রাণ না হলে এতবড় স্বার্থত্যাগ করা সম্ভব নয়। তোমাদের প্রতিও নেই তাদের ঈর্ষা, বিদ্বেষ। তবু, তোমরা শত্রু তার। এ বড় বিচিত্র ব্যাপার।

ইন্দ্র বলল ঃ পিতা আমাকে দুর্বিনীত অহংকারী বলেই জানেন। সত্যিই আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী আমি। উগ্র অহং বলে সব কিছু দাবি করি। বিশ্বাস করি আমার ও আমাদের গোষ্ঠীর উন্নতি এবং কল্যাণ আমার হাতে। হিরণ্যকশিপুর মহত্বকে আমি দুর্বলতা মনে করি। এই মহৎ গুণটির সাহায্যে মানুষকে সহজে মুগ্ধ এবং বিভ্রান্ত করা যায়। মহত্ব মানুষকে বোকা বানানোর এক অদ্ভুত কৌশল। কিন্তু আমি ওরকম কোন ছলের আশ্রয় নিই না। আমি চাই জয়। সে জয় আমার গোষ্ঠীকে আমার পরিবারকে গৌরবান্বিত করবে। কারো করুণা কিংবা দয়ার প্রত্যাশী হয়ে আমি থাকতে চাই না।

বৎস, অবিবেচক হয়ো না। মানুষকে লড়তে হয় দুঃখের সঙ্গে, ভাগ্যের সঙ্গে, তার পরিবেশের সঙ্গে। ত্যাগে তাকে হতে হয় বড়। হিরণ্যকশিপু কাশ্যপেয়দের সংহতির শক্তি বর্দ্ধনের গুণে দায়িত্ব নিয়ে আমারই কাজ করেছে, তাই তার কাজে যাতে বিঘ্ন বা উপদ্রব

না উপস্থিত হয় সেজন্যেই আমি তোমার পিতা হয়ে নিযুক্ত হতে বলছি।

কিন্তু পিতা বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর মধ্যে কখনও মিত্রতা হয় না। এদেশের মানুষেরা যুদ্ধ জানে না, তাদের বাহুবল, সৈন্যবল নেই। তাই যুদ্ধ তাদের কাছে আতংক। বীরের মত যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করতে তারা ভয় পায়। যুদ্ধ তাদের কাছে বিভীষিকা। শুধু এই দুটি কারণে শান্তিপ্রিয় এই জাতির জীবনে যখনই সংঘর্ষ এসেছে তখনি সংগ্রাম পরিহার করে নির্বিচারে আক্রমণকারীরা কর্তৃত্ব মেনে নেয়। কিন্তু আমরা দুর্বল নই। কাপুরুষও নই।

ছিঃ ইন্দ্র মানুষের মহত্বকে অপমান করা বীরের ধর্ম নয়।

সত্যি কথাটা তোমার ভাল লাগল না।

হিরণ্যকশিপু বীর, নির্ভীক। তাকে পরাভূত করার বল তোমার বাহুতে নেই। আমি চাইছিলাম আমার সৃষ্টির সম্পূর্ণতা রক্ষা হোক। কাশ্যপেয় নামের আড়ালে বহু জাতি এবং বহু গোষ্ঠীর মানুষ এক জাতি এক প্রাণ হয়ে উঠুক। এক বৃহৎ মানব সংঘে পরিণত হোক। আমার সেই মহান স্বপ্ন তোমরাই ধূলিসাৎ করে দিচ্ছ।

পিতা, হিরণ্যকশিপু চতুর। নিজের স্বার্থ ও সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যে তোমাকে সে ব্যবহার করছে। কাশ্যপেয়দের সংহতি ও ঐক্যের ছল করে আসলে সে সময় হরণ করে যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করছে। তুমি সরল বলে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারছ না।

হাসল কশ্যপ। বলল: তুমি এক কাল্পনিক যুদ্ধ পরিচালনার অজুহাত সৃষ্টি করে কাশ্যপেয়দের আতঙ্কগ্রস্ত করছ। বিভেদ বিদ্বেষের অন্তঃস্রোতে তাদের সংহতিকে পঙ্গু করে যুদ্ধে জেতার যে স্বপ্ন দেখছ আমি তা বানচাল করে দিতে পারি। এখনই সাধারণ মানুষ কথা বলতে সুরু করেছে। কশ্যপ তো কই ইন্দ্রকে তাঁর যজ্ঞে ব্রাহ্মণের কাজ করতে দেননি—ও ইন্দ্রকে আমরা মানব না।"

পিতা, শক্তি ও অর্থের চেয়ে ধর্ম বড় এদেশে। আচার্য বৃহস্পতি আমার সহায়। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি তিনি আমায় শিখিয়েছেন। দানবনন্দিনী পুলোমা আমার অনুরাগিনী। আমার বিজয় লক্ষ্মী। বন্ধুত্বের ছল করে মহত্ব ও ব্যক্তিত্বের চুম্বক আকর্ষণে মানুষকে মন্ত্র মুগ্ধ করে আমিও এক অপরাজেও শক্তির দুর্গ গড়েছি। ইন্দ্রই এদেশের শাসক। আর্য ছাড়া কারো অধিকার নেই শাসনের। কালো চামড়ার মানুষগুলো বড় জোর আমাদের দাস হতে পারে, কিন্তু প্রভু হতে পারে না। প্রভুত্ব কর্তৃত্ব আমাদেরই জন্মগত অধিকার।

—স্বামী!

দিতির আকস্মিক আহ্বানে কশ্যপ চমকে উঠল। অস্ফুট ভগ্ন স্বরে উচ্চারণ করল এ্যাঁ! সঘন নিঃশ্বাসে তার ধ্বনিত হল হৃদয়ের এক অতলান্ত কষ্ট। বিভ্রান্ত দুই চোখে থমথমে ভাব। নিবিড় আঁখি পল্লবের নিচে গভীর তন্ময়তা। আচ্ছন্ন গলায় বলল: ওঃ তুমি!

দিতি অবাক এবং বিভ্রান্ত স্বরে বলল: আজকাল তোমার অবস্থা দেখলে ভীষণ কষ্ট হয়।

বুকের উপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল: কেমন যেন হয়ে গেছ তুমি। সবসময় ঝিম হয়ে বসে থাকে। বিড় বিড় করছ, মাথা নাড়ছ। কেন? কি হয়েছে তোমার? এত গম্ভীর কেন তুমি? তুমি চুপ করে থাকলে ভয় করে। ঝড়ের পূর্বাভাস তোমার দুই মনিতে। দুর্ভাবনা কেন?

কশ্যপের মুখে বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল। মৃদুস্বরে বলল: প্রলয় আসন্ন। আকাশে ঝড়ের সংকেত। পিঁপড়েরা মাটির বাসা ভেঙে গাছের উঁচু ডালে নতুন বাসা করছে। বনের পশুরা সমতলভূমি ছেড়ে উঁচু ভূমিতে উঠে যাচ্ছে। পাখীদের ভেতরও কেমন একটা আতঙ্কের ভাব। পৃথিবীর সব প্রাণীর ঘরে প্রলয়ের খবর পৌঁছে গেছে। কেবল মানুষ জানে না তার সংবাদ। নিশ্চিন্তে আছে সে। কিন্তু প্রলয় আসছে খুব চুপি চুপি, নিঃশব্দে।

কি সব আজে বাজে বকছ। তোমার মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে। ধমক দিল দিতি।

কশ্যপ চোখ টান টান করে তাকাল। অবিশ্বাসের দৃষ্টি। উদাস এবং অন্যমনস্ক দেখায় তাকে। আস্তে আস্তে বলল ঃ বৃদ্ধ বলে তাচ্ছিল্য কর না। এখনও আমার ইন্দ্রিয় শক্তি প্রবল। মাটির বুকে কান পাতলে জননী বসুন্ধরার কান্না শুনতে পাই। গুঁমড়ে গুঁমড়ে কাঁদছে জননী। পৃথিবীর পাপের ভার সইতে পারছে না মেদিনী। তাই সমুদ্রকে মিনতি জানাচ্ছে।

তোমাকে বাজে কথায় পেয়ে বসেছে। ক'দিন আগেও এমন ছিল না। হঠাৎ, তোমার কি হল? বৈদ্যকে খবর দেব?

সে সুযোগ পাবে না। তার আগে প্রলয় এসে ভাসিয়ে দেবে পাপ। মুছে যাব আমি তুমি সব। সব ধ্বংস হবে।

চুপ করবে।

চুপ করতে পারছি কৈ?

এক প্রলয় আমায় দিয়ে স্বর্গ রচনা করল, আর এক প্রলয়ে হয়ত আমার সেই কীর্তি ডুবে যাবে। ভালই হবে, থাকবে না কোন স্মৃতি, দুঃখ, তাপ।

ছিঃ এসব কি কথা?

সুখ দুঃখ চক্রাকারে ঘোরে। সুখের পর দুঃখের পালা। আমি তার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। সে আসছে শিবের ডমরু বাজিয়ে তাথৈ তাথৈ নৃত্য করতে করতে।

তোমার কি হয়েছে আজ?

এক নতুন আজব লড়াই। ক্ষমতার লড়াই; নিজেদের মধ্যে ভাই-এ ভাই-এ। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে। বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর। এ হল অন্তর্বিরোধের লড়াই। আত্মঘাতী অন্তর্যুদ্ধ, যার থেকে নিস্তার নেই, পলায়ন নেই।

কশ্যপ নিঃসহায় বেদনায় ক্লান্ত। দীর্ঘশ্বাস চেপে নীরব হল।

দিতি তার চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালাতে লাগল। হাতের নিবিড় স্পর্শে ছিল, নীরব সান্ত্বনার ছোঁয়া।

আস্তে আস্তে বলল: তোমার ব্যথার অভিব্যক্তি স্পষ্ট হল না আমার কাছে। তবে একটা কিছু গোলমাল হয়েছে। তুমি বিচলিত, বিভ্রান্ত। বৃদ্ধ বয়সে যথাসম্ভব নিরাবেগ চিত্তে জীবনকে গ্রহণ করা দরকার। নইলে দুঃখ বাড়ে। অনন্ত ভাঙা গড়ার মধ্যে জীবন স্রোত বয়ে চলেছে। উত্থান পতনের অমীমাংসিত রহস্যের কোনদিন মীমাংসা হবে না। তুমি যাই করো, যত করো একদিন সব লোপ পেয়ে যাবে। সেই বোধে কষ্ট পাচ্ছ তুমি। বুঝছ না কেন, তুমি মানুষ, তোমার শক্তির একটা সীমা আছে। তোমার দুর্বলতাও অশোধনীয়। প্রেমের মধ্যে ঘৃণা, ক্ষমার মধ্যে প্রতিহিংসা, ত্যাগের মধ্যে লোভ, বন্ধুত্বে বিশ্বাসঘাতকতা, ভ্রাতৃত্বে বৈরীতা থাকবে। এগুলি মানব স্বভাব। একে বদলানো যায়, কিন্তু স্বভাব থেকে মুছে ফেলা যায় না। এই সহজ সরল সত্যটা বোঝনি বলেই দুঃখ পাচ্ছ।

দিতির কথায় অবাক হল কশ্যপ। হঠাৎ কিছু বলতে পারল না। ভুরু কোঁচকাল। মাথা নাড়ল। কষ্টবিদ্ধ যন্ত্রণায় গলার স্বর স্খলিত এবং ভেজা তার। বলল: তুমি সহজ কথাটাকে কত গভীর করে বললে। কিন্তু আমি—

উৎকর্ণ হয়ে কশ্যপ কি যেন শুনতে চেষ্টা করল। একটা গভীর আচ্ছন্নতার মধ্যে ডুবে গিয়ে সে অর্ধস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল : ঐ শোন মহাপ্লাবনের ভৈরব কল্লোল। আকাশের হুঙ্কার। বাতাসের করতালি।

দিতির মুখের অভিব্যক্তিতে যুগপৎ একটা বিস্ময় আর বিরক্তি এবং বিরাগ ফুটে উঠল।

কশ্যপের মস্তিষ্কের মধ্যে প্রগাঢ় আবেগ প্রবণতার একটা ধাক্কা লাগে। আকস্মিক চিত্ত চাঞ্চল্য এমন বিপরীত দিক থেকে আঘাত

করে যে পলকের মধ্যেই তার সমস্ত অনুভূতি যন্ত্রণায় ক্রিয়াশীল হয়। উন্মত্তের মত প্রবল ঝড় এবং জলের মধ্যে সে বেড়িয়ে পড়ল। তীব্র ঝড়ে গাছ-পালা ঝাপ্টাতে লাগল। সিন্ধু ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত ফুঁসতে লাগল। বাতাস তাণ্ডব সুরু করল। বড় বড় গাছ উপড়ে পড়ল। দশ-দিক প্রচণ্ড শব্দে কাঁপিয়ে মুহুর্মুহু বজ্রপাত হতে লাগল। বিদ্যুতের তীব্র কশাঘাতে কালো মেঘের শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। প্রকৃতির মধ্যে একটা শঙ্কা জাগানো শব্দ হতে লাগল।

কশ্যপ ছুটতে ছুটতে সিন্ধুতীরে এসে দাঁড়াল। অজগরের মত নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে বাঁধ। একদিন সিন্ধুর প্লাবন থেকে বাঁচার জন্যে লক্ষ হাতে শীলার উপর শীলা সাজিয়ে সিন্ধুর স্বেচ্ছাচারিতার গতিরোধ করেছিল। বাঁধের গায়ে সিন্ধুর জল বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে ফুসছে, গজরাচ্ছে। অসহায় নারী যেমন বীরের পা জড়িয়ে তার কাছে আর্তস্বরে মিনতি জানায় তেমনি সিন্ধু দানব ঐ পাথরের কাছে নিস্ফল মাথা কুটছে।

কশ্যপের মনে হল, এই বিরাট নদী জীবনের অগণিত তরঙ্গ নিয়ে সম্মুখে প্রবাহিত। কিন্তু নদী যদি হঠাৎ সমুদ্র হয়ে ভয়ংকর গর্জন করে তার দিকে ধেয়ে আসে? হৃদয় গুহায় লুকোন একটা ব্যথা অমনি চুপি চুপি বলল: ভাই-এর রক্তে এ মাটি লাল হওয়ার আগে সিন্ধুর জলে ধুয়ে দাও তার সর্বগ্লানি, মনস্তাপ।

কশ্যপের কানে কানে বাতাস যেন ফিস্ ফিস্ স্বরে বলল: তুমি জানো, তুমি কি চাও। কেন তুমি আসলে, সিন্ধুও জানে। নিয়তি এনেছে তোমাকে। অভিশপ্ত দেবপুত্র বিশ্বকর্মা শাপ দিয়েছিল সিন্ধু দানব একদিন উঠে এসে মৃত্যু কর চাইবে। সেদিন তাকে ফেরানোর কোন শক্তি থাকবে না। সপ্তসিন্ধুর লোকদের মহানন্দে ভক্ষণ করে সিন্ধু দানব ফিরে যাবে সমুদ্রে। কারো জন্যে কারোর চোখের জল ফেলার লোক থাকবে না কিন্তু তুমিই হতাশ করেছ সিন্ধুকে। তাই এত পাপ! সিন্ধু দানব ক্ষুধিত। দেবতার অভিশাপ কখনো নিস্ফল হয় না।

মুহূর্তে কি যেন হয়ে যায় কশ্যপের মধ্যে। মনে মনে উচ্চারণ করে, পাপ! পাপ জমেছে মনে। না'হলে ভাই ভাইর বুকে রক্ত ঝরাবে কেন? স্নেহ প্রেম মমতাকে হত্যা করে মানুষ কি নিয়ে থাকবে? তার চেয়ে সিন্ধুর ঋণ শেষ হোক, দেবতার অভিশাপ সার্থক হোক। কশ্যপ পাগলের মত একটা ভারী শিলাখণ্ড নিয়ে বাঁধের উপর আঘাত করল। বিরামহীন আঘাত। ঝুপ ঝুপ্ করে এক, দুই, তিন শব্দ হল। হুড়মুড় করে বাঁধের অনেকটা ভেঙে পড়ল নদীর জলে। অমনি সিন্ধুর জল লাফিয়ে পড়ল কশ্যপের উপর। নিমেষে তার শরীরটা নিয়ে লোফালুফির কৌতুক খেলায় মাতল। প্রবল বেগে হুড়মুড় করে এসে সিন্ধুর জল ঢুকে পড়ল লোকালয়ে। কোন বাধা মানল না। অশ্বারোহী বাহিনীর মত সে দুর্বার গতিতে ধেয়ে গিয়ে প্রান্তর ভাসিয়ে দিল। মুহূর্তে সিন্ধু সত্যাই ভয়ংকর এক জীবন্ত দানব হয়ে লক্ষ লক্ষ জিহ্বা বিস্তার করে গিলতে লাগল কশ্যপের দেবভূমি।